ইসলামী ইবাদত
ও
দ্বীনি মা'লুমাত

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের একটি ৭৫ বর্ষ পূর্তি প্রকাশনা

প্রকাশনায়

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ

৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

www.mkabd.org

mkabangladesh@gmail.com

প্রকাশক	ইশায়াত বিভাগ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ।
প্রথম সংস্করণ	: ২৫ অক্টোবর ১৯৭৫
দ্বিতীয় সংস্করণ	: ২৫০০ কপি, ১লা অক্টোবর ১৯৮৪
তৃতীয় সংস্করণ	: ১৫০০ কপি, ১৪ অক্টোবর ১৯৯৬
চতুর্থ সংস্করণ	: ২০০০ কপি, ১০ জুন ২০০৫
পঞ্চম সংস্করণ	: ১৫০০ কপি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
ষষ্ঠ সংস্করণ	: ৩০০০ কপি, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩

মুদ্রণে : আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ঢাকা।

হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক অনুমোদিত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৭৫ বর্ষ পূর্তি-র লোগো

بسم الله الرحمن الرحيم

ষষ্ঠ সংস্করণের ভূমিকা

মহান আল্লাহ তা'লা আমাদের কুরআন মজীদে দোয়া শিখিয়েছেন, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই (আল্লাহ্‌র) ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য চাই। (সূরা ফাতিহা)। ইসলামিক জীবন বিধানে আল্লাহ্‌কে চেনার এবং ডাকার পদ্ধতিগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। সেগুলোকে বাংলাদেশের আহমদী খাদেম-তিফলদের হাতে পৌঁছে দেয়াই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশে আহমদী তিফল ও খাদেমদের ইসলামী জ্ঞান আহরণ ও ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি জানার ক্ষেত্রে **"ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত"** পুস্তিকাটি এককথায় অনন্য প্রমাণিত হয়েছে। তালিম-তরবিয়তের কাঙ্ক্ষিত মান অর্জনে বর্তমান সংস্করণটি একইভাবে আদৃত হবে বলে খাকসার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী।

জাতির সার্বিক তালিম-তরবিয়তের মানের সাথে যখন কোন প্রকাশনা একাকার হয়ে যায় তখন তার গুরুত্ব ও আঙ্গিক সময়ের চাহিদা পূরণের দাবি করে। এই প্রেক্ষিতে ষষ্ঠ সংস্করণটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে মুফতি সিলসিলাহ মোহতরম মাওলানা মোবাশ্বের আহমদ কাহলুন সাহেবের দিক-নির্দেশনা মোতাবেক প্রথমত বইটির নামে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর কল্যাণময় হেদায়াত মোতাবেক পাকিস্তান থেকে উর্দূ দ্বীনি মা'লুমাত পুস্তকটি আনিয়ে এর প্রয়োজনীয় অংশ অনুবাদ করে অত্র সংস্করণে সংযোজন করা হয়েছে। এই কাজে জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশের ছাত্র তরুণ ও উদ্যমী আমাদের দুই ভাই সর্বজনাব আহমদ জাকির হোসেন ও হাজারী আহমদ আল মুনিম অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাছাড়াও নব পর্যায়ে সম্পাদনা ও সংকলনে এ দুইজন অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন। পুস্তকটির কম্পোজের দায়িত্ব জনাব সানোয়ার হোসেন সনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পাদন করেছেন। এই পুস্তকটির জন্য প্রচ্ছদ অলংকরণ করেছেন জনাব তারেক আহমদ সবুজ। সবশেষে পুরো প্রকাশনাটির প্রুফ রিডিং করেছেন জনাব মোহাম্মদ এহসানুল হাবিব জয় সাহেব। নবম পরিচ্ছদটি আরও বর্ধিত আকারে সম্পূর্ণ আলাদা পুস্তাকাকারে প্রকাশ করা হবে বিধায় এই সংস্করণে বাদ দেয়া হয়েছে।

এই সমস্ত কর্মপ্রয়াসটি বাস্তবতায় রূপ লাভের ক্ষেত্রে মোহতরম মাওলানা আলহাজ্ সালেহ আহমদ সাহেবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর দিক-নির্দেশনা, যথাযথ পরামর্শ এবং যথেষ্ট সময় ব্যয় করে পুরো প্রকাশনাটি দেখে দেয়ার জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন আহমদী ভাই পুস্তকটি প্রকাশের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর ও তাঁর পরিবারের জন্য সকলের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

মহান আল্লাহ্ তা'লা এই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন। ওয়াস্‌সালাম।

খাকসার

মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন — ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৩
সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ইশায়াত বিভাগ ইসলামী ইবাদত পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করছে, আলহামদুলিল্লাহ। এ সংস্করণে নামাযের নিষিদ্ধ বিষয়, গোসলের আদব-কায়দা, ছাতর ঢাকা ফরয, সিজদা সাহু, আকিকাহ্, পঞ্চম খিলাফতকালীন বিশেষ তাহরীক ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। অনেক ভুলত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করা হয়েছে। আশা করি এতে পাঠক আরোও বেশি উপকৃত হবেন। বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করতে গিয়ে যারা অক্লান্তভাবে খেদমত করেছেন তারা হলেন মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, জনাব শরিফুল হাকিম আহমদ (মোতামীম ইশায়াত), মৌলানা মাহমুদ আহমদ সুমন, জনাব আহমদ জাকির হোসেন এবং আরও অনেকে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সকলেকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

খাকসার

আবু নঈম আল মাহমুদ
সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

সময়ের চাহিদার প্রেক্ষাপটে পুনরায় আমরা "ইসলামী ইবাদত" পুস্তকখানা প্রকাশ করতে পারায় মহান আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।
এ সংস্করণে সূরার ধারাবাহিকতায় কোরআন শরীফের বেশ কিছু দোয়া, রসূলে করীম (সাঃ)-এর দোয়া, মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়াও সংযোজন করা হয়েছে। এছাড়াও হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)-এর খিলাফত কাল, আমাদের বর্তমান খলীফা খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং মসীহ্ মাওউদ (আঃ), মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) ও খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ)-এর কিছু নতুন নযমসহ সাধারণ ও ধর্মীয় জ্ঞান এর কিছু বিষয় এ সংস্করণে নতুনভাবে সংযোজন করা হয়েছে।
ইসলামী ইবাদতের এ সংস্করণের ফলে এর পাঠকগণকে এ বইটি থেকে যথাযথ ফায়দা হাসিল করত মহান আল্লাহ্‌তাআলার প্রকৃত ইবাদত প্রতিষ্ঠা করার পূর্ণ তৌফিক দিন। আমীন।
বর্তমান সংস্করণ প্রকাশ করতে গিয়ে যারা বিশেষভাবে খেদমত করেছেন তাঁরা হলেন সর্বজনাব মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান, মাওলানা সালেহ আহমদ– সদর মুরুব্বী, শরিফুল হাকিম আহমদ, গোলাম মোহাম্মদ, মিসেস গোলাম মোহাম্মদ, মোঃ এহিয়া, মোঃ রাহিম এবং অন্যান্য যারা যে ভাবেই সহগোগিতা করেছেন আল্লাহ্‌তাআলা তাদের সকলকে মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

খাকসার

মাহবুবুর রহমান
সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া,বাংলাদেশ
১০ই জুন, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
১০ই ইহসান, ১৩৮১ হিঃ শাঃ

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মহান আল্লাহতাআলার অশেষ ফযলে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ ইসলামী ইবাদত পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলো, আলহামদুলিল্লাহ্।
পবিত্র কুরআনে জীন্ন ও মানব জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সর্ম্পকে আল্লাহ্পাক বলেন,"ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিইয়াবুদুন"- জীন্ন ও মানবকে আমি আমার ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। (সূরা আয্ যারিয়াত ঃ ৫৭)
ইবাদত একটি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী অর্থবহ পদবাচ্য। অসার, প্রাণহীন, লোকাচার ও নিছক অনুষ্ঠানসর্বস্ব ইবাদত ব্যক্তি কিংবা সমষ্টিগত জীবনে কোন প্রকৃত কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। চরম নৈতিক অবক্ষয়ে জর্জরিত, বহুবিধ কুসংস্কারে নিমজ্জিত, হিংসা-বিদ্বেষ-অশান্তির গ্লানিতে বিপর্যস্ত মানবতার বর্তমান সংকটকালে প্রকৃত ধর্মীয় মূল্যবোধ পুনঃজাগ্রত করার কোন বিকল্প নেই। আলোকিত প্রকৃতিসম্মত ইসলামী উৎকর্ষ ও মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ যুগে খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর এক উৎকৃষ্ট উম্মতকে মহান আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন। তিনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। তাঁর মাধ্যমে প্রকৃত ঈমান যা সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে গিয়েছিল তা পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসেছে। পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে সত্যান্বেষী পবিত্রাত্মাগণ প্রকৃত ঈমানের স্বাধ গ্রহণ করে তাঁর ঐশী পতাকাতলে জড়ো হচ্ছেন। দিন দিন প্রকৃত ধর্ম ইসলামের খাঁটি মূল্যবোধের মহিমা প্রজ্জ্বলিত ও শাণিত হচ্ছে। বুলন্দ হচ্ছে তৌহীদের আওয়াজ এবং প্রসারিত হচ্ছে এর ব্যাপকতা। মহান স্রষ্টার ঐশী পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পথে, তাঁর খাঁটি ইবাদতকে প্রতিষ্ঠার পথ ধরে মানবতার মহান মুক্তির আলোকিত প্রান্তরে উপনীত হওয়া আমাদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য বাস্তাবায়নে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সামান্যতম অবদান রাখতে সমর্থ হলেই আমরা নিজেদেরকে ধন্য জ্ঞান করবো।
এ বলে ইসলামী ইবাদত পুস্তকখানা সবার হাতে অর্পন করলাম।

বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত ইসলামী ইবাদত পুস্তকের নবতর তৃতীয় সংস্করণে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য ঃ

মৌলবী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান-

মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক -	অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুস্তিকার বহু অংশে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন করেছেন, সম্পূর্ণ পুস্তিকার চূড়ান্ত প্রুফ দেখে দিয়েছেন।
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ–	পুস্তিকার সমস্ত আরবী উদ্ধৃতির বাংলা উচ্চারণ লিখে দিয়েছেন, পুস্তিকার আরবী অংশের প্রুফ দেখে দিয়েছেন।
মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম –	পুস্তিকার বিভিন্ন অংশে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরামর্শ প্রদান করেছেন, নযমের বর্ধিত অংশের অনুবাদ ও প্রুফ দেখে দিয়েছেন।
	মূল পুস্তিকার পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত পান্ডুলিপি পুনর্লিখন, সমস্ত পুস্তিকার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রুপ সংশোধন।
	এছাড়া মূল পুস্তিকার পান্ডুলিপি পুনর্লিখনে যারা অবদান রেখেছেন, সুলতান আহমদ, নাসের আহমদ (বাবু), যুলওয়াকার মোহাম্মদ আল কবির, কাওসার আলম।

প্রকাশনার কাজ চূড়ান্তকরণে জনাব নুরুল ইসলাম মিঠু ও জনাব সরকার মুহাম্মদ মুরাদুজ্জামান একনিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষ করে বেলজিয়ামে বসবাসরত বাঙ্গালী আহমদী যুবক ভ্রাতাগণের আন্তরিক সহযোগিতা প্রশংসার দাবী রাখে। মহান আল্লাহ তা'লা তাঁদের সবাইকে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন।

তারিখ ঃ ঢাকা
১৪ ই ইখা, ১৩৭৫ হিঃ শাঃ
১৪ই অক্টোবর ১৯৯৬ ইং

খাকসার
মুহাম্মদ সেলিম খান
সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ।

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফযলে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এর ইশায়াত বিভাগ ইসলামী ইবাদতের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করছে।
মানবের ব্যবহারিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সুখ-শান্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির যাবতীয় প্রয়োজন ও চাহিদা নিরূপণ এবং সুবিন্যস্ত করেছে ইসলাম। মানব জীবনের এই সুসমন্বিত বিন্যাসে তার উপাসনা, জীবন এমনকি মরণও তাকে সুষমামন্ডিত করে।
অতএব জীবন সুন্দর ও সার্থক করার প্রয়াসে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ সীমিত শক্তিতে নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশ মজলিসের উক্ত প্রচেষ্টার অন্যতম সাক্ষর হ'ল **ইসলামী ইবাদতের** প্রকাশনা।
২য় সংস্করণটির প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা ও প্রকাশনার কাজে জনাব তাসাদ্দক হোসেন সাহেব, নায়েম ইশায়াত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং নযম সংকলনে ও মুদ্রণ-প্রমাদহ্রাস করতে প্রুফ রিডিং-এর বিষয়ে বাংলাদেশ মজলিসের ন্যাশনাল মোতামাদ জনাব আব্দুল জলিল সাহেব অবিরাম চেষ্টারত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা উভয়কেই নেক কাজের উত্তম জাযা দিন।
এ সংস্করণটি প্রকাশনার বিষয়ে মোহতারম মাহমুদ আহমদ সাহেব- সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকাযীয়া আমাদিগকে সর্বপ্রকার পরামর্শ-নির্দেশ, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন। তাঁর অমূল্য সহযোগিতার প্রতিদানে আল্লাহ তা'লা তাঁকে উৎকৃষ্ট পুরস্কারে ভূষিত করুন, আমীন!!
খুইয়ে যাওয়া ইবাদতের অনুশীলনে আমাদের যুব-জীবন খোদা মিলনের আস্বাদন লাভে সক্ষম হোক। এ কামনা নিয়ে ইতি টানলাম। (সংক্ষেপিত)

১লা অক্টোবর, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ

খাকসার
মোহাম্মদ হাবীব উল্লাহ
ন্যাশনাল কায়েদ

প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের কথা

কুরআন করীম পাঠে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহতাআলা জিন্ন এবং মানবকে কেবল মাত্র তাঁহার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন......। সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব পুস্তকের পান্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন। ইহা ছাড়া বাংলাদেশ জামায়াতে আহমদীয়ার আমীর মোহতরম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব সাল্লামাহু পুস্তকের পান্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন এবং অনুগ্রহপূর্বক অনেক মূল্যবান বিষয়াদি সংযোজন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের নায়েব সদর জনাব মুহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব অনুগ্রহ করিয়া একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।
আল্লাহতাআলা সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম পুরস্কার দান করুন, আমীন।

(সংক্ষেপিত)
২০ ফেব্রুয়ারী, ৭৫

ওয়াসসালাম, খাকসার
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান,
মোতামাদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ইসলামী ইবাদতের উদ্দেশ্যঃ আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে সূরা ফাতিহায় আমাদিগকে এই দোয়া শিক্ষা দিয়াছেন।
অর্থাৎ আমাদিগকে সহজ সরল পথ দেখাও। .....
কুরআন করীমের উপরোক্ত শিক্ষার আলোকে ইসলামী ইবাদত এবং আকায়েদ বিশ্লেষণ করিলে আমাদের শুধু জ্ঞানই বৃদ্ধি পাইবে না বরং সেই সংঙ্গে আমাদের সকল অহেতুক সংশয় এবং সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে এবং আমরা নীতি-জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহকে লাভ করিতে পারিব। আল্লাহ্ আমাদের হাফিয, নাসীর ও হাদী হউন, আমীন।

(সংক্ষেপিত)
২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান
নায়েব সদর
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ।

সূচীপত্র

ইসলামী ইবাদত

দ্বীনি মা'লুমাত

সংকলন : আলহাজ্জ মুহাম্মদ মতিউর রহমান
মুহাম্মদ হাবীব উল্লাহ
মুহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম
আহমদ জাকির হোসেন

ইসলামী ইবাদত

কলেমা

নামায

রোযা

হজ্জ

যাকাত

দোয়া

ক) কুরআন মজীদের দোয়া

খ) হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দোয়া

গ) হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলেমা

আল্লাহ্ তা'লার মনোনীত দ্বীন বা ধর্মের নাম ইসলাম। ইসলাম ধর্মের রোকন পাঁচটি, যথা: (১) কলেমা (২) নামায (৩) রোজা (৪) হজ্জ এবং (৫) যাকাত। 'আরাকান' 'রোকন'-এর বহুবচন। 'রোকন' কথাটির অর্থ থাম বা স্তম্ভ। প্রতিটি মুসলমানের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং একাগ্রতার সাথে ইসলামের প্রত্যেকটি রোকন পালন করা উচিত। ইসলামী পরিভাষায় কলেমা বলতে নিম্নের বাক্যটিকে বুঝায়–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্)

অর্থ: "আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্র রসূল।"

এ সম্পর্কে যুগ ইমাম হযরত আকদাস ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন: "পরিত্রাণের ঘরে প্রবেশ করার দরজা হচ্ছে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰهِ

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।" (হুজ্জাতুল ইসলাম)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ইসলামের কলেমা সম্পর্কে বলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"-ই আহমদীয়াত (তথা খাঁটি ইসলাম)-এর কলেমা"।

কলেমার বিশেষত্ব

১. কলেমা উচ্চারণে বা বাকশক্তির বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানবজাতি অপরাপর প্রাণী হতে উন্নততর হতে পেরেছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "নিশ্চয় মানব জাতির উপর দিয়ে এমন এক যুগ গিয়েছে যখন সে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই ছিল না।" (সূরা আদ্ দাহর : ২)। এরপর খোদা তা'লা মানুষকে কথা বলতে শিক্ষা দেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে এসেছে "রহমান খোদা কুরআন শিখিয়েছেন, তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন" (সূরা আর রহ্মান : ৩-৫)। "কথা মহাশক্তির উৎস এবং সব কথার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার বাক্য সর্বোচ্চ" (সূরা তওবা : ৪০)। আল্লাহ্

তা'লা 'কুন্' অর্থাৎ 'হও' আদেশ দ্বারা বিশ্ব-চরাচর এবং এর মাঝের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। অন্যান্য ধর্মপুস্তকেও এর সমর্থন রয়েছে।

২. কোন স্থায়ী কাজ করতে হলে পূর্ব হতে একটি পরিকল্পনা এবং নকশার প্রয়োজন। অনুরূপভাবে, কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" (আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই) অংশে মানব জীবনের জন্য তৌহীদের (একত্ববাদের) মূল ও পূর্ণ পরিকল্পনা দেয়া হয়েছে। কলেমার "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" [মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল] অংশে তৌহীদের শিক্ষার এক জীবন্ত আদর্শরূপে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কথা বলা হয়েছে। যেহেতু মহানবী (সা.)-এর শরীয়ত তথা কুরআন পাকের পর আর কোন শরীয়ত বা ধর্মবিধান আসবে না আর আল্লাহ্ এবং এ রসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং পুরস্কার প্রাপ্তির সব পথ উন্মুক্ত রয়েছে, সেজন্য একমাত্র এই কামেল ও পরিপূর্ণ নবীর নামই কলেমার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। আসলে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে কলেমাই নেই। এটি ইসলামের একটি অনন্য ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য।

৩. 'লা ইলাহা' কথার অর্থ : 'নেই কোন উপাস্য'। 'ইলাহ্' শব্দের অর্থ ভয়, ভক্তি এবং ভালবাসার পাত্র। সুতরাং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' অংশের অর্থ হল আল্লাহ্ তা'লার ভয়, ভক্তি এবং ভালোবাসার মোকাবেলায় যে পাত্রই পথ রোধ করুক না কেন, তাকে আল্লাহ্র সামনে কুরবানী করতে হবে। তাহলেই আল্লাহ্কে পাওয়া যাবে। এ ভালবাসার নমুনাস্বরূপ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কলেমার দ্বিতীয়াংশে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সেজন্য কুরআন করীমে হযরত রসূল করিম (সা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূল [হযরত মুহাম্মদ (সা.)]-এর মাঝে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রয়েছে'। (সূরা আহ্যাব : ২২)। বলা হয়েছেঃ "বলো, 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালোবাসো, তাহলে আমার [হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর] অনুসরণ কর, (তাহলে) আল্লাহ্ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করবেন।" (সূরা আলে ইমরান : ৩২)

৪. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমাকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বোৎকৃষ্ট যিকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু শুধু মৌখিকভাবে এ কলেমা পাঠ করার যথার্থ কোন মূল্য নেই। এ কলেমার মাধ্যমে আল্লাহ্র তৌহীদের শিক্ষা এবং আঁ-হযরত (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করার যে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি আমরা করি তা কাজে পরিণত করার মাঝেই এর সার্থকতা নিহিত।

৫. কলেমা পাঠের মাধ্যমে আমরা মুসলমানরা যে শিক্ষা ও আদর্শের মন্ত্রে দীক্ষিত হই, তা একটি পবিত্র প্রতিশ্রুতি। বাস্তব জীবনে একমাত্র আল্লাহ্র উপর অবিচল আস্থা রেখে এবং পবিত্র রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আদর্শকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করে আমরা এ পবিত্র কলেমার প্রতি সম্মান দেখাতে পারি এবং আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারি। এটিই কলেমার সারমর্ম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নামায
নামাযের বিশেষত্ব

নামায ফারসি শব্দ। এর আরবি হলো 'সালাত'। নামায বা সালাত কায়েম করা প্রত্যেক বয়স্ক ও বুদ্ধিমান মুসলমানের জন্য ফরয বা অবশ্য-কর্তব্য। নামায এক প্রকারের নেয়ামত। এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া বা প্রার্থনা। মানুষের জন্যে এই প্রার্থনার বিধান দান করে আল্লাহ্ তা'লা মানুষের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। নামাযের মাধ্যমে আমরা আমাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করতে পারি, পাপ হতে মুক্তি লাভ করতে পারি। নামায মানুষকে খারাপ কাজ, মন্দ কথা-বার্তা, লজ্জাহীনতা, অশ্লীলতা, বিদ্রোহ প্রভৃতি হতে রক্ষা করে। নামায বিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পাথেয়–মু'মিনদের মে'রাজ। নামায বেহেশতের চাবি। একে ধর্মের স্তম্ভ বলা হয়।
আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন-

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡهٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡکَرِ

(ইন্নাস্ সালাতা তানহা আ'নিল ফাহ্শায়ি ওয়াল মুনকার)
অর্থ: নিশ্চয় নামায (নামাযীকে) অশ্লীলতা এবং মন্দকাজ হতে মুক্ত করে।" (সূরা আনকাবুত : ৪৬)।
সুতরাং নামায পড়া সত্ত্বেও যদি কেউ সেই দোষ হতে মুক্ত না হয়, যেভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, তাহলে বুঝতে হবে তার নামায প্রকৃত নামায নয়। নামাযের সাহায্যে আমাদের আত্মা সবল ও সুস্থ থাকে। আমরা অন্যায়, অশ্লীলতা এবং অমূলক সন্দেহ হতে নিজেদের রক্ষা করতে পারি। যেসব কু-অভ্যাস কিছুতেই দূর করা সম্ভব হয় না তা নামাযের মাধ্যমে, বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে ও দোয়ার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। যে কেউ যে কোন কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করার জন্যে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে অতি অল্পকালের মাঝেই সে আশ্চর্য ফল পাবে।
নামায পড়া এবং নামায কায়েম করার মাঝে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নামায পড়ার মাঝে পূর্ণ মনোনিবেশ থাকতে পারে, না-ও থাকতে পারে, কিন্তু নামায কায়েম করার মাঝে কতগুলো বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; যেমন- (ক) বিনা ব্যতিক্রমে যথাসময়ে নামায আদায় করা; (খ) ফরয নামায বা-জামাত আদায় করা, (গ) একাগ্রচিত্ততার সাথে ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করা; (ঘ) নামাযে ব্যবহৃত দোয়া-কালামের অর্থ বুঝে নামায পড়া; (ঙ) নামাযের মাঝে অন্তরের আবেগ-অনুভূতি নিজ ভাষায় ব্যক্ত করা এবং আল্লাহ্ তা'লার

কৃপা ভিক্ষা করা; (চ) নিজের উপর মৃত্যুসম অবস্থা আনয়ন করা এবং মনে করা যে আল্লাহ্ সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন এবং তিনি সামনেই উপস্থিত আছেন এবং (ছ) আল্লাহ্র সাহায্য এবং করুণার উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। কুরআন শরীফে প্রায় ৮২ বার নামায কায়েমের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হতেও নামাযের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।
আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন -

وَاۡمُرۡ اَهۡلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصۡطَبِرۡ عَلَيۡهَا ؕ لَا نَسۡـَٔلُكَ رِزۡقًا ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُكَ ؕ وَالۡعَاقِبَةُ لِلتَّقۡوٰى ﴿۱۳۳﴾

(ওয়া'মুর আহ্লাকা বিস্সালাতি ওয়াসতাবির আ'লায়হা লা নাস্আলুকা রিয্কান নাহ্নু নারযুকুকা ওয়াল আকিবাতু লিত্তাক্বওয়া)
অর্থ: "এবং তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের তাগিদ করতে থাক। আমরা তোমার কাছে কোন রিযক চাই না, বরং আমরাই তোমাকে রিয্ক দিচ্ছি। বস্তুত তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্যই উত্তম পরিণাম।" (সূরা ত্বা-হা: ১৩৩)।
অনেকে মূর্খতাবশত নামাযকে একটা ট্যাক্স বলে মনে করে। আল্লাহ্ তা'লা উপরোক্ত আয়াতে এরূপ ধারণার খণ্ডন করেছেন। বস্তুত আমরা আমাদের নশ্বর দেহের জন্য যেমন নানাবিধ যত্ন নেই, সেরূপ আত্মার জন্যেও যত্নও আবশ্যক। বরং আত্মা যেহেতু চিরস্থায়ী, সেজন্য দৈহিক যত্নের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আত্মার খাদ্য তথা নামাযের দিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক, যেন আমরা আত্মাকে সতেজ এবং অটুট রাখতে পারি। মোটকথা নামায মানুষের উপর কোন প্রকার ট্যাক্স নয়, বরং আত্মার জন্যে এ অতি প্রয়োজনীয়। নামাযের মর্মার্থ না বুঝে অনেকে লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে থাকে। এরূপ নামাযী সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন :

فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ ۙ﴿۵﴾ الَّذِيۡنَ هُمۡ عَنۡ صَلَاتِهِمۡ سَاهُوۡنَ ۙ﴿۶﴾ الَّذِيۡنَ هُمۡ يُرَآءُوۡنَ ۙ﴿۷﴾

(ফাওয়ায়লুল্লিল মুসাল্লিন, আল্লাযীনা হুম আন্ সালাতিহিম্ সাহুন, আল্লাযীনা হুম ইউরাউন)
অর্থ: "দুর্ভোগ সেসব নামাযীদের জন্যে যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। যারা কেবল লোক দেখানো কাজ (হিসেবে তা) করে।" (সূরা মাউন: ৫-৭)।
আঁ-হযরত (সা.) বর্ণনা করেছেন: "নামায মু'মিনের মিরাজস্বরূপ"। দৈনিক পাঁচবার নামাযের মাধ্যমে মু'মিন আল্লাহ্র সাথে নিয়মিত সাক্ষাৎ করতে পারে। এছাড়া সে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের মাধ্যমে রাত্রির নিস্তব্ধতার মাঝে আল্লাহ্র অতি কাছে আসতে পারে এবং বিশেষ সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। তখন মু'মিন তার মর্মজ্বালা আল্লাহ্র দরবারে নিঃশেষ করে দেয় এবং আল্লাহ্র যিকরের (স্মরণের) মাধ্যমে এক অনাবিল শান্তি লাভ করে। ফলে তার বিপদ-বিক্ষুব্ধ অশান্ত হৃদয়ে শান্তি ফিরে আসে।
সেজন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

اَلَا بِذِكۡرِ اللّٰهِ تَطۡمَئِنُّ الۡقُلُوۡبُ ؕ

(আলা বি যিক্‌রিল্লাহি তাত্‌মায়িন্নুল্‌ কুলূব)

অর্থঃ "স্মরণ রেখো! আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা রা'দঃ ২৯)।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) অধিক পরিমাণে রাত্রি জাগরণ করে নামায পড়তেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

اِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ اَنَّكَ تَقُوۡمُ اَدۡنٰى مِنۡ ثُلُثَيِ الَّيۡلِ وَ نِصۡفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيۡنَ مَعَكَ ؕ

(ইন্না রাব্বাকা ইয়া'লামু আন্নাকা তাকূমু আদ্‌না মিন সুলুসায়িয়াল লাইলি ওয়া নিস্‌ফাহু ওয়া সুলুসাহু ওয়া তায়িফাতুম্‌ মিনাল্লাযীনা মা'আকা)

অর্থঃ "নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক জানেন, তুমি দাঁড়িয়ে থাক রাত্রের দুই-তৃতীয়াংশের কিছু কম কিংবা কখনও এর অর্ধেকাংশ এবং কখনও বা এক-তৃতীয়াংশ এবং (দাঁড়িয়ে থাকে) তাদের এক দলও যারা তোমার সাথে রয়েছে।" (আল্‌ মুয্‌যাম্মিলঃ ২১)।

ফরয নামায বা-জামাত পড়তে হবে। কারণ তাতে শুধু ব্যক্তিগত কল্যাণই নয়, সামগ্রিক কল্যাণ লাভ করা যায়। নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'জামাতে নামায আদায় করলে সাতাশ গুণ সওয়াব হয়।' এর দ্বারা আমরা জামাতে নামাযের গুরুত্ব বুঝতে পারি। মানুষ সামাজিক জীব, তাই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের মাঝেই শান্তি নিহিত। ফরয ছাড়া অন্যান্য নামায ব্যক্তিগতভাবে একা পড়তে হয়। ঈদের নামায বা-জামাতে পড়তে হয়। এরূপে নামায আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সমীপে ব্যক্তিগতভাবে এবং সম্মিলিতভাবে উপস্থিত করে। বছরে দু'বার ঈদের নামায, প্রতি সপ্তাহে একবার জুমু'আর নামায, প্রত্যহ পাঁচবার ফরয নামায, গভীর রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায- এসব ইবাদত ও উপাসনার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ এবং জাতি নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে সংশোধিত হতে পারে এবং সত্যিকার অর্থে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

নামাযের মাধ্যমে ইতায়াত বা আজ্ঞানুবর্তিতার শিক্ষা লাভ করা যায়। তাছাড়া নেতার অধীনে চলা, সময়ানুবর্তিতা, সামাজিক সাম্য, একতা ও ভ্রাতৃত্ব, দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা, একাগ্রচিত্ততা, পাপবর্জন এবং পুণ্যার্জন, আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ এবং নিদর্শন লাভ করা, সামাজিক কদাচার পরিহার, শান্তি ও স্বস্তির মনোভাব, কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং সময়ের সদ্ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে নামাযে বহু শিক্ষা রয়েছে। (এ প্রসঙ্গে মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব প্রণীত "নামায তত্ত্ব" পুস্তক দ্রষ্টব্য)

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "নামায কী? এ এক প্রকার দোয়া যা তসবীহ্‌ (খোদা তা'লার মহিমা কীর্তন), তাহমীদ (প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন), তাকদীস

(পবিত্রতা কীর্তন), এবং ইস্তিগফার (নিজের দুর্বলতাসমূহ স্বীকার করে শক্তি প্রার্থনা) ও দুরূদ [হযরত রসূল করিম (সা.)-এর প্রতি আশিস ও বরকত কামনা] সমন্বিত বিনীত প্রার্থনা। **সুতরাং যখন তোমরা নামায পড় তখন অজ্ঞ লোকদের ন্যায় দোয়ায় শুধুমাত্র আরবি শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ থেকো না। কেননা, তাদের (অজ্ঞদের) নামায এবং ইস্তিগফার সবই বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপ মাত্র। এতে কোন সারবস্তু নেই। তোমরা নামায পড়ার সময়ে খোদা তা'লার কালাম কুরআন এবং রসূল করিম (সা.)-এর কালামে প্রচলিত দোয়া ছাড়াও নিজের যাবতীয় দোয়া নিজ ভাষাতেই কাতর নিবেদনসহ জানাও, যেন তোমাদের হৃদয়ে সেই কাতর নিবেদনের সুপ্রভাব পতিত হয়।"**

হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.) পাঁচ ওয়াক্ত নামায সম্পর্কে বলেছেন-"পাঁচ ওয়াক্ত নামায কী ? এ তোমাদের বিভিন্ন অবস্থার প্রতিচ্ছবিস্বরূপ। বিপদকালে তোমাদের জীবনে স্বাভাবিক গতিতে পাঁচটি পরিবর্তন সংঘটিত হয় এবং তোমাদের প্রকৃতির পক্ষে তদ্রূপ পরিবর্তন আবশ্যক।

(ক) সর্বপ্রথম পরিবর্তন তখন হয়, যখন তোমাদেরকে কোন আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে অবহিত করা হয়। মনে করো, তোমাদের নামে আদালত হতে এক ওয়ারেন্ট জারী করা হলো। তোমাদের শান্তি ও সুখে ব্যাঘাত ঘটাবার এটাই প্রথম অবস্থা। বস্তুত এ অবস্থা অবনতির অবস্থার সাথে তুলনীয়। কেননা এ হতে তোমাদের সুখের অবস্থার পতন আরম্ভ হয়। এ অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তোমাদের জন্য যোহরের নামায নির্ধারিত হয়েছে। এর ওয়াক্ত সূর্যের নিম্নগতি হতে আরম্ভ হয়।

(খ) দ্বিতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন তোমরা বিপদের অতি সন্নিকট হও। মনে করো, তখন তোমরা ওয়ারেন্ট দ্বারা গ্রেফতার হয়ে বিচারকের সামনে উপস্থিত হয়েছ। এ অবস্থায় ভয়ে তোমাদের রক্ত শুকিয়ে যেতে থাকে এবং শান্তির আলো তোমাদের নিকট হতে অপসারিত হওয়ার উপক্রম হয়। সুতরাং তোমাদের এ অবস্থা সেই সময়ের ন্যায় যখন সূর্যের আলো ক্ষীণ হয়ে আসে, সে আলোর প্রতি দৃষ্টিপাতও করা যায় এবং স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, এখন সূর্য অস্তমিত হবার সময় সন্নিকটে। এরূপ আধ্যাত্মিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে আসরের নামায নির্ধারিত হয়েছে।

(গ) তৃতীয় পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে যখন এ জাতীয় বিপদ হতে মুক্তি লাভের আশা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়– অর্থাৎ, তখন যেন তোমাদের নামে চার্জশীট লেখা হয় এবং তোমাদের ধ্বংস সাধনের জন্য বিরুদ্ধবাদীদের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থিত করা হয়। এ অবস্থায় তোমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পায় এবং তোমরা নিজেদের কয়েদী জ্ঞান করতে থাক। সুতরাং এ অবস্থা সেই সময়ের সদৃশ্য যখন সূর্য অস্তমিত হয় এবং দিবালোকের সব আশার অবসান হয়। এরূপ আধ্যাত্মিক অবস্থার সাথে সংযোগ রেখে মাগরিবের নামায নির্ধারিত করা হয়েছে।

(ঘ) চতুর্থ পরিবর্তন তোমাদের উপর তখন আসে, যখন বিপদ তোমাদের উপর প্রকৃতই

পতিত হয় এবং এর ঘন অন্ধকার তোমাদের আচ্ছাদিত করে ফেলে। অর্থাৎ, চার্জশীট প্রস্তুত ও সাক্ষ্য গ্রহণের পর শাস্তির আদেশ তোমাদের শুনানো হয় এবং কারাদন্ডের জন্যে কোন পুলিশের নিকট সোপর্দ করা হয়। সুতরাং এ অবস্থা সে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রাখে যখন রাত্র আরম্ভ হয় এবং গভীর অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। এরূপ আত্মিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এশার নামায নির্ধারিত হয়েছে।

(ঙ) এরপর যখন তোমরা এক দীর্ঘকাল এ বিপদের অন্ধকারে অতিবাহিত কর, তখন পুনরায় তোমাদের প্রতি খোদা তা'লার করুণা উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তোমাদেরকে অন্ধকার হতে মুক্তি দান করে। যেমন অন্ধকারের পর পুনরায় প্রভাত দেখা যায় এরপর সেই আলো দিনের উজ্জ্বলতা নিয়ে প্রকাশিত হয়। এরূপ রূহানী অবস্থার মোকাবেলায় ফজরের নামায নির্ধারিত হয়েছে।

খোদা তা'লা তোমাদের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের পাঁচটি অবস্থা লক্ষ্য করেই তোমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্ধারণ করেছেন। এ হতে তোমরা উপলব্ধি করতে পার, এসব নামায শুধু তোমাদের আত্মিক মঙ্গলের জন্যেই নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা যদি এসব বিপদ হতে মুক্তি পেতে চাও, তবে এ পাঁচ ওয়াক্তের নামায পরিত্যাগ করো না। এগুলো তোমাদের অভ্যন্তরীণ ও আত্মিক পরিবর্তনের প্রতিবিম্বস্বরূপ। নামাযে আসন্ন বিপদের প্রতিকার রয়েছে। তোমরা অবগত নও, উদীয়মান নব দিবস তোমাদের জন্যে কী নিয়তি (কাযা ও কদর) নিয়ে উপস্থিত হবে। সুতরাং দিনের শুরুতেই তোমরা তোমাদের মাওলা (প্রকৃত অভিভাবক)-এর কাছে সবিনয় নিবেদন করো, যেন তোমাদের জন্য মঙ্গলময় এবং আশিসপূর্ণ দিনের আগমন হয়।" (কিশতিয়ে নূহ্)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেছেন, "স্মরণ রেখো, নামায এমন এক জিনিস, এ দিয়ে দুনিয়াও সাজানো যায় এবং ধর্মও সাজানো যায়। কিন্তু বেশির ভাগ লোক যে নামায পড়ে, সেই নামায তাদের অভিশাপ দেয়। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ

(ফাওয়ায়লুল্লিল মুসাল্লীনাল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন)

অর্থ: দুর্ভোগ সেইসব নামাযীদের জন্যে যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। (সূরা মাউন : ৫-৬)। নামায এমন এক জিনিস, এ পড়লে সব রকম মন্দ কাজ এবং নির্লজ্জতা হতে রক্ষা পাওয়া যায়।" (মালফুযাত, ১০ম খন্ড, পৃ. ৬)

নামাযে রুকু , সিজদা ইত্যাদির তাৎপর্য

[যুগ-ইমাম হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বক্তব্যের আলোকে]

"নামায ওঠা বসার নাম নয়। নামাযের সারবস্তু ও আত্মা হলো দোয়া– যা নিজের মাঝে এক প্রকার স্বাদ ও আনন্দ সৃষ্টি করে। প্রকৃতপক্ষে আরকানে নামায (দাঁড়ানো, রুকু, সিজদা ইত্যাদি) আদব দেখানোর পদ্ধতি। আরকানে নামায আধ্যাত্মিক ওঠা-বসাস্বরূপ। মানুষকে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দন্ডায়মান হতে হয়। আর দাঁড়ানোও সেবকগণ কর্তৃক (প্রভুকে) সম্মান দেখানোর একটি পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

রুকু এর দ্বিতীয় অংশ। এটি ব্যক্ত করে যে, আদেশ পালনের প্রস্তুতি হিসেবে মাথাকে যেন সম্পূর্ণ ঝুঁকিয়ে দেয়া হয়েছে। আর সিজদা হলো চূড়ান্ত সম্মান ও পরম বিনয় এবং অস্তিত্ব বিলুপ্তির পরিচায়ক। ইবাদতের আসল উদ্দেশ্যে এ আদব ও পদ্ধতি খোদা তা'লা স্মারকচিহ্ন হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। দেহকে আধ্যাত্মিক পদ্ধতির মাঝে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার খাতিরে এক বাহ্যিক পদ্ধতিও রেখে দেয়া হয়েছে। এখন যদি বাহ্যিক পদ্ধতিতে (যা অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতির এক প্রতিবিম্ব) কেবল বানরের মত অনুকরণ করা হয় এবং একে যদি এক বড় বোঝা মনে করে বাইরে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তুমিই বলো, এর মাঝে কি স্বাদ ও আনন্দ লাভ হতে পারে? আর যখন পর্যন্ত স্বাদ ও আনন্দ না লাগে ততক্ষণ এর তাৎপর্য লাভের অধিকারী কীভাবে হবে? যখন আত্মাও সম্পূর্ণ বিলীন ও বিনত হয়ে ঐশী দরগাহে পতিত হয় এবং নামাযী যে কথা বলে তার আত্মাও যেন সঙ্গে সঙ্গে তা বলতে থাকে– সেই সময়ে এক সুখ ও জ্যোতি এবং স্বস্তি লাভ হয়।"(মালফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৪-৬৫)।

"স্মরণ রেখ, নামাযে নামাযীর অবস্থা আর তার বক্তব্য উভয়ই একীভূত হওয়া জরুরী। কখনো-কখনো সংবাদ চিত্রের আকারে দেখানো হয়ে থাকে। এমন চিত্র দেখানো হয় যদ্বারা দর্শকের এ উপলব্ধি হয় যে তার ইচ্ছা এরূপ। নামাযের মাঝেও ঐশী আকাঙ্ক্ষার চিত্র এরূপ। নামাযের মাঝে যেভাবে জিহ্বা দ্বারা কিছু পাঠ করা হয় সেভাবেও অঙ্গ-প্রতঙ্গের সঞ্চালনেও কিছু দেখিয়েও দেয়া হয়। যখন মানুষ দন্ডায়মান হয় এবং (আল্লাহ্ তা'লার) প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করে সে অবস্থার নাম রাখা হয়েছে কিয়াম (দন্ডায়মান হওয়া)। এখন সব মানুষই অবগত আছে, প্রশংসা ও গুণকীর্তনের যথার্থ অবস্থা কিয়াম-ই। বাদশাহের সামনে যখন তাঁর গুণকীর্তন করতে যাওয়া হয় তখন তো তা দাঁড়িয়ে উপস্থাপন করতে হয়। তাই একদিকে বাহ্যিকভাবে কিয়ামকে রাখা হয়েছে অন্য দিকে মৌখিকভাবে প্রশংসা ও গুণকীর্তনও রাখা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এটাই যেন আধ্যাত্মিকভাবেও আল্লাহ্ তা'লার সামনে দন্ডায়মান হয়। প্রশংসা কোন এক কথার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি সত্যবাদী হয়ে কারও প্রশংসা করে তাহলে সে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যায়। সে ব্যক্তি যে 'আল্হামদুলিল্লাহ্'– অর্থাৎ, সব প্রশংসা

আল্লাহ্‌র বলে তার জন্যে এটা আবশ্যক হয় যে, সে যথার্থভাবে তখনই আলহামদুলিল্লাহ্‌ বলতে পারে যখন তার পরিপূর্ণভাবে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'লার। স্বস্তির সাথে অন্তরে যখন এ কথা সৃষ্টি হবে তখন এটাই আধ্যাত্মিক কিয়াম। কেননা, অন্তর এর উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আবার এটা উপলব্ধি করে যে, সে দন্ডায়মান রয়েছে। অবস্থা অনুযায়ী দন্ডায়মান হয়ে গেছে যেন আধ্যাত্মিক কিয়ামের সৌভাগ্য লাভ হয়।

এরূপে রুকুর মাঝে 'সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আযীম' (পবিত্র আমার প্রভু অতি মহান) পাঠ করা হয়। নীতিগত কথা হল, যখন কারও মহত্ত্ব মেনে নেয়া হয় তখন তার প্রতি বিনত হওয়া জরুরী। মহত্ত্বের চাহিদা হল, তাঁর উদ্দেশ্যে যেন রুকু করা হয়– অর্থাৎ, বিনত হয়। অতএব মুখ দিয়ে বলা হলো- 'সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আযীম' এবং কার্যত রুকু করে বিনত হয়ে দেখানো হলো– অর্থাৎ, এটা কথার সাথে কাজেও দেখানো হলো। এরূপে তৃতীয় কথা 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা (পবিত্র আমার প্রভু অতি উচ্চ) 'আলা' হলো উলার তফযীল (সর্বাধিক অর্থে বুঝানো)। এর প্রত্যাশা হলো সিজদা। এজন্যে এর সাথে কার্যত চিত্র হলো সিজদায় নিপতিত হওয়া। এ স্বীকৃতির যথার্থ অবস্থা হলো তাৎক্ষণিকভাবে বিলীন হওয়া।

এ কথার সাথে ৩টি শারীরিক অবস্থা সম্পৃক্ত। প্রথম চিত্র এর আগে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক প্রকারের কিয়ামের কথা বলা হয়েছে। জিহ্বা শরীরের একটি অঙ্গ, সে-ও বলল। আর সে-ও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। তৃতীয় জিনিস অন্যটি। যদি তা অংশ না নেয় তাহলে নামায হয় না। সেটা কী ? সেটা অন্তর বা মন। এর জন্যে আবশ্যক, অন্তরেরও কিয়াম হোক। আর আল্লাহ্‌ তা'লা তার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, প্রকৃতই সে প্রশংসাও করছে এবং দন্ডায়মানও হয়েছে এবং তার অন্তরও দন্ডায়মান হয়ে প্রশংসা করছে। কেবল দেহই নয় মনও দন্ডায়মান আছে। আর যখন 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলে তখন যেন লক্ষ্য করে, কেবল এতটুকুই নয় যে মহত্ত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছে বরং সাথে-সাথে বিনতও হচ্ছে এবং সাথে-সাথে অন্তরও বিনত হয়ে গেছে। এভাবে তৃতীয় দৃশ্য খোদার সামনে সিজদায় পতিত হওয়া। তাঁর উচ্চ মর্যাদা সম্মুখে রেখে এর সাথেই দেখবে, ঐশী দরগাহে আত্মাও পড়ে আছে। সোজা কথা যতক্ষণ এ অবস্থার সৃষ্টি না হয় তখন স্বস্তি আসে না। কেননা 'ইউকিমুনাস সালাতা' তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে- এর অর্থ এটাই। (মালফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩৩-৪৩৫)।

"নামাযের মাঝে যতগুলো দৈহিক বিভিন্ন অবস্থাদি রয়েছে এ সবের সাথে অন্তরও যেন সেভাবে অনুকরণ করে। যদিও শারীরিকভাবে দন্ডায়মান হও তাহলে মনকেও খোদার আনুগত্যের জন্যে দন্ডায়মান করো। যদি বিনত হও তো অন্তরকেও সেভাবে বিনত করো। যদি সিজদা করো তাহলে মনকেও সেভাবে সিজদা করা উচিত। মনের সিজদা হলো, কোন অবস্থায়ই যেন খোদাকে ছেড়ে দেয়া না হয়। যখন এরূপ অবস্থা হবে তখন

পাপ দূরে সরে যেতে শুরু করবে।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৭৬)।

"খোদা তা'লা আত্মা ও দেহের সাথে একটি নিবিড় সম্পর্ক রেখে দিয়েছেন। আর দেহের প্রভাব সর্বদাই আত্মার উপরে পড়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তি ভান করে কাঁদতে চায় তাহলে অবশেষে তার কান্না এসেই যাবে এবং এভাবে যে ভান করে হাসতে চায় অবশেষে তার হাসি পেয়েই যায়। এভাবে নামাযের মাঝে দেহের উপর যেসব অবস্থার সৃষ্টি হয় যেমন, দন্ডায়মান হওয়া বা রুকু করা, এর সাথে মনের উপরও প্রভাব সৃষ্টি হয়। দেহের মাঝে যতটুকু শ্রদ্ধা-ভক্তির অবস্থা প্রদর্শন করে ততটুকু আত্মায়ও সৃষ্টি হয়। যদি খোদা নিজের পক্ষ থেকে সিজদা কবুল না করেন তবুও সিজদার সাথে আত্মার একটি সম্পর্ক আছে। এজন্যে নামাযের মাঝে শেষ পর্যায়ে সিজদাকে রাখা হয়েছে যখন মানুষ শ্রদ্ধা-ভক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন সে সিজদাই করতে আকাঙ্ক্ষা করে। পশুদের মাঝেও এ অবস্থার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। কুকুরও যখন তার প্রভুকে আদর করে তখন এসে তার পায়ের উপর নিজের মাথা রেখে ভালোবাসার সম্পর্কের প্রকাশ সিজদার আকারে করতে থাকে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, দেহের সাথে আত্মার একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এভাবেই মনের অবস্থাসমূহের প্রভাব শরীরের ওপর প্রতিফলিত হয়ে যায়। যখন মন বিনীত হয় তখন দেহের ওপরে তার প্রভাব ছেয়ে যায় এবং অশ্রু ও বিমর্ষ অবস্থার প্রকাশ পায়। যদি দেহ ও মনের মাঝে সম্পর্ক না হয় তাহলে এরূপ কেন হয়? রক্তকে প্রবাহমান রাখাও হৃৎপিন্ডের একটি কাজ। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই, হৃৎপিন্ড শরীরে পানি সিঞ্চনের জন্যে একটি ইঞ্জিনস্বরূপ। এর সম্প্রসারণ ও সংকোচনে সব কিছু হয়ে থাকে।

মোটকথা, দেহ ও মন উভয়েরই কার্য পাশাপাশি চলছে। মনের মাঝে যখন বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন দেহের মাঝেও তা সৃষ্টি হয়। এ জন্যে যখন মনে প্রকৃতই বিনয় ও শ্রদ্ধা ভক্তির অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন শরীরে এর প্রভাব স্বতই সৃষ্টি হয়ে যায়। আর এভাবেই শরীরের ওপর একটি পৃথক প্রভাব পড়ে আর মন এতে প্রভাবান্বিত হয়ে যায়। এ জন্যে জরুরী, যখন নামাযের জন্যে খোদার সকাশে দন্ডায়মান হও তখন অবশ্যই নিজের অস্তিত্বে বিনয় ও শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করো। যদিও এ সময়ে এটা এক প্রকার কপটতাস্বরূপ। কিন্তু আস্তে-আস্তে এর প্রভাব স্থায়ী হয়ে যায় আর প্রকৃতই মনে সেই শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আত্মবিলীনতার গুণ সৃষ্টি হতে থাকে।" (মালফুযাত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৪২১-৪২২)।

"আর আমি প্রথমে কিয়াম, রুকু ও সিজদা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছি। এতে মানবিক অনুনয়-বিনয়ের আকৃতি ও নকশা দেখানো হয়েছে। প্রথমে কিয়াম করা হয়। যখন এতে উন্নতি লাভ হয়, তখন রুকু করা হয় আর যখন পুরোপুরি বিলীনতার ভাব সৃষ্টি হয় তখন সিজদায় পতিত হয়ে যায়। আমি যা কিছু বলি তা অন্ধ অনুকরণ বা আচরণ হিসাবে বলি না বরং নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলি। বরং প্রত্যেকেই একে এভাবে পড়ে এবং পরীক্ষা

করে দেখতে পারে। এ ব্যবস্থাকে সর্বদা স্মরণ রাখো আর এ থেকে উপকৃত হও। **যখন কোন দুঃখ বা দুর্দশায় পতিত হও তখনই নামাযে দন্ডায়মান হয়ে যাও এবং যে দুর্দশা ও কষ্টে পতিত হয়েছ তা সবিস্তারে আল্লাহ্‌র সমীপে নিবেদন করো। কেননা অবশ্যই খোদা আছেন আর তিনিই একমাত্র অস্তিত্ব যিনি মানবকে প্রত্যেক প্রকারের কষ্ট ও দুর্দশা থেকে বের করতে পারেন। তিনি নিবেদনকারীর নিবেদন শুনেন। তিনি ছাড়া আর কেউ সাহায্যকারী হতে পারে না। মানুষ বড়ই দুর্বল, যখন সে দুর্দশায় পতিত হয়। সে উকিল, চিকিৎসক অথবা অন্যান্য লোকদের প্রতি মনোযোগ দেয়। কিন্তু খোদা তা'লা র কাছে মোটেও যায় না। মু'মিন সে, যে সর্বপ্রথম খোদা তা'লা র কাছে দ্রুত গমন করে।"**

(মালফুযাত, ৯ম খন্ড, পৃ. ১১৩১)।

নামাযের ওয়াক্ত বা সময়

দিনে পাঁচবার নামায পড়া ফরয। এ পাঁচবার নামাযের ওয়াক্ত বা সময় হচ্ছে:
ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা।

• ফজর: ভোরের আলো প্রকাশের শুরু হতে সূর্য ওঠার পূর্ব পর্যন্ত।
• যোহর: দুপুরের সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার অনুরূপ হওয়া পর্যন্ত। ঘড়ির সময়ানুযায়ী নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে যোহরের সম্পূর্ণ সময় প্রায় তিন ঘন্টা হয়ে থাকে। যোহরের নামায গ্রীষ্মকালে কিছুটা দেরী করে আর শীতকালে তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম।
• আসর: প্রত্যেক জিনিসের ছায়া তার দ্বিগুণ হবার থেকে শুরু করে পশ্চিম আকাশে লাল বর্ণধারণ করার আগে তথা সূর্য-ডোবার পূর্ব পর্যন্ত।
• মাগরিব: সূর্য অস্ত যাবার পর থেকে পশ্চিমাকাশে লালিমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত।
• এশা: সূর্য ডোবার এক বা সোয়া ঘন্টা পর– অর্থাৎ, রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত।

মেরু অঞ্চলে যেখানে দিন বা রাত্রি অনেক দীর্ঘ হয়ে থাকে সেখানে সময় অনুমান করে ঘড়ির সময়ানুসারে নামায, রোযা ইত্যাদি পালন করতে হবে। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ৩৭-৩৮)

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

নিম্নোক্ত সময়ে যেকোন ধরনের ফরয কিংবা নফল নামায পড়া নিষেধ।
(১) সূর্য উদিত হবার সময় থেকে এক বর্শা পরিমাণ উপরে উঠা পর্যন্ত।
(২) ঠিক দুপুর বেলা যখন সূর্য একেবারে মাথার উপরে থাকে। যদিও জুমু'আর দিন এ সময়ে মসজিদে দুই রাকা'ত নফল নামায পড়ার অনুমতি আছে ।

(৩) সূর্য অস্তমিত হবার সময়।
এছাড়া নিম্নলিখিত সময়ে কেবল নফল নামায পড়া মাকরূহ বা অপছন্দনীয়।

• ফজরের নির্ধারিত সময়ের পর থেকে নিয়ে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত সময়ে ২ রাকা'ত সুন্নত ছাড়া আর কোন নফল নামায পড়া বৈধ নয়।
• আসরের নামায পড়ার পর নফল নামায পড়া বৈধ নয়।
• ঈদের দিন সূর্য উঠার পর ঈদগাহে বা ঈদের নামাযের স্থানে কোন নফল পড়া বৈধ নয়। ঈদের নামাযের আগেও নয় এবং পরেও নয়।
• নামায বা-জামাত হচ্ছে এমন অবস্থায় মসজিদে নিজে নিজে সুন্নত বা নফল পড়া বৈধ নয়।
• এছাড়া তন্দ্রা বা ঘুমে আচ্ছন্ন অবস্থায়ও নামায নিষেধ। এরূপ অবস্থায় প্রথমে ঘুমিয়ে নিতে হবে। ঘুম হতে উঠে পরে নামায পড়তে হবে।
• খানা কা'বা– অর্থাৎ, মসজিদুল হারামে যে কোন সময়ে সুন্নত বা নফল নামায পড়া যেতে পারে। কেননা, সেখানে সব সময় কা'বার তাওয়াফ প্রদক্ষিণ করা যেতে পারে এবং প্রত্যেক বার তাওয়াফের পর দুই রাকা'ত নামায পড়া জরুরী। একে তাওয়াফের নামায বলে।
• সূর্যগ্রহণের সময় 'নামাযে কসুফ' যেকোন সময় পড়া যায়। সূর্য উঠছে বা ডুবে যাচ্ছে, ঠিক দুপুর বেলা বা আসরের নামাযের পর যখনই গ্রহণ লাগে নামায আরম্ভ করে দেয়া আবশ্যক। কেননা, এ নামাযের কারণ হলো সূর্যগ্রহণ। এটা যে সময় লাগুক না কেন সে সময়েই এ নামায পড়তে হবে।

দিনের বিভিন্ন সময় নামায পড়তে নিষেধ করার মাঝে এ প্রজ্ঞা নিহিত, যেন এ দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে যে আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য ও অনুবর্তীতা। খোদা যখন নামায পড়তে বলবেন তখন পড়বে, আর যখন বলবেন নামায পড়বে না– তখন উত্তম সময়-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নামায পড়া পুণ্যের কাজ হবে না। কেননা পুণ্য ও প্রকৃত ইবাদত সেটাই যা আল্লাহ্ তা'লা পছন্দ করেন।

এসব সময়ে নামাযের নিষেধাজ্ঞার মাঝে এ প্রজ্ঞাও নিহিত- এর মাঝে কোন-কোন সময় বিশেষ করে সূর্য উদিত ও অস্ত যাওয়ার সময় মুশরিক ও মূর্তি পূজারীরা তাদের মিথ্যা উপাস্য দেবতাদের উপাসনা করে থাকে। যেহেতু এসব সময় শিরক ও কুফরীর চিহ্নে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তাই তৌহীদ (একত্ববাদ)-এর অনুসারীদের কুফরী ও শিরকের এ চিহ্ন থেকে দূরে রাখার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং ইসলামের বিশেষ ইবাদতের সঠিক সঠিক সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এটা নিজের মাঝে আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি বহন করে থাকে। উক্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে এ প্রজ্ঞার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, কোন সময় এমন হওয়া উচিত যাতে মানবীয় মেধা অবসর লাভ করে। নচেৎ ধারাবাহিক ব্যস্ততার কারণে তা অকেজো হয়ে যাবে। আঁ-হযরত (সা.) একবার বলেছেন, "মানুষ

যখন নামায পড়তে-পড়তে হাঁপিয়ে যায় তখন তার বিশ্রাম নেয়া আবশ্যক।" এ সকল উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিপটে রেখে এসব সময় আবশ্যিক অবসর রাখা হয়েছে যেন কোন খেয়ালী ব্যক্তি আবার চব্বিশ ঘন্টাই নামায পড়তে লেগে না যায়। আর তার জন্য কিছু সময় এমনও এসে যায় যাতে সে অবসর হতে এবং নামায পরিহার করতে বাধ্য হয়। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ৪৫-৪৬, অনুবাদঃ আলহাজ্জ মুহাম্মদ মুতিউর রহমান)

নামাযের রাকা'ত

নামাযের নাম	প্রথম সুন্নত	ফরয	শেষের সুন্নত	নফল
ফজর	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত		
যোহর	৪ রাকা'ত	৪ রাকা'ত	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত
আসর	৪ রাকা'ত	৪ রাকা'ত		
মাগরিব		৩ রাকা'ত	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত
এশা	৪ রাকা'ত	৪ রাকা'ত	২ রাকা'ত	২ রাকা'ত
বিতর	এশার নামাযের পর তিন রাকা'ত বিতর নামায পড়তে হয়। এটা ওয়াজিব। অথবা তাহাজ্জুদ নামাযের পরও এ নামায পড়া যায়।			

নামাযের আদব

১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় কিবলামুখী– অর্থাৎ, কা'বামুখী হয়ে নামায পড়তে হয়। দু'জনের মাঝে খালি জায়গা না রেখে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নামাযের জামাতে কাতার সোজা করা উচিত।

২) নামাযে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ধ্যান আল্লাহ্ তা'লার দিকে নিবদ্ধ রাখতে হয়। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰہَ کَاَنَّکَ تَرٰہُ وَاِنْ لَمْ تَکُنْ تَرٰہُ فَاِنَّہٗ یَرٰکَ

(আন তা'বুদাল্লাহা কাআন্নাকা তারাহু ওয়া ইন লাম তাকুন তারাহু ফাইন্নাহু ইয়ারাকা)
অর্থঃ তুমি আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এমনভাবে করো যেন তুমি খোদাকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে মনে করো খোদা নিশ্চয় তোমাকে দেখছেন।

৩) প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায ঠিক সময়ে নিষ্ঠার সাথে আদায় করতে হয়। ফরয নামায মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করাই উত্তম। একান্ত অপারগ হলে ঘরে অন্তত পরিবারের সবাইকে নিয়ে জামাতে নামায পড়া উচিত। কেননা হাদীসে এসেছে, "বা-জামাত নামায আদায় করলে সাতাশ গুণ অধিক সওয়াব পাওয়া যায়।" (মুসলিম,

কিতাবুস সালাত)।

৪) নামাযে যা পাঠ করা হয়, তা ধীরে-ধীরে বুঝে পাঠ করা উচিত।

৫) নামায পড়ার সময়ে চোখ খোলা রাখতে হয় এবং এদিক-সেদিক না তাকিয়ে সিজদার জায়গার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হয়।

৬) নামায পড়ার সময় দেয়ালে বা কোন কিছুতে ঠেস দেয়া বা এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো ঠিক নয়। কাতার সোজা রাখা, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে নামায পড়া আবশ্যক।

৭) নামাযে নির্ধারিত আরবি দোয়া ছাড়াও মাতৃভাষায় সিজদায় আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত।

৮) নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করা নিষেধ। এর গুরুত্ব বোঝাবার জন্য হযরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন,**"কাউকে যদি ৪০ বছর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, তবুও সে যেন নামাযীর সম্মুখ দিয়ে না যায়।"**

৯) মসজিদে নামায ছাড়াও অন্য সময় খোদা তা'লার যিকর বা গুণগান করা উচিত। এছাড়া কখনো-কখনো ঘরেও সুন্নত বা নফল নামায পড়া উচিত অথবা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বা-জামাত নামায পড়া উচিত, যাতে করে বাড়ি-ঘরও খোদা তা'লার যিকর থেকে খালি না থাকে। (মুসলিম, কিতাবুস সালাত)।

১০) নামায বা-জামাত হতে থাকলে তৎক্ষণাৎ জামাতে শামিল হওয়া উচিত। ফজরের নামাযের সুন্নত ফরয নামায আদায় করার পূর্বে পড়া না হয়ে থাকলে ফরয নামাযের পর অবশ্যই পড়ে নিতে হবে। মাগরিব ও এশা নামায জমা হয়ে থাকলে মাগরিব ও এশার দুই রাকা'ত সুন্নত নামায আদায় করা জরুরী নয়। কেউ যদি ইমামের রুকুকালীন অবস্থায় রুকুতে শামিল হয়ে যায় তাহলে তিনি ঐ রাকা'ত পেয়েছেন বলে ধরা হবে। যখন নামায শুরু হয়ে যায় তখন দৌড়ে শামিল হওয়া ঠিক নয়। বরং ধীর-স্থিরভাবে এসে নামাযে যোগ দেওয়া উচিত। (মুসলিম, কিতাবুস সালাত)।

১১) নামাযের জন্য শরীর, জামা-কাপড়, জায়নামায প্রভৃতি অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। নামায খোদার দরবারে গৃহীত হওয়ার জন্য এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। এ জন্য নামাযের আগে ওযু এবং প্রয়োজন হলে গোসল করে নিতে হবে।

১২) অসুস্থ ব্যক্তি অপারগ অবস্থায় দাঁড়িয়ে না পারলে বসে, শুয়ে বা ইশারায় নামায পড়বে।

১৩) যদি কেউ সুন্নত বা নফল নামায পড়তে থাকে এবং তখন ফরয নামাযের জামাত আরম্ভ হয়ে যায়, তবে তার সেই নামায ছেড়ে দিয়ে অথবা অতি দ্রুত সংক্ষেপ করে জামাতে শামিল হওয়া জরুরী। কেননা বা-জামাত ফরয চলাকালীন সময়ে সুন্নত নামায হয় না। জুমু'আর খুতবা চলাকালীন সময়ে কেউ মসজিদে উপস্থিত হলে তখন তাড়াতাড়ি

দুই রাকা'ত সুন্নত আদায় করে নিতে হবে। কেননা খুতবা শুনাও ফরয। তখন সুন্নত না পড়লে এক্ষেত্রে পরে সানী খুতবার সময়ে তাড়াতাড়ি দুই রাকা'ত সুন্নত পড়ে নিতে হবে। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ১৬২)।
১৪) ভ্রমণরত অবস্থায় যানবাহনের ওপর বসা অবস্থায়ও নামায পড়া যায়।
১৫) পবিত্র কুরআনের আয়াত ছাড়া আর সব দোয়াই রুকু ও সিজদাতে করা যায়।

নামাযের শর্তসূমহ

যেরূপে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মহামর্যাদাসম্পন্ন কাজ শুরু করার পূর্বে উপযুক্ত প্রস্তুতির প্রয়োজন, তদ্রূপ নামাযের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতকে শুদ্ধ ও পরিপূর্ণভাবে আদায় করার জন্য কিছু বিষয় পূর্বে করা আবশ্যক যেগুলিকে 'নামাযের শর্ত' বলা হয়। নামাযের শর্ত হল পাঁচটি। এগুলো হল–
১) সময়
২) পবিত্রতা (সুযোগ-সুবিধানুযায়ী গোসল, ওযু বা তৈয়ম্মম প্রভৃতি দ্বারা)। এমনকি নামাযের স্থানও পবিত্র হওয়া আবশ্যক।
৩) সতর ঢাকা– অর্থাৎ, নগ্নতা ঢাকা।
৪) কিবলা– অর্থাৎ, কা'বা ঘরের দিকে মুখ করা।
৫) নিয়ত (ফরয, সুন্নত, নফল প্রভৃতি যে নামায পড়া হয় তার নিয়ত করা)।

ওযুর নিয়ম

১. প্রথমে (বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম) পাঠ করা।
২. দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া।
৩. তিনবার ভালভাবে কুলি করে উত্তমরূপে মুখ পরিষ্কার করা। প্রয়োজনে দাঁত মাজা।
৪. তিনবার নাকে পানি দিয়ে বাম হাতে নাক ভালভাবে পরিষ্কার করা।
৫. তিনবার অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে সম্পূর্ণ মুখমন্ডল ধোয়া।
৬. দাড়ি ঘন হলে আঙ্গুল দিয়ে খিলাল করে নেয়া।
৭. তিনবার করে প্রথমে পুরো ডান ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধোয়া।
৮. দু'হাত ভিজিয়ে নিয়ে প্রথমে মাথা, পরে কান ও ঘাড় মুছে ফেলা। একে মাসাহ্ করা বলে।
৯. প্রথমে ডান ও পরে বাম পা গোড়ালী পর্যন্ত ধুয়ে ফেলা।
• মোজা মাসাহ্: যিনি মুসাফির (সফররত) নন তিনি সকালে ওযু করে মোজা পরে থাকলে পরবর্তী সকাল পর্যন্ত পা না ধুয়ে শুধু মোজার উপর ভিজা হাত বুলিয়ে নিবেন। আর যিনি মুসাফির তিনি ওযু করে মোজা পায়ে রেখে থাকলে তিনদিন পর্যন্ত ওযু করে

মোজায় মাসাহ্ করতে পারবেন। (মেশকাত)। পাগড়ী মাসাহ্ করার ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এ ব্যাপারে মতভেদ আছে, তবে আমার দৃষ্টিতে জায়েয। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ৫৭)।
১০। হাত ও পা ধোয়ার সময় আঙ্গুল খিলাল করা।
• নোট : নিয়মিত দাঁত মাজা রসূল করিম (সা.)-এর একটি বিশেষ সুন্নত। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর উম্মতকে বিশেষভাবে তাগিদ প্রদান করেছেন। আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, **"যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর না হতো তাহলে আমি প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মেসওয়াক করার আদেশ দিতাম।"** (সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল জুমু'আ)।

তৈয়ম্মম

পানি না পাওয়া গেলে বা পাওয়া খুবই দুষ্কর হলে, কিংবা পানি ব্যবহার করলে রোগ বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা থাকলে ওযু বা গোসলের পরিবর্তে তৈয়ম্মম করাই যথেষ্ট। (সূরা নিসা : ৪৪)। বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে উভয় হাত পরিষ্কার পবিত্র মাটি, পাথর বা দেয়ালে ঘষে প্রথমে সম্পূর্ণ মুখমন্ডল এবং পরে দু'হাত কনুই পর্যন্ত বা কেবল কব্জি পর্যন্ত মুছে ফেলতে হয়। হাত মোছার সময় আঙ্গুল খিলাল করা ভাল।

ওযু করার পরের দোয়া

اَشْهَدُاَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّااللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ط
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

(আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত্তাওয়্যাবীনা ওয়াজআলনী মিনাল মুতাতাহ্হিরীন)
অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। হে আল্লাহ্! আমাকে তওবাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত করো এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।
(শাব্দিক: আল্লাহুম্মা- হে আল্লাহ!, ওয়াজআলনী- এবং আমাকে করো, মিনাত্তাওয়্যাবীনা- তওবাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত, মিনাল মুতাতাহ্হিরীন- পবিত্রতা অর্জনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত)
গোসল ও তৈয়ম্মম করার পরও এ দোয়া পাঠ করতে হয়।

যেসব কারণে ওযু থাকে না, পুনরায় করতে হয়

• প্রস্রাব বা পায়খানা করলে কিংবা প্রস্রাব বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হলে।
• ঘুমালে।
• দেহের কোন স্থান হতে রক্ত, পুঁজ প্রভৃতি গড়িয়ে পড়লে।
• বমি করলে।
তৈয়ম্মমও উপরোক্ত কারণে ভঙ্গ হয়ে যায়।

গোসলের আদব কায়দা

গোসলের ফরয তিনটি। যথা:-
(১) কুলি করা।
(২) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা।
(৩) এরপর পানি ঢেলে সমস্ত শরীর এমনভাবে ধুয়ে ফেলা যেন কোন স্থান শুকনো না থাকে।
গোসলের উত্তম নিয়ম হল, ঋতু অনুযায়ী গোসলকারী গরম বা ঠান্ডা পরিষ্কার পানি দিয়ে গোসল করবে। প্রয়োজনে প্রথমে প্রস্রাব-পায়খানা করে শৌচকর্ম করে নিবে। পরে ওযু করবে– অর্থাৎ, বিসমিল্লাহ্ পাঠ করে হাত ধৌত করবে। এরপর কুলি করে নাক পানি দিয়ে পরিষ্কার করবে। হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিবে। মাথা মাসাহ্ করবে। পরে সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালবে। প্রথমে ডান দিকে পরে বাম দিকে। গোসলের সময় ভালভাবে শরীর মলে পরিষ্কার করা আবশ্যক। সাবান বা ময়লা পরিষ্কার করার জন্যে কোন সুবিধাজনক উপকারী জিনিস ব্যবহার করাও গোসলের আদবের অন্তর্ভুক্ত। যেসব অবস্থায় গোসল করা ফরয সেসব অবস্থায় গোসল না করে মানুষ নামায পড়তে পারে না, কুরআন করিম পাঠ করতে পারে না এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মসজিদে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। পূর্ণরূপে গোসল করার পর আর ওযু করার প্রয়োজন হয় না।
(ফিকাহ আহমদীয়া, পৃষ্ঠা. ৫১, অনুবাদঃ আলহাজ্জ মুহাম্মদ মুতিউর রহমান)।

সতর ঢাকা ফরয (অবশ্যকর্তব্য)

নামাযের তৃতীয় শর্ত হলো সতর ঢাকা– অর্থাৎ, নগ্নতা ঢাকা। পোষাকের কারণে মানুষকে মর্যাদাসম্পন্ন মনে হয়। তাই পরিষ্কার এবং সতর ঢাকে এমন পোষাক পরিধান করে যেন মানুষ নামাযে যায়। পুরুষের সতর হলো কমপক্ষে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা। নচেৎ নামায হবে না। মহিলারা নামায পড়ার সময় কেবল মুখ খোলা রাখবে। তবে শর্ত হল, যেন কোন না-মাহরাম (যার সাথে বিয়ে বৈধ এমন পুরুষ) সেখানে না থাকে। মহিলারা

কব্জি পর্যন্ত এবং পায়ের গোড়ালির নিচ অংশ পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখতে পারে। তবে তাদের চুল, লজ্জাস্থান, দুই বাহু, পায়ের গোছা এবং দেহের বাকী সমস্ত অংশ পর্দায় আবৃত রাখতে হবে। ফিনফিনে পাতলা কাপড়, যার ভেতর দিয়ে দেহ দেখা যায়, নামাযের সময় পরিধান করা উচিত নয়। ঢিলাঢালা কাপড় পরিধান করা উচিত। আঁটসাঁট কাপড়, যাতে সিজদা দিতে বা বৈঠকে বসতে কষ্ট হয়, এমন কাপড় পরা ঠিক নয়। খালি মাথায় নামায পড়া বা মাথায় তোয়ালে অথবা রুমাল দিয়ে নামায পড়াও অপছন্দনীয়। একইভাবে চাদর/লুঙ্গি, কাপড় এভাবে পরিধান করাও অনুচিত যা যেকোন সময় খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং এতে করে লজ্জাস্থান প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
পোষাক সম্পর্কে সাধারণ নির্দেশ হল, পুরুষ রেশমী পোশাক পরবে না। আর এমন পোষাকও পরবে না যাতে গর্ব, অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়। সব সময় সতর ঢাকা যেন উদ্দেশ্য হয় এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ সাদাসিধা পোষাক পরা আবশ্যক। কারো কাপড় অপবিত্র হলে এবং এতে অপবিত্রতা লেগে থাকলে আর তার কাছে বদল করে নেওয়ার আর কোন কাপড় না থাকলে নামায পড়ার সময় হলে সেই কাপড় নিয়েই নামায পড়ে নেবে। কাপড় পবিত্র নয় বা তার দেহে কোন কাপড় নেই এদিকে ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নয়। কেননা, কাপড়-চোপড়ের পবিত্রতার চেয়ে অন্তরের পবিত্রতাকে প্রাধান্য দেয়া আবশ্যক। সুতরাং এটি কিভাবে জায়েয হতে পারে, কাপড় অপবিত্র এ ধারণায় মনকে অপবিত্র করে নেয়া আর এই বাহানায় নামায ছেড়ে দেয়া? (তফসীরে কবীর, ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ৬৪-৬৫, অনুবাদঃ আলহাজ্জ মুহাম্মদ মুতিউর রহমান)।

আযান

নামাযের সময় যেসব বাক্যের মাধ্যমে নামাযীদের আহ্বান করা হয় একে আযান বলে। যিনি আযান দেন তাকে বলা হয় মুয়ায্‌যিন। ওযু করে আযান দেয়া উচিত। মুয়াযযিন সাহেবকে কিবলামুখী হয়ে কোন উঁচু জায়গায় বা মসজিদের মিনারের ওপর দাঁড়িয়ে দু'কানে শাহাদাত আঙুল দিয়ে আযানের নিম্নোক্ত বাক্যগুলি শুদ্ধ ও উচ্চকণ্ঠে এবং সুমধুর সুরে উচ্চারণ করতে হয়।

আযানের কালাম (বাক্যাবলী)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(আল্লাহু আকবার)

অর্থঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। (চারবার)

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

(আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহ)
অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (দু'বার)

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

(আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রাসূলুল্লাহ)
অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্র রসূল। (দু'বার)

حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

(হাইয়্যা আলাস সালাহ্)
অর্থ: নামাযের দিকে এস। (দু'বার ডান দিকে মুখ করে বলতে হয়।)

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

(হাইয়্যা আলাল ফালাহ্)
অর্থ: সফলতার দিকে এস। (দু'বার বাম দিকে মুখ করে বলতে হয়।)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

(আল্লাহু আকবার)
অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। (দু'বার)

لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)
অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।
ফজরের আযানের সময় "হাইয়্যা আলাল ফালাহ্" বলার পর দু'বার

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

(আস্সালাতু খায়রুম্ মিনান্ নাওম)
অর্থ: (নিদ্রা অপেক্ষা নামায উত্তম) বলতে হয়। (দু'বার)

ইকামত

ফরয নামায আরম্ভ করার পূর্বে ইকামত বলতে হয়। ইকামত আযানের মতই। তবে আযানের বাক্যগুলো ইকামতের সময় চারবারের স্থলে দু'বার এবং দু'বারের স্থলে একবার করে কিছুটা দ্রুত উচ্চারণ করতে হয়। কিন্তু শেষে 'আল্লাহু আকবার' দু'বার বলতে হয় (মিশকাত, কিতাবুল আযান)। এছাড়া 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' বলার পর দু'বার

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

(কাদকামাতিস্ সালাহ্)
বলতে হয়। এর অর্থ হচ্ছে, এখনই নামায আরম্ভ হচ্ছে। মুয়াযযিন অনুপস্থিত থাকলে অন্য যে কেউ ইমামের অনুমতি সাপেক্ষে ইকামত বলতে পারেন। ইকামতের সময় কানে আঙ্গুল দিতে হয় না কিংবা ডানে ও বামে মুখ ফেরাতে হয় না।
আযান দেয়ার সময় আযানের শ্রোতাগণ মুয়ায্যিনের বাক্যগুলো মনে মনে আওড়াবেন তবে মুয়াযযিন যখন 'হাইয়্যা আলাস্সালাহ' এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ্' উচ্চারণ করবেন তখন শ্রোতারা বলবেন-

لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

(লা হাওলা ওয়ালা কুউয়াতা ইল্লাবিল্লাহ)
এর অর্থ: আল্লাহ্র সাহায্য ছাড়া কোন অসৎ কর্ম হতে বিরত থাকা এবং কোন সৎকাজ করার ক্ষমতা আমাদের নেই। এছাড়া মুয়ায্যিন যখন ফজরের আযানে বলবেন **'আস্সালাতু খায়রুম মিনান্নাওম'** তখন শ্রোতাদেরকে বলতে হবে **'সাদাকতা ওয়া বারাকতা'** এর অর্থ হল: আপনি সত্য বলেছেন, কল্যাণের কথা বলেছেন।

আযানের শেষে পঠিতব্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَ الصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَ الْوَسِيْلَةَ وَ الْفَضِيْلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَا الَّذِيْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ-(بخارى كتاب الاذان)

(আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দাওয়াতিত্তাম্মাতি ওয়াস্ সালাতিল ক্বায়িমাহ্ আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফিয়া'তা ওয়াব্'আস্হু মাকামাম্মাহমুদা নিল্লাযী ওয়া'আত্তাহু, ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ।)

অর্থ: হে আল্লাহ্! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও চিরস্থায়ী নামাযের (তুমিই) প্রভু। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে নৈকট্যের মাধ্যম, অফুরন্ত কল্যাণ এবং সুউচ্চ মর্যাদা দান কর। এবং তাঁকে সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত মর্যাদায় (মাকামে মাহমুদে) আবির্ভূত করো, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে দিয়েছ। নিশ্চয় তুমি কখনও প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না।
(শাব্দিক: রাব্বা-প্রভু, হাযিহি- এই, দাওয়াত- আহ্বান, তাম্মাত- পরিপূর্ণ, ওয়াসসালাতি- এবং নামায, ওয়াসিলাতা- নৈকট্যের মাধ্যম, ওয়াল ফাযীলাতা- এবং মহত্ত্ব, ওয়াব্আসহু- এবং তাঁকে আবির্ভূত করো, মাকামাম্মাহ্মুদা- সর্বাপেক্ষা প্রশংসিত মর্যাদা, ইন্নাকা- নিশ্চয় তুমি, লা তুখ্লিফু- তুমি ব্যতিক্রম কর না, মী'আদ- প্রতিশ্রুতি)।

মসজিদের আদব

মসজিদ বলতে সিজদা করার স্থানকে বুঝায়। এটা খোদা তা'লার ইবাদতের স্থান। এর যথাযথ আদব ও সম্মান করা কর্তব্য। মসজিদে উচ্চকণ্ঠে কথাবার্তা বলা, বাকবিতন্ডা, ঝগড়া, মারামারি ও গালিগালাজ ইত্যাদি এমন কিছু করতে নেই। এগুলো মসজিদের মর্যাদার হানিকর। মসজিদ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। এতে সুগন্ধি ব্যবহার পছন্দনীয়।
মসজিদে প্রবেশ করার সময়ে নিম্নলিখিত দোয়াটি পাঠ করতে হয়–

بِسْمِ اللّٰهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

(বিসমিল্লাহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু আ'লা রাসূলিল্লাহ্ আল্লাহুম্মাগ্ফির লি যুনুবী ওয়াফতাহ্ লি আবওয়াবা রাহমাতিকা)
অর্থ: আল্লাহ্র নামে (প্রবেশ করছি), আল্লাহ্র রসূলের ওপর দুরূদ ও শান্তি (প্রেরণ করছি)। হে আল্লাহ্! আমার পাপ ক্ষমা কর এবং আমার জন্যে তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও। (তিরমিযী, আবওয়াবুস সালাত, ফিকাহ আহমদীয়, পৃ. ২১৯)।
(শাব্দিক: বিসমিল্লাহি- আল্লাহ্র নামে, সালাত- প্রার্থনা, ওয়াস্সালামু- এবং শান্তি, আ'লা- ওপর, রাসূলিল্লাহি- আল্লাহ্র রসূল, আল্লাহুম্মা- হে আল্লাহ্, ইগফির্ লি- আমাকে ক্ষমা করো, ইফ্তাহ্ লি- আমার জন্যে খুলে দাও, আবওয়াবা- দরজাসমূহ, রাহমাতিকা- তোমার রহমত)
মসজিদে প্রবেশ করার সময় **'আস্সালামু আলাইকুম'** বলতে হয়। নামায পড়া ছাড়াও অন্য সময়ে মসজিদে আল্লাহ্ তা'লার গুণগান বা যিক্র করা উচিত। মসজিদে কখনও কোন অশ্লীল বা গর্হিত কাজ করতে দেয়া বা করা রীতিমত অন্যায়। পাকপবিত্র অবস্থায় মসজিদে যেতে হয়। কাঁচা পিঁয়াজ, রসুন, মূলা প্রভৃতি দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস খেলে মুখ ভাল করে না ধুয়ে মসজিদে যাওয়া ঠিক নয়। মসজিদে থু-থু ফেলা, নাক ঝাড়া বা হাত-পা,

শরীর মোড়ামুড়ি করা উচিত নয়। (মুসলিম)।
মসজিদ হতে বের হবার সময় উল্লেখিত দোয়াটি পাঠ করতে হয়। তবে 'ওয়াফতাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতিকা' স্থলে **'ওয়াফতাহলী আবওয়াবা ফাযলিকা'** পড়তে হয়। এর অর্থ- আমার জন্য তোমার ফযলের দরজাগুলো খুলে দাও। কুরআন ও হাদীসে মসজিদ সাজানোর চেয়ে নামাযীদের তাকওয়ার সাজে সজ্জিত হয়ে মসজিদে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও এ ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করেছেন।

নামাযের রীতি বা পদ্ধতি

নামায পড়ার জন্যে কিবলা বা কা'বামুখী হয়ে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত আয়াতটি (তওজীহ) পাঠ করার পর দু'হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে তকবীরে তাহ্রীমা– অর্থাৎ, 'আল্লাহু আকবর' বলে হাত দু'টিকে বুকের উপর এমনভাবে বাঁধতে হয়, যেন ডান হাতের কব্জি বাম হাতের কব্জির উপর থাকে এবং ডান হাতের আঙ্গুলের সামনের অংশ বাম হাতের কনুই প্রায় স্পর্শ করে। (মিশকাত দ্রষ্টব্য)। এরপর সানা, তা'আব্বুজ ও তাসমীয়া পাঠ করতে হয়। সানা ও তা'আব্বুজ প্রথম রাকাতের শুরুতে পাঠ করার পর আর পাঠ করতে হয় না।
নামাযের নিয়ত হিসেবে সাধারণভাবে যে বাক্যগুলো প্রচলিত আছে হযরত রসূল করিম (সা.) বা সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এ রকম কোন নিয়ত পাঠ করেননি। তিনি (সা.) নিম্নোক্ত কুরআনী আয়াত পাঠের মাধ্যমে নামায শুরু করতেন। মিশকাত শরীফে ধারাবাহিকভাবে নামাযের যে নিয়ম-কানুন দেয়া হয়েছে এতে প্রচলিত নিয়তের কোন উল্লেখ নেই। হযরত ইমাম গায্যালী (রহ.) তাঁর 'কিমিয়ায়ে সাআ'দাত' পুস্তকে লিখেছেন, 'নিয়্যত করার বিষয়, পড়ার বিষয় নয়'।
জায়নামাযে দাঁড়িয়ে নিচের কুরআনী আয়াত পড়তে হয়-

وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّ مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

(ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী ফাতারাস্ সা-মাওয়াতি ওয়াল আর্যা হানীফাওঁ ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন)
অর্থ: আমি আমার পূর্ণ মনোযোগ একনিষ্ঠভাবে তাঁরই দিকে নিবদ্ধ করছি, যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আনআম : ৮০)।
(শাব্দিক: ওয়াজ্জাহ্তু- আমি নিবদ্ধ করছি, ওয়াজ্হিয়া- আমার পূর্ণ মনোযোগ, লিল্লাযী- তাঁরই দিকে, ফাতারা- যিনি সৃষ্টি করেছেন, সামাওয়াতি- আকাশসমূহ, ওয়া- এবং, আরয- পৃথিবী, হানীফা- একনিষ্ঠভাবে, মা- না/নই, আনা- আমি, মিন- অন্তর্ভুক্ত, আল্ মুশ্রিকীন- মুশরিকদের)।

সানা

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَ لَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ

(সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা ওয়াতাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা)
অর্থ: হে আল্লাহ্! পবিত্রতা তোমারই এবং প্রশংসা তোমারই, পরম মঙ্গলময় তোমার নাম! তোমার মর্যাদা অতি উচ্চ। আর তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই।
(শাব্দিক: সুবহানাকা- তুমি পবিত্র, আল্লাহুম্মা- হে আল্লাহ্, ওয়া- এবং, বিহামদিকা- তোমার প্রশংসাসহ, তাবারাকা- পরম মঙ্গলময়, ইস্মুকা- তোমার নাম, তা'লা- অতি উচ্চ, জাদ্দুকা- তোমার মর্যাদা, লা- নেই, ইলাহা- উপাস্য, গায়রুকা- তুমি ছাড়া)।

তা'আব্বুয

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِo

(আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম)
অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।
(শাব্দিক: আ'উযু- আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, বিল্লাহি- আল্লাহ্র নিকট, মিন- থেকে, শায়তানির রাজীম- বিতাড়িত শয়তান)।

তাসমিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম)
অর্থ: আল্লাহ্র নামে (আরম্ভ করছি), যিনি পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী।
(শাব্দিক: বিসমিল্লাহ- আল্লাহ্র নামে, রাহ্মান- পরম করুণাময়, রাহীম- বারবার কৃপাকারী)।

সূরা আল্ ফাতিহা

(এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ ৭ আয়াত এবং ১ রুকু আছে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٤﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ﴿٥﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾

(বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন। আররাহ্মানির রাহীম। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন। ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকানাস্তাঈন। ইহদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম। সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলায়হিম গায়রিল মাগদুবি আলায়হিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন) [আমীন]
অনুবাদ: (১) আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী, (২) সব প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি জগৎসমূহের প্রভু-প্রতিপালক, (৩) পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী, (৪) বিচার দিবসের মালিক, (৫) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, (৬) তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, (৭) তাদের পথে, যাদেরকে তুমি পুরস্কার দিয়েছ, যারা (তোমার) ক্রোধভাজন হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।
সূরা ফাতিহার পর কুরআন শরীফের যে কোন একটি সূরা বা সূরার অংশ-বিশেষ পাঠ করে 'আল্লাহু আকবর' বলে 'রুকু' দিতে হয়। সূরার অংশ-বিশেষ পাঠের বেলায় ছোট আয়াত হলে কমপক্ষে তিনটি আয়াত পড়তে হয়, তবে আয়াত দীর্ঘ হলে একটিও পড়া যায়। নিম্নে কুরআন শরীফের তিনটি সূরা অর্থসহ দেয়া হল:

সূরা আল্ ইখলাস

(এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ এ সূরায় ৫ আয়াত এবং ১ রুকু আছে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿١﴾

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿٢﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٣﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٤﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٥﴾

(বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। কুল্ হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ। লাম ইয়ালিদ

ওয়ালাম্ ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওওয়ান আহাদ)
অর্থ: "(১) আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী। (২) তুমি বল, 'তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়। (৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বনির্ভরস্থল। (৪) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। (৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই'।"

সূরা আল্ ফালাক

(এটি মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ এ সূরায় ৬ আয়াত এবং ১ রুকু আছে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝٢ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٤ وَ

مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٥ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٦

(বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক। মিন শার্রি মা খালাক। ওয়া মিন শার্রি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব। ওয়া মিন শাররিন্ নাফ্ফাসাতি ফিলউকাদ। ওয়া মিন্ শার্রি হাসিদিন ইযা হাসাদ)
অনুবাদঃ "আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী। (২) তুমি বল, 'আমি আশ্রয় চাই এক সৃষ্টিকে বিদীর্ণ করে আরেক সৃষ্টির উন্মেষকারী প্রভুর কাছে। (৩) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে, (৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায় (৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট থেকে, (৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।"

সূরা আন্ নাস

(এটি মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ এ সূরায় ৭ আয়াত এবং ১ রুকু আছে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝٢ مَلِكِ النَّاسِ ۝٣ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٤ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ

الْخَنَّاسِ ۝٥ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٦ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٧

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস। মালিকিন্নাস। ইলাহিন্নাস। মিন্ শার্রিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাসি। আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদুরিন্নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস)

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

অনুবাদঃ "(১) আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী, (২) তুমি বল, 'আমি মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, (৩) যিনি মানুষের অধিপতি, (৪) মানুষের উপাস্য, (৫) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, (৬) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, (৭) সে জিনের (উঁচু শ্রেণীর মানুষের) অন্তর্ভুক্তই হোক আর সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্তই হোক'।"
বি. দ্র.
১) আঁ-হুযূর (সা.) ওপরের তিনটি সূরা সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করতে বলেছেন। এতে বিভিন্ন রকম আপদ-বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।
২. হাদীসে আছে- **লা সালাতা ইল্লা বিফাতিহাতিল কিতাব–** অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন নামায হয় না। উল্লেখ্য, এ কারণেই বা-জামাত নামাযে ইমামের সাথে মুক্তাদিকেও মনে-মনে সূরা ফাতিহা পড়তে হয়।

রুকুর তসবীহ্

রুকুতে নিম্নলিখিত তসবীহ্ তিন, পাঁচ, সাত বা আরও অধিকবার বেজোড় সংখ্যায় পাঠ করতে হয়।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ط

(সুব্হানা রাব্বিয়াল আযীম)
অর্থ: পবিত্র আমার প্রভু অতি মহান।
(শাব্দিক: সুব্হান- পবিত্র, আযীম- অতি মহান, রাব্বি- আমার প্রভু-প্রতিপালক)। এ তসবীহ্ পাঠের পর সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময়ে যে তাসমীয়া ও তাহমীদ পড়তে হয় তা হল:

তাসমীয়া

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ط

(সামি'আল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্)
অর্থ: আল্লাহ্ তাঁর প্রশংসাকারীর কথা শুনেছেন।
(শাব্দিক: সামি'আ- শুনেছেন, লিমান্- তার জন্য, হামিদাহ্- যে তাঁর প্রশংসা করেছে)

তাহ্মীদ

رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ

(রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হামদ্। হাম্দান্ কাসীরান তাইয়্যেবান মুবারাকান ফীহে)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, সব প্রশংসা তোমারই। (ইহা সেই) প্রশংসা, যা অফুরন্ত ও পবিত্র, যার মধ্যে আছে অশেষ কল্যাণ।

(শাব্দিক: রাব্বানা- হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, লাকা- তোমার জন্যে, আল্ হামদ্-সব প্রশংসা, হামদান- প্রশংসা, কাসীরান- অফুরন্ত, তাইয়্যেবান- পবিত্র, মুবারাকান- কল্যাণময় বা বরকতময়)।

এরপর 'আল্লাহু আকবর' বলে সিজদায় যেতে হয়। সিজদায় নিম্নোক্ত তসবীহ তিন, পাঁচ, সাত কিংবা আরও অধিক বার বিজোড় সংখ্যায় পড়তে হয়।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

(সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা)

অর্থ: পবিত্র আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি উচ্চ।

(আ'লা- অতি উচ্চ)

পরপর দু'বার সিজদা দিতে হয় ও সিজদা হতে উঠতেও 'আল্লাহু আক্বর' বলতে হয়। দুই সিজদার মাঝে নিম্নের দোয়াটি পড়তে হয়-

দুই সিজদার মধ্যবর্তী দোয়া:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَ اجْبُرْنِيْ وَ ارْزُقْنِيْ وَ ارْفَعْنِيْ

(আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহাম্নী ওয়াহ্দিনী ওয়া'আফিনী ওয়াজবুরনী ওয়ার্‌যুক্‌নী ওয়ারফা'নী)

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর, আর আমাকে সুপথে পরিচালিত কর, আর আমাকে সুস্থ রাখ আর আমার অবস্থা শুধরে দাও এবং আমাকে রিয্ক দাও ও আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি দান কর।

(শব্দার্থ: আল্লাহুম্মা- হে আল্লাহ, ইগ্‌ফিরলী- আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও, ওয়ার হাম্নী- এবং আমার প্রতি দয়া কর, ওয়াহ্দিনী- এবং আমাকে সুপথ দেখাও, ওয়া'আফিনী- এবং আমাকে সুস্থ রাখ, ওয়াজবুরনী- এবং আমার অবস্থা শুধরে দাও, ওয়ার্‌যুকনী- এবং আমাকে রিয্ক দান কর, ওয়ারফা'নী- এবং আমাকে আধ্যাত্মিকভাবে উন্নীত কর)।

এ দোয়ার সাথে রসূলুল্লাহ্ (সা.) **'ইয়া রাব্বি যিদ্নী ইলমান'** এ দোয়াটিও পাঠ করতেন। এর অর্থ হল- হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

'আল্লাহু আকবর' বলে দাঁড়িয়ে পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় রাকা'ত পাঠ করে বসতে হয়। বসার সময়ে বাম পায়ের পাতা বিছিয়ে এর ওপরে বসতে হয় এবং ডান পায়ের পাতা আঙ্গুলের ওপর ভর করে খাড়া রাখতে হয় এবং হাত দু'টিকে হাঁটুর কাছে দু'উরুর ওপরে সোজা করে রাখতে হয়। এরপর নিম্নলিখিত তাশাহ্হুদ, দুরূদ শরীফ এবং অন্যান্য মাসনূন দোয়া পাঠ করে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হয়।

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوٰتُ وَ الطَّيِّبٰتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ

وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

(আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যেবাতু আস্‌সালামু আলায়কা আইয়্যুহান্নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু আস্‌সালামু আ'লায়না ওয়া আ'লা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু)

অর্থ: সব মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিক ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্যে। হে নবী (সা.)! আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র আশিস ও কল্যাণ বর্ষিত হোক! শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের ওপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণের ওপর!

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

(শাব্দিক: আত্তাহিয়্যাতু- সব মৌখিক ইবাদত, আস্‌সালাওয়াতু- সব দৈহিক ইবাদত, আত্তাইয়্যিবাতু- সব আর্থিক ইবাদত, আস্‌সালামু- শান্তি, আ'লায়কা- আপনার ওপর, ইবাদি- বান্দাগণ, সালিহীন-পুণ্যবানগণ)

দুরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰٓى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰٓى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰٓى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ○

(আল্লাহুম্মা সাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লায়তা আ'লা ইব্‌রাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।
আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা বারাক্‌তা আ'লা ইবরাহীমা ওয়া আ'লা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)
অর্থ: হে আল্লাহ্! অনুগ্রহ (ও আশিস) বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সা.) এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ তুমি অনুগ্রহ (ও আশিস) বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ.) এবং ইবরাহীম (আ.)-এর অনুগামীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসাময়, মহা মর্যাদাবান। হে আল্লাহ! বরকত (কল্যাণ) বর্ষণ কর মুহাম্মদ (সা.) এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুগামীদের প্রতি যেরূপ তুমি বরকত (কল্যাণ) বর্ষণ করেছিলে ইবরাহীম (আ.) এবং ইবরাহীম (আ.)-এর অনুগামীদের প্রতি। নিশ্চয় তুমি মহা প্রশংসাময়, মহা মর্যাদাবান।
(শাব্দিক: সাল্লি- অনুগ্রহ (আশিস) বর্ষণ কর, আ'লা-ওপর, কামা- যেরূপ, সাল্লায়তা- তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলে, ইন্নাকা- নিশ্চয় তুমি, হামীদ্- মহাপ্রশংসাময়, মাজীদ- মহামর্যাদাবান, বারিক- তুমি বরকত বর্ষণ কর)।

দোয়া মাসুরা

(এক)

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ০

(রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার)
অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা : ২০২)।

(দুই)

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ০ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ০

(রাব্বিজ'আলনী মুকীমাস্ সালাতি ওয়া মিন যুররিয়্যাতী রাব্বানা ওয়া তাকাব্বাল দু'আ-রাব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব)
অর্থ: হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার সন্তানগণকে নামায কায়েমকারী

করো। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আর তুমি আমার দোয়া কবুল কর। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! যেদিন হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনদেরকেও ক্ষমা করো। (সূরা ইবরাহীম : ৪১)

(তিন)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّآ اَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْٓ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

(আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফ্‌সী যুলমান কাসীরাওঁ ওয়ালা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্‌তা ফাগ্‌ফিরলী মাগ্‌ফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল্ গাফুরুর রাহীম)
অর্থ: হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি আমার প্রাণের ওপর অনেক যুলুম (অন্যায়-অত্যাচার) করেছি। তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ্ মাফ করতে পারে না। অতএব তোমার পক্ষ হতে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে দাও এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয় তুমিই পরম ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী।

সালাম

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ

(আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্)
অর্থ: আপনাদের ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক!

তিন রাকা'ত ও চার রাকা'ত নামায পড়ার নিয়ম

তিন রাকা'ত নামায পড়তে হলে দুই রাকা'ত পাঠ করে তাশাহ্‌হুদ পাঠের পর 'আল্লাহু আকবর' বলে দাঁড়াতে হয়। এরপর সূরা ফাতিহা পাঠের পর যথারীতি রুকু, সিজদা করে তাশাহ্‌হুদ, দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হয়।
চার রাকা'ত নামায পড়তে হলে দু রাকা'ত পড়ে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করে দাঁড়াতে হয়। যথানিয়মে আরও দু রাকা'ত নামায পড়ে বসে তাশাহ্‌হুদ, দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে নামায শেষ করতে হয়।
চার রাকা'ত নামাযে প্রথম দুই রাকা'তে শুধু সূরা ফাতিহার সাথে কোন সূরা বা সূরার অংশ মিলিয়ে পাঠ করতে হয়। পরের দুই রাকা'তে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়।

সিজদা সাহভ

নামাযে এমন যদি কোন ভুল-ক্রটি হয়ে যায় যাতে নামাযে বড়ই দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে যায়, যেমন: ভুলে ফরযের ধারাবাহিকতা বদলে যায় বা কোন ওয়াজিব যেমন মাঝখানের বৈঠক থেকে যায় কিংবা রুকুর সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় তখন এ ক্রটিকে শুধরিয়ে নেয়ার জন্যে অতিরিক্ত ২টি সিজদা দেয়া আবশ্যক। একে 'সিজদা সাহভ' বলে। অর্থাৎ, ভুল-ক্রটিকে শুধরে নেয়ার সিজদা। এ সিজদা ২ বার দিতে হয়। এ সিজদা নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দুরূদ শরীফ এবং মাসনূন দোয়াগুলো পাঠ করার পরে দেয়া হয়। শেষ দোয়া করা হলে পরে তকবীর বা 'আল্লাহু আকবর' বলে দু'টি সিজদা করা হয়ে থাকে। এতে সিজদার তসবীহ্ 'সুবহানা রাব্বিআল আ'লা' পাঠ করা হয়। এরপর বসে 'সালাম' ফিরানো হয়ে থাকে, ভুল-ক্রটি এবং সব রকম দুর্বলতা থেকে মহামহিম আল্লাহ্ তা'লার সত্তাই পবিত্র আর মানুষ দুর্বল। তার এ ভুল-ক্রটি যেন উপেক্ষা করা হয়। আর এর কুফল থেকে যেন তাকে রক্ষা করা হয়।

মোটকথা ওয়াজিব পরিহার এবং রুকু পরে করার দরুন সিজদা সাহভ আবশ্যক হয়ে থাকে। যেমন ভুলে রুকু এবং সিজদা যদি ছেড়ে দেয়া হয়। নামাযের মাঝে বা পরে এটা স্মরণে এলে তাশাহ্হুদ পাঠ করার আগে সেই রোকন পুরো করে পরে তাশাহ্হুদ ও দুরূদ শরীফ প্রভৃতি পাঠ করে এর পরে ক্রটি শুধরে নেয়ার জন্যে সিজদা সাহভ আবশ্যক হয়ে থাকে। যেমন, যেসব রাকা'তে উঁচু আওয়াজে কিরাত পাঠ করা উচিত ছিল তা পাঠ করা হয়নি অথবা সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা বা সূরার কোন অংশ পাঠ করা হয়নি বা মাঝখানের বৈঠক করতে ভুলে গেছে অথবা নির্ধারিত রাকা'তের সংখ্যা থেকে অধিক রাকা'ত পড়ে নিয়েছে– এসব অবস্থার দরুন এ সিজদা করার ফলে এসব ক্রটি-বিচ্যুতি শুধরে যাবে।

কোন ব্যক্তি নামায শেষ হয়ে গেছে বলে সালাম ফিরিয়ে নিলেন কিন্তু তখনও তিনি মসজিদেই ছিলেন, মনে হল কোন রাকা'ত বা রাকা'তের অংশবিশেষ রয়ে গেছে তখন তিনি থেকে যাওয়া অংশ পূর্ণ করবেন। এরপর তাশাহ্হুদ প্রভৃতি পাঠ করে সিজদা সাহভ করবেন। এভাবে তার নামায পুরো হয়ে যাবে। এমনিভাবে রাকা'তের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হলে যেমন বুঝা যায়নি এক রাকা'ত বা দুই রাকা'ত পড়েছেন, তিন রাকা'তই পড়েছেন বা চার রাকা'ত এক্ষেত্রে কম অংশটি ধরে বাকী অংশ পড়ে নিয়ে যথারীতি সিজদা সাহভ করবেন।

ইমাম যদি এমন ভুল-ক্রটি করেন যাতে সিজদা সাহভের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে তার সাথে সাথে মুক্তাদীগণের জন্যে সিজদা সাহভ করা আবশ্যক হবে। কিন্তু কেবল মুক্তাদীর মাধ্যমে এমন কোন ভুল যদি সংঘটিত হয় তাহলে ইমামের অনুসরণের কারণে সেই

ভুলের জন্যে ধৃত হবে না এবং এর জন্যে সিজদা সাহভ দিতে হবে না। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ৯৯-১০০, অনুবাদ : আলহাজ্জ মুহাম্মদ মুতিউর রহমান।)

নামাযের পরবর্তী দোয়া

নামায আদায় করার পর নিম্নলিখিত দোয়াগুলো নির্ধারিত সংখ্যায় পড়তে হয়।

سُبْحٰنَ اللّٰهِ সুব্হানাল্লাহ্ --- আল্লাহ্ পবিত্র (৩৩ বার)

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ আল্হামদুলিল্লাহ্ --- সব প্রশংসা আল্লাহ্র (৩৩ বার)

اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহু আকবার --- আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ (৩৪ বার)

নিম্নের দোয়া দু'টি একবার করে পড়তে হয়।

لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰـهُ وَحْـدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَـهٗ، لَـهُ الْـمُـلْكُ وَلَـهُ الْـحَـمْدُ، وَ هُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আ'লা কুল্লি শায়্ইন কাদীর)

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন অংশীদার নেই। সব আধিপত্য এবং প্রশংসা কেবল তাঁরই। আর তিনি সব কিছুর ওপরে সর্বশক্তিমান।

اَللّٰهُـمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ

(আল্লাহুম্মা আনতাস্ সালামু ওয়া মিনকাস্ সালামু তাবারাক্তা ইয়া যালজালালি ওয়াল ইক্রাম)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমিই পূর্ণ শান্তি এবং তোমার কাছ থেকে সব শান্তি। মহাকল্যাণময় তুমি, হে মহাপ্রতাপশালী, হে মহা সম্মানের অধিকারী!

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর নির্দেশক্রমে প্রত্যেকবার নামাযের পর **১১** বার **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'** মৃদুস্বরে পাঠ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আঁ-হযরত (সা.)-ও বলেছেন, **"আফযালুয্ যিক্রি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'।"**

অর্থ: "সর্বোত্তম যিক্র হলো- 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই'।"

তিলাওয়াতে সিজদাহ্

পবিত্র কুরআন মজীদের ১৪টি আয়াতের মধ্যে যে কোন একটি তিলাওয়াত করার সময় অথবা শুনার সময় মানুষ দাঁড়ানো বা বসা যে কোন অবস্থায়ই হোক না কেন সিজদায় চলে যেতে হবে। এরূপ সিজদা করাকে 'তিলাওয়াতে সিজদাহ্' বলে। এ সিজদায় 'তসবীহ' তথা 'সুবহানা রাব্বিয়াল আলা' পড়া ছাড়াও এ দোয়া পাঠ করার কথা হাদীস থেকে পাওয়া যায়:

سَجَدَ وَجْهِىْ لِلَّذِىْ خَلَقَهٗ وَ شَقَّ سَمْعَهٗ وَ بَصَرَهٗ بِحَوْلِهٖ وَ قُوَّتِهٖ

(সাজাদা ওয়াজহি লিল্লাযি খালাকাহু ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু বিহাওলিহি ওয়া কুওয়্যাতিহি)

অর্থ: আমার চেহারা সেই সত্ত্বার সম্মুখে সিজদাবনত যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর অপরিসীম শক্তির মাধ্যমে একে শুনার এবং দেখার ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

আয়াতুল কুরসী

পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতকে 'আয়াতুল কুরসী' বলে। এতে আল্লাহ্ তা'লার তৌহীদ বা একত্ববাদকে ও তাঁর বড়-বড় গুণকে অত্যন্ত মাধুর্যের সাথে সুন্দরতম ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রতি নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করা উত্তম। আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, "আয়াতুল কুরসী কুরআন শরীফের মহোত্তম আয়াত।" (মুসলিম)।

اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۶﴾

(আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল্ হাইয়্যুল কাইয়্যুম, লা তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা নাওম্, লাহু মা ফিস্সামাওয়াতি ওয়ামা ফিল্ আরয্, মান্যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইন্দাহু ইল্লা বিইয্নিহী, ইয়া'লামু মা বায়্না আয়দীহিম্ ওয়ামা খাল্ফাহুম, ওয়ালা ইউহীতুনা বিশায়্ইম্ মিন ইলমিহি ইল্লা বিমা শাআ, ওয়াসি'আ কুরসিয়্যুহুস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরয, ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফ্যুহুমা ওয়া হুয়াল আলীয়্যুল আযীম)

অর্থ: "আল্লাহ্-তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব-জীবনদাতা, চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। আকাশসমূহে এবং পৃথিবীতে যা আছে সব তাঁরই। কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে শাফায়াত (সুপারিশ) করতে পারে? তাদের সম্মুখে যা আছে এবং তাদের পশ্চাতে যা আছে সবই

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

তিনি জানেন, তিনি যা চান তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর সিংহাসন আকাশসমূহ এবং পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না। আর তিনি অতীব উচ্চ, মহিমান্বিত।" (সূরা বাকারা: ২৫৬)

মোনাজাত

মনে রাখা দরকার, নামাযই সর্বাপেক্ষা উত্তম দোয়া। নামাযের মাঝে কুরআন ও হাদীসের আরবি দোয়া করার পরও মাতৃভাষায় দোয়া করা কর্তব্য। নামাযের শেষে হাত উঠিয়ে প্রচলিত মোনাজাত করার কোন বিধান নেই। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) কেবল নামাযে ইস্তিস্কা– অর্থাৎ, বৃষ্টির জন্যে যে নামায পড়া হয় তাতে হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন। নামাযের অবস্থায় মনে কোন প্রকার কুধারণার উদয় হলে পাঠ করা উচিত।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِO

(আউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজিম)

অর্থ: আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

ইমাম হওয়ার শর্ত

সুস্থ, সাবালক, মুসলমান এবং যিনি কুরআনের অধিক জ্ঞান রাখেন তিনি ইমামতির অধিক হকদার। যদি কুরআনের জ্ঞানের দিক থেকে অনেকে সমযোগ্যতাসম্পন্ন হন তাহলে যিনি সবচেয়ে বেশি বয়স্ক তিনি ইমামতি করবেন। সে মুসলমান– যে ব্যক্তি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহদী বলে বিশ্বাস করে না, তার পিছনে নামায পড়া আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছে। কেননা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) যুগ ইমামকে মানার জন্যে বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন। অতএব এরূপ ব্যক্তি যুগের ইমামকে না মানার কারণে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়েছে। তাই এ সমস্ত ব্যক্তিদের পিছনে নামায পড়া যাবে না। হাদীসে এসেছে, 'ফা ইমামুকুম মিনকুম'– অর্থাৎ, তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্যে থেকে হবেন।

বিতরের নামায

পূর্বেই বলা হয়েছে এশার নামাযের পর বিতরের নামায পড়তে হয়। এ নামায তাহাজ্জুদের পরেও পড়া যায়। কিন্তু শেষ রাত্রে ওঠার নিশ্চয়তা না থাকলে এশার পর পড়ে নেয়াই অধিকতর শ্রেয়। এ নামায ওয়াজিব নামাযের অন্তর্ভুক্ত।

'বিতর' অর্থ বেজোড়, মাগরিবের ফরয নামায যেমন প্রতিদিনের ফরয নামাযকে বেজোড় করে তেমনি বিতর নামায সুন্নত ও নফল নামাযকে বেজোড় করে। হাদীস শরীফেও এসেছে, 'আল্লাহ্ বিতর– অর্থাৎ, বেজোড়, অতএব তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।' (বুখারী)। বিতরের নামায ৩ রাকা'ত। প্রত্যেক রাকা'তে সূরা ফাতিহার পর যথাক্রমে সূরা আলা, সূরা কাফিরূন এবং সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত। অন্য সূরাও পড়া যায়। বিতরের দ্বিতীয় রাকা'তের পরে বৈঠকে বসে তাশাহ্হুদ পাঠ করার পর সালাম ফিরিয়ে 'আল্লাহু আকবর' বলে দাঁড়িয়ে তৃতীয় রাকা'ত পড়াও জায়েয। এরপর তৃতীয় রাকা'তে রুকুর পরে দাঁড়িয়ে দোয়া কুনুত পড়তে হয়। পরে সিজদা করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হয়। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ১৯৭)।

দোয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ نُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَ نَشْكُرُكَ
وَ لَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ۔ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّيْ وَ نَسْجُدُ
وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَحْفِدُ وَ نَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ۔

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্তাঈনুকা ওয়া নাস্তাগফিরুকা ওয়া নু'মিনুবিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলায়কা ওয়ানুস্‌নী আ'লায়কাল খায়রা ওয়া নাশকুরুকা ওয়া লা নাক্‌ফুরুকা ওয়া নাখ্‌লাউ ওয়া নাতরুকু মাইয়্যাফ্‌জুরুকা, আল্লাহুম্মা ইয়্যাকানা'বুদু ওয়ালাকা নুসাল্লী ওয়া নাস্‌জুদু ওয়া ইলায়কা নাস্'আ, ওয়া নাহ্‌ফিদু ওয়া নার্‌জু রাহমাতাকা ওয়া নাখ্‌শা আযাবাকা ইন্না আযাবাকা বিল্ কুফ্‌ফারি মুলহিক)

অর্থ: হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি আর আমরা তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমরা তোমার ওপর ঈমান আনয়ন করি ও আমরা তোমার ওপর ভরসা করি আর আমরা উত্তমভাবে তোমার গুণগান করি এবং আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ও আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না আর যে তোমার অবাধ্যতা করে আমরা তাকে দূরে সরিয়ে দেই ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ্! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ি আর তোমারই উদ্দেশ্যে সেজদা করি ও তোমারই দিকে আমরা দৌড়াই এবং আমরা তোমার কাছে দাঁড়াই আর তোমারই করুণার আকাঙ্ক্ষা করি ও তোমার শাস্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় তোমার শাস্তি অস্বীকারকারীদের ওপরে আপতিত হবে।

(শব্দার্থ: আল্লাহুম্মা- হে আমার আল্লাহ্, ইন্না- নিশ্চয় আমরা, নাস্তাঈনুকা- আমরা তোমার সাহায্য প্রার্থনা করি, ওয়ানাস্তাগ্‌ফিরুকা- এবং আমরা তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি,

ওয়া নু'মিনুবিকা- আমরা তোমারই উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলায়্কা- এবং আমরা তোমারই উপর ভরসা করি, ওয়া নুস্‌নী আলায়কাল্ খায়রা- এবং আমরা তোমারই গুণগান করি, ওয়া নাশ্‌কুরুকা- এবং আমরা তোমারই কৃতজ্ঞতা করি, ওয়া লা নাক্‌ফুরুকা- এবং আমরা তোমার অকৃতজ্ঞতা করি না, ওয়া নাখ্‌লাউ ওয়ানাত্‌রুকু মাইয়্যাফজুরুকা- এবং যে তোমার অবাধ্যতা করে তাকে আমরা দূরে সরিয়ে দিই ও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি, আল্লাহুম্মা- হে আমার আল্লাহ্, ইয়্যাকানাবুদু- আমরা তোমারই ইবাদত করি, ওয়ালাকা নুসাল্লী- এবং তোমারই উদ্দেশ্যে নামায পড়ি, ওয়া নাস্‌জুদু- এবং আমরা তোমারই উদ্দেশ্যে সেজদা করি, ওয়া ইলায়কা নাস'আ- এবং আমরা তোমার দিকে দৌড়াই, ওয়া নাহ্‌ফিদু- এবং আমরা তোমার কাছে দাঁড়াই, ওয়া নারজু রাহমাতাকা- এবং আমরা তোমার রহমতের আশা করি, ওয়া নাখশা আযাবাকা- এবং আমরা তোমার শাস্তিকে ভয় করি, ইন্না আযাবাকা বিল কুফ্‌ফারি মুলহিক্- নিশ্চয় তোমার আযাব অস্বীকারকারীদের ওপর আপতিত হবে)।

জুমু'আর নামাযের বিবরণ

প্রতি শুক্রবার যোহরের প্রথম ওয়াক্তে [যোহরের ওয়াক্তের শুরুর দিকে] জামা'তের সাথে জুমু'আর নামায পড়া ফরয। দুপুরের পর সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়া মাত্রই জুমু'আর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। ইমাম ছাড়া আর দুজন লোক থাকলেই জুমু'আর নামায পড়তে হবে। জুমু'আ নামায প্রত্যেক স্থানেই পড়া যায়। তবে জুমু'আর নামাযের জন্য একমাত্র শর্ত হল শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজমান থাকতে হবে। অন্যথায় যোহরের নামায পড়তে হবে। খুতবা ছাড়া জুমু'আর নামায জায়েয নয়। সুন্নত নামায পড়া হলে খুতবা দেয়ার পর জুমু'আর ফরয নামায পড়তে হয়।

জুমু'আর ফরয নামায দু রাকা'ত। ফরযের পূর্বে চার রাকা'ত সুন্নত নামায পড়তে হয়। ফরযের নামাযের পর দুই বা চার রাকা'ত সুন্নত নামায পড়তে হয়।

প্রকৃতপক্ষে জুমু'আর নামায যোহরের ফরয নামাযের স্থলাভিষিক্ত বা কায়েম মোকাম। এর মাঝে দুই রাকা'ত ফরয নামায রেখে বাকী দুই রাকা'তের পরিবর্তে খুতবাকে ফরয করা হয়েছে। এ জন্যে খুতবা শুনাও ফরয। খুতবা চলাকালীন সময়ে কেউ মসজিদে উপস্থিত হলে তখন তাড়াতাড়ি দুই রাকা'ত সুন্নত নামায আদায় করে নিবে। আর তখন সুন্নত না পড়লে সানী খুতবার সময়ে তাড়াতাড়ি সংক্ষেপে দুই রাকা'ত সুন্নত পড়ে নিতে হবে। এখানে একটি মাস্‌লা জেনে রাখা উচিত, ফজরের ফরয নামাযের পূর্বেকার এবং জুমু'আর নামাযের পূর্বেকার সুন্নত লম্বা করতে নেই। হযরত রসূল করিম (সা.) এ দুই সুন্নত নামায তাড়াতাড়ি পড়তেন। ইমাম সাহেব খুতবা দেয়ার উদ্দেশ্যে বসলে মুয়ায্‌যিন

দাঁড়িয়ে আযান দিবেন। প্রথম খুতবা দেয়ার পর ইমাম সাহেব একবার বসে খানিকটা শ্রান্তি দূর করে উঠে দ্বিতীয় খুতবা প্রদান করবেন। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ১৬২)।

জুমু'আর খুতবা (বক্তৃতা)

যে কোন ধর্মীয় বক্তৃতা দেয়ার প্রারম্ভে যেমন নিম্নলিখিত কলেমা পড়তে হয়, তেমনি জুমু'আর খুতবা দেয়ার পূর্বেও এ রকম পড়তে হয়:

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ؕ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

(আশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আ'বদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বা'দু ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম)
অর্থ: আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং রসূল। এরপর আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং পরম করুনাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী আল্লাহর নামে শুরু করছি।

এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করে খুতবা আরম্ভ করতে হয়। খুতবার বিষয়বস্তু সময়োপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধর্মীয়, সামাজিক, জাতীয় কোন বিষয় বা সমস্যার ওপরেই বক্তৃতা হওয়া উচিত। বক্তৃতা কুরআন ও হাদীসের আলোকে সম্পন্ন করতে হবে। সেজন্য বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে বক্তৃতার শুরুতেই কুরআন বা হাদীস হতে উদ্ধৃতি দেয়া উত্তম। এছাড়া হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বা তাঁর খলীফাগণের অথবা বিশেষ করে হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) প্রদত্ত যে কোন খুতবা বা খুতবার অংশবিশেষ পাঠ করে খুতবা দানের কার্য সমাধা করা উচিত। যেহেতু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) সবসময় সময়োপযোগী খুতবা দিয়ে থাকেন এবং তা এমটিএ বা জামাতের পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে সেহেতু এ খুতবা পাঠ করা সর্বোত্তম। খলীফায়ে ওয়াক্ত তথা যুগ-খলীফার খুতবা জামাতের রূহকে জীবিত রাখে। সেজন্যে এর পাঠ অগ্রগণ্য। বর্তমানে এমটিএ-এর মাধ্যমে যুগ-খলীফার খুতবা প্রতি শুক্রবার সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। এ খুতবা দেখা ও শুনা আমাদের সবার কর্তব্য।

জুমু'আর দ্বিতীয় খুতবা

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ؕ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهٗ ؕ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ؕ

عِبَادَ اللّٰهِ ؕ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ؕ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ○ اُذْكُرُو اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَ ادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَ لَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ

(আলহামদু লিল্লাহি নাহ্‌মাদুহু ওয়ানাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলায়হি ওয়া নাউযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়ামিন্ সাইয়্যেআতি আমালিনা, মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাইয়্যুযলিল্‌হু ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া নাশ্‌হাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।
ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল্ আদ্‌লি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈতায়িযিল কুরবা ওয়া ইয়ান্‌হা আনিল ফাহ্‌শায়ি ওয়াল মুন্‌কারি ওয়াল বাগয়ি, ইয়ায়িযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উয্‌কুরুল্লাহা ইয়াযকুরুকুম ওয়াদ্'উহু ইয়াস্‌তাজিব লাকুম ওয়ালাযিকরুল্লাহি আকবার)
অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা কীর্তন করি এবং আমরা তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাঁরই প্রতি ঈমান আনি, তাঁর ওপরেই ভরসা রাখি। আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের নফ্‌স বা প্রবৃত্তির প্ররোচনা হতে এবং আমাদের নিজেদের কাজের কুফল হতে। আল্লাহ্ যাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন এরপর তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না এবং আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন এরপর তাকে কেউ পথ প্রদর্শন করতে পারে না। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।
আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক। নিশ্চয় আল্লাহ্ আদেশ দেন ন্যায়বিচার এবং অনুগ্রহ করার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের

জন্য এবং আল্লাহ্ অশ্লীল কথা বলতে, অসঙ্গত কাজ ও বিদ্রোহ করতে নিষেধ করেন। এসব তোমাদের এজন্য বলা হচ্ছে, যেন তোমরা উপদেশ প্রাপ্ত হও। আল্লাহ্কে স্মরণ কর, আল্লাহ্ তোমাদের স্মরণ করবেন, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র যিক্রই (স্মরণই) সর্বাপেক্ষা উত্তম।

জুমু'আর নামায সম্পর্কে কয়েকটি জরুরী কথা

(১) জুমু'আর নামাযের জন্য জামা'ত আবশ্যক। জুমু'আর নামায প্রত্যেক বালেগ (প্রাপ্ত-বয়স্ক) ও সুস্থ মুসলমানের জন্য ফরয। কিন্তু অসুস্থ, উন্মাদ, মুসাফির, বিকলাঙ্গ ও স্ত্রীলোকদের জন্য আবশ্যক নয়। যদি তারা শামিল হয় তাহলে তারা জুমু'আ পড়বে অন্যথায় যোহর নামায পড়বে। পর্দার ব্যবস্থা থাকলে মহিলাদের মসজিদে জুমু'আর নামায পড়া উচিত। মহিলাদের জন্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জামাতের দায়িত্ব। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন, "সাধারণ অবস্থায় নির্দেশ হল, পুরুষ ও মহিলারা যেন একস্থানে (পর্দায়) জুমু'আর ফরয (দায়িত্ব) পালন করেন।" (আল্ ফযল ১১ অক্টোবর, ১৯৪৮)।

(২) জুমু'আর দিনে গোসল করা, আতর বা সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাক পরা সুন্নত। নবী করিম (সা.)-একে ছোট ঈদ বলেছেন।

(৩) জুমু'আর দিন ফজরের ওয়াক্তে ফরয নামাযে প্রথম রাকা'তে সূরা হা-মিম্ আস্-সাজ্দা এবং দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা দাহর পড়া সুন্নত।

(৪) জুমু'আর ফরয নামাযের প্রথম রাকা'তে সূরা জুমুআ এবং দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা মুনাফিকূন অথবা প্রথম রাকা'তে সূরা আ'লা এবং দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা গাশিয়া পড়া সুন্নত।

(৫) শুধুমাত্র জুমু'আর দিন রোযা রাখা জায়েয নয়। তবে আগে-পিছে মিলিয়ে রাখলে হবে।

(৬) জুমু'আর দিনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন,"সর্বোত্তম দিন হল শুক্রবার। এ দিন আমার ওপর অনেক বেশি দুরূদ প্রেরণ কর। কেননা এ দিন তোমাদের এ সকল দুরূদ আমার সামনে পেশ করা হয়।" (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)।

ঈদের নামায

'ঈদ' শব্দটির অর্থ, যে খুশী বা আনন্দ বারবার আসে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমান জাতির জন্যে বছরে দু'টি উৎসব নির্ধারিত করেছেন। একটি ঈদ-উল-ফিতর এবং অপরটি ঈদ-উল-আযহিয়া। এ দু'টি উৎসবের বৃহদাংশ নামাযের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। ঈদের নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ (তাগিদকৃত সুন্নত)। ঈদের নামায বছরে দু'বার পড়তে হয়। জামা'ত ছাড়া এ নামায হয় না। প্রথম ঈদের নামায রমযানের রোযা শেষ হওয়ার পর ১লা শাওয়াল তারিখে পড়তে হয়। প্রথম ঈদের নামাযের নাম ঈদ-উল-ফিতর বা রোযা ভঙ্গের ঈদ এবং দ্বিতীয় ঈদের নামাযের নাম ঈদ-উল-আযহিয়া বা কুরবানীর ঈদ। যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ এ নামায পড়তে হয়।

ঈদের নামাযের পদ্ধতি

ফজরের পর সূর্য কিছু ওপরে উঠলেই ঈদের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। ঈদের নামায দুই রাকা'ত। বিনা আযান ও ইকামতে এ নামায আদায় করতে হয়। এর পূর্বে কোন নফল নামায নেই। তাকবীরে তাহ্রীমা বেঁধে প্রথম রাকা'তে অন্যান্য নামাযের ন্যায় সানা পড়তে হয়। এরপর হাত ছেড়ে দিয়ে সাতবার তকবীর– অর্থাৎ, 'আল্লাহু আকবর' বলতে হয়। প্রতিবারই হাত কাঁধ বা কান পর্যন্ত উঠিয়ে আবার ছেড়ে দিতে হয়। সাতবার তকবীর দেয়া হয়ে গেলে হাত বেঁধে যথারীতি সূরা-কিরাত পড়তে হয়। দ্বিতীয় রাকা'তে কিরাত পড়ার পূর্বে পুনরায় পাঁচবার তকবীর পড়তে হয়। দুই রাকা'তে নামাযের নির্দিষ্ট তকবীর ছাড়া ঈদের নামাযে উল্লেখিতভাবে অতিরিক্ত ১২টি তকবীর পড়তে হয়। (তিরমিযী, পৃ. ৭০, সুনানে ইবনে মাজাহ, পৃ. ৯১)।

দুই রাকা'ত নামায পড়া হয়ে গেলে জুমু'আর খুতবার ন্যায় ঈদের নামাযেও ইমাম সাহেব খুতবা প্রদান করবেন। খুতবা সময়োপযোগী হওয়াই বাঞ্ছনীয়, খারাপ আবহাওয়ার দরুন বা অন্য কোন কারণে ঈদগাহে (খোলা মাঠ– যেখানে ঈদের নামায পড়া হয়) যাওয়া সম্ভব না হলে জামে মসজিদে ঈদের নামায পড়া জায়েয। ঈদগাহে এক পথে যাওয়া এবং অন্যপথে আসা সুন্নত। ঈদের দিনে মেসওয়াক করা, গোসল করা, আতর বা অন্য সুগন্ধি দ্রব্য ও সুরমা ব্যবহার করা, নতুন বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা এবং উত্তম খাদ্য গ্রহণ করা সুন্নত। ঈদ-উল-ফিতরের নামাযের পূর্বে কিছু খেয়ে মসজিদে যাওয়া আর কুরবানীর ঈদের নামাযের পর নামায থেকে এসে কিছু খাওয়া সুন্নত। ঈদের নামাযের জন্য আসা-যাওয়ার রাস্তা যদি পৃথক হয় তাহলে তা মুস্তাহাব এবং অধিক সওয়াবের কারণ। ঈদ-উল-ফিতরের নামাযের পূর্বে জামাতের নিয়ম অনুযায়ী রোযার ফিতরা দান করা এবং ঈদ-উল-আযহার নামাযের পর সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের কুরবানী করা কর্তব্য। ধনী, গরীব, বৃদ্ধ ও এক দিনের শিশু পর্যন্ত সকল মুসলমানের জন্যে বিনা

ব্যতিক্রমে ফিতরানা সম্পূর্ণ বা অর্ধেক হিসাবে দেয়া ওয়াজিব। ঈদগাহে যাতায়াতের সময় ঈদ-উল-ফিতরে এবং ঈদ-উল-আযহিয়ায় নিম্নলিখিত তকবীর পাঠ করা উচিত-

আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ।

অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, সব প্রশংসা আল্লাহ্র।

এ তকবীর ঈদ-উল-ফিতরের নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদীগণ কমপক্ষে তিনবার উচ্চঃস্বরে পাঠ করবেন। এরূপে যিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ ফজরের নামাযের পর হতে শুরু করে ১৩ তারিখ আসরের নামায পর্যন্ত উক্ত তকবীর প্রতি ফরয নামাযের পর তিনবার করে উচ্চঃস্বরে পাঠ করতে হয়। ঈদগাহে আসা-যাওয়ার পথে নবী করিম (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ (রা.)-ও এ তকবীর বেশি বেশি পড়তেন।

কুরবানী

কুরবানী সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ (তাগিদকৃত সুন্নত) এবং ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)। কুরবানীর জন্যে নির্বাচিত পশু অবশ্যই হালাল, হৃষ্ট-পুষ্ট, নিখুঁত হতে হবে। অসুস্থ, দুর্বল, ল্যাংড়া, কান কাটা, শিং ভাঙা, অন্ধ পশুর কুরবানী জায়েয নয়। ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা হলে বয়স অন্তত এক বছর হতে হবে। গরু, মহিষ হলে বয়স কমপক্ষে দুই বছর হওয়া চাই। উটের বয়স ৩ বছর হতে হবে। গরু, উট জাতীয় প্রাণীতে কুরবানী সাতটি হিস্যায় (অংশে) দেয়া যায় এবং ছাগল, ভেড়া, দুম্বা জাতীয় প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি হিস্যায় দেয়া যায়। একটি হিস্যা একজনের জন্যেও হতে পারে, একটি পুরো পরিবারের জন্যও হতে পারে। এভাবে হযরত রসূল করিম (সা.) বা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বা তাঁর খলীফাগণ অথবা মৃত পিতা-মাতার পক্ষ হতেও কুরবানী দেয়া যায়। উল্লেখ্য, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) আহমদী জামাতের কেন্দ্র রাবওয়াতে সব মিস্কীনের পক্ষ হতে একটি পশু কুরবানী দিতেন।

যিনি কুরবানী দিবেন তিনি যিলহজ্জ মাসের প্রথম তারিখ হতে কুরবানী দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত চুল, দাড়ি, নখ ইত্যাদি কর্তন করা হতে বিরত থাকবেন। এছাড়া তিনি ঈদের দিন কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত রোযা থাকবেন এবং সম্ভব হলে কুরবানীর মাংস দিয়ে রোযা খুলবেন। এটা আঁ-হযরত (সা.)-এর সুন্নত। কুরবানী করার সময় হল ১০ যিলহজ্জ ঈদের নামাযের পর থেকে ১২ যিলহজ্জ সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত। কুরবানীর মাংস সদকা নয়। মানুষ নিজেও খেতে পারে এবং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদেরকেও খাওয়াতে পারে। তবে উত্তম হল, তিনটি অংশ করা। একটি অংশ নিজে রাখবে, অপরটি আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বন্টন করবে আর অন্যটি গরীবদের মাঝে বিতরণ করবে। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ১৮২-৮৩)।

আকীকাহ্

সন্তান জন্মগ্রহণের পর ৭ম দিনে তার মাথার চুল কামানো, সেই চুলের সমপরিমাণ ওজনের রূপা বা সোনা সদকা হিসেবে গরীবদের মাঝে বন্টন করা এবং নাম রাখা উপলক্ষে পশু জবাই করাকে আকীকা বলে। আকীকা করা সুন্নত। (ইবনে মাজাহ্, বাবুল আকীকাহ্, পৃ. ২২৮)। হাদীসে এর কল্যাণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "আকীকা দিয়ে শিশুর বিপদ দূর কর।" (বুখারী)। আকীকা অর্থ পশু জবাই করা। পুত্র সন্তানদের বেলায় দু'টি ছাগল বা দুম্বা এবং কন্যা সন্তানদের বেলায় একটি ছাগল বা দুম্বা জবাই করতে হবে। আকীকাহ্র পশু যেন মোটাতাজা ও উত্তম হয়। যদিও কুরবানীর পশুর ন্যায় এক্ষেত্রে পশুর বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে শিশুর আকীকা দেয়া হবে না সেক্ষেত্রে জন্মের দিনই তার নাম রাখা যাবে। এতে কোন সমস্যা নেই। (বুখারী, কিতাবুল আকীকাহ)।

আকীকার মাংস নিজেরা খেতে পারে। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকেও দিতে পারে। রান্না করে ভোজেরও আয়োজন করতে পারে। গরীবদেরও এর অংশ থেকে দেয়া উচিত। সামর্থ্যে না কুলালে দু'টি পশুর বদলে একটি পশুতেও আকীকাহ্ সম্পন্ন হতে পারে। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ১৮৩)।

তাহাজ্জুদ নামায

তাহাজ্জুদ নামায নফল এবং সব নফল নামাযের সেরা। সেজন্যই কুরআন ও হাদীসে এ নামায নিয়মিত পড়ার তাগিদ দেয়া হয়েছে এবং এর অনেক ফযিলত ও কল্যাণ বর্ণিত হয়েছে। শেষ রাতে ঘুম হতে উঠে এ নামায পড়তে হয়, সেজন্যে এর নাম তাহাজ্জুদ অর্থাৎ, শেষ রাতের নামায। এ নামাযের সময় হল, রাত্র দ্বি-প্রহরের পর হতে সুব্হে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত। রসূলুল্লাহ্ (সা.) এ নামায সাধারণত দু রাকা'ত করে আট রাকা'ত পড়তেন। সময় বিশেষে দুই বা চার রাকা'ত পর্যন্তও পড়তেন। এরপর বিতরের নামায আদায় করতেন। কিন্তু সাধারণভাবে এশার সাথেই বিতরের নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সেজন্য এশার নামাযের পর যে ব্যক্তি বিতরের নামায পড়েছে তাকে তাহাজ্জুদের সময় বিতরের নামায পড়তে হবে না। উল্লেখ্য, তাহাজ্জুদের নামায বা-জামাত আদায় করাও জায়েয। একাকী পড়া উত্তম। বা-জামাত পড়ার সময়ে এ নামাযে সূরা ক্বিরাত উচ্চঃস্বরে পাঠ করা উচিত।

তারাবীহ্ নামায

তারাবীহ্ নামাযের অর্থ আরামের নামায। রমযান মাসে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে কষ্ট হয় বিধায় সন্ধ্যা রাত্রে এ নামায জামাতের সাথে পড়া হয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর সময় এ নামাযের অধিক প্রচলন হয়। তারাবীহ্র নামায রমযান মাসের এক বিশেষ ইবাদত। রমযান মাসে তারাবীহ্ নামায ২ রাকা'ত করে ৮ রাকা'ত পড়তে হয়। কেউ যদি চায় তাহলে সে ২০ রাকা'ত বা তার চেয়ে বেশি পড়তে পারে, তবে সর্বোত্তম হল ৮ রাকা'ত পড়া। কেননা হুযূর (সা.) বেশিরভাগ সময় আট রাকা'ত পড়তেন। বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ে অসুবিধা বিধায় সবার সুবিধার্থে এশার নামাযের পর তারাবীহ্র নামায আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বা-জামাত তারাবীহ্র নামায পড়েও তাহাজ্জুদের নামায পড়া যায়। রমযানের চাঁদ উঠলে সেই রাত থেকে শেষ রমযানের রাত পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে এশার নামাযের ফরয এবং ২ রাকা'ত সুন্নত আদায়ের পরেই তারাবীহ্র নামায পড়তে হয়। বা-জামাত তারাবীহ্র নামাযে সারা মাসে কুরআন করীম এক খতম পড়া উত্তম। ৭ দিনের পূর্বে কুরআন খতম করা নিষিদ্ধ। তারাবীহ্র নামাযের সাথে বিতরের নামায জামা'তের সাথে পড়া যায়। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ.-২০৮)

কসর নামায

সফরের নিয়তে নিজ গ্রাম বা শহরের বাইরে গেলে কসর নামায পড়তে হয়। (সূরা নিসা : ১০২)। কসর অর্থ সংক্ষিপ্ত করা– অর্থাৎ, ভ্রমণ বা সফররত অবস্থায় ৪ রাকা'ত ফরয নামাযের স্থলে ২ রাকা'ত পড়তে হয়। তবে ফজর ও মাগরিবের নামায সম্পূর্ণ পড়তে হবে। সফরকালীন অবস্থায় ফজর ও জুমু'আর সুন্নত এবং বিতর নামায ছাড়া বাকী সকল সুন্নত নামায মাফ হয়ে যায় তথা পড়তে হয় না। নফল পড়তে পারে, না পড়লেও সমস্যা নাই। সফরে জমা নামায আদায় করাও জায়েয।

সফরে কসর নামায সম্পর্কে সঠিক মতামত হল, কমপক্ষে ৩ দিন থেকে নিয়ে অধিক ১৫ দিন পর্যন্ত কোন স্থানে অবস্থানের নিয়তে সফর করলে কসর পড়তে হয়। অবশ্য কোন মুসাফিরকে যদি ২/৪ দিন থাকার নিয়ত করেও একাদিক্রমে ১৫ দিনের বেশি থাকতে হয়, তবে তাকে কসর নামাযই পড়তে হবে। কিন্তু এভাবে একাদিক্রমে এক মাসের বেশি কসর নামায পড়া যাবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে 'সফর কাকে বলে' এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, **"সফরের নিয়তে যদি তিন ক্রোশও (এক ক্রোশ = তিন হাজার গজ) যাওয়া হয় তাহলে কসর করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে নিয়তের পাশাপাশি তাকওয়ার দিকে দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। যদি কেউ প্রতিদিন সাধারণ কাজের জন্য সফর করে তাহলে তা সফর নয় বরং সফর হল যেটিকে মানুষ বিশেষভাবে গ্রহণ**

করে আর সে নিয়তেই ঘর থেকে বের হয়।"
যে ব্যক্তিকে চাকুরী বা ব্যবসায়িক কাজে কিংবা পেশাগত কারণে সবসময় সফরের মাঝে থাকতে হয় বা অনেক দূর রাস্তা অতিক্রম করতে হয় তার এ ভ্রমণ বা যাতায়াত কখনই সফর বলে বিবেচিত হবে না। অনেকে বলে থাকে, বর্তমান সময়ে তো যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক স্বাচ্ছন্দ্যতা ও সহজলভ্যতা আছে, এক্ষেত্রে কসর না করলে কি সমস্যা? এর উত্তর হল- সফরকালীন অবস্থায় নামায কসর করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) এই ব্যাখ্যা দেননি, অমুক সুবিধা হলে সফর আর অমুক সুবিধা না হলে সফর নয়। আসল কল্যাণ হল, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর আদেশ পালন করা। নিজের পক্ষ থেকে অজুহাত ও কারণ ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই।
স্থানীয় বা মুকিম ইমামের পিছনে কোন মুসাফির নামায পড়লে তাকে সম্পূর্ণ নামায পড়তে হবে। কিন্তু মুসাফির ইমাম হলে তিনি দুই রাকা'ত নামায পড়ে সালাম ফিরাবেন এবং মুকিম-মুক্তাদী বাকী দুই রাকা'ত একা একা পড়ে নিবেন। আর সে দুই রাকা'তে প্রথম রাকা'ত থেকে বা-জামা'ত নামায পাওয়া মুক্তাদী কেবল সূরা ফাতিহা পড়বেন।
ট্রেন, বাস বা উড়োজাহাজে সফরকালে নিজ স্থানে বসে নামায পড়া যাবে। কিবলার দিকে মুখ করার সুযোগ না থাকলে যেদিকে মুখ করে বসে থাকবেন, সে দিকেই মুখ করে নামায পড়া যাবে। কারণ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাও সে দিকেই আল্লাহ্ আছেন।" (সূরা বাকারা : ১১৬)। [ফিকাহ্ আহমদীয়া, পৃ. ১৮৯-১৯৩]।

জমা নামায

সফরে, অসুস্থতায়, বৃষ্টি-বাদলের দরুন, আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে, ধর্মীয় কারণে বা অন্য কোন অবস্থা বিশেষে বাধ্য হলে যোহর ও আসরের ফরয নামায এবং মাগরিব ও এশার ফরয নামায একত্রে আগে বা পরে পড়া জায়েয। হযরত রসূল করিম (সা.) কোন-কোন সময়ে উল্লেখিত কারণ ছাড়াও নামায জমা করেছেন। (তিরমিযী)। যোহর ও আসরের নামায, যোহর অথবা আসরের সময়ে এবং মাগরিব ও এশার নামায, মাগরিব অথবা এশার সময়ে জমা করা যায়। নামায জমা করার ক্ষেত্রে আগে, পরে বা মাঝে সুন্নত নামায পড়তে হয় না এবং প্রত্যেক ওয়াক্তের নামায পৃথক-পৃথক ইকামতের সাথে পড়তে হয়। এশার নামায জমা করলে সুন্নত পড়তে হবে না। তবে বিতরের নামায পড়তে হবে। হজ্জের সময় আরাফাতে যোহরের সাথে আসরের নামায এবং মুজদালিফাতে মাগরিবের সাথে এশার নামায জমা করে পড়া হয়।
যারা নামায জমা করেন না তারা মনে করেন এটি বি'দাত বা নতুন সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে এটি বিদাত নয় বরং নবী করিম (সা.)-এর সুন্নত থেকে এর সনদ পাওয়া যায়। এমনকি নবী করিম (সা.) মদীনায় থাকাকালে অসুস্থতা বা বৃষ্টি-বাদল ছাড়াও নামায জমা করেছিলেন।

(মুসলিম, বাব জামআ বায়না সালাতাইনি ফিল হাযরি)। নামায জমা হবে কি হবে না তা ইমাম এবং মুক্তাদীদের উপর নির্ভরশীল। যদি মুক্তাদীরা অধিকাংশ জমা করার ব্যাপারে মতামত দেয় তবে ইমামের তাদের মতামতের সম্মান করা উচিত। এরূপে ইমাম যদি মনে করে নামায জমা করা দরকার এবং তিনি যদি নামায পড়ানো শুরু করে দেন তখন মুক্তাদীদেরকে কোন উচ্চবাচ্য না করে তার অনুসরণ করা উচিত। তবে উপরোক্ত কারণ ছাড়া বাহানা করে নামায যেন জমা করা না হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

ইস্তিখারার নামায

কোন বিশেষ ধর্মীয় অথবা জাগতিক কাজ আরম্ভ করার পূর্বে এবং কোন ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত বা ফয়সালায় উপনীত হতে না পারলে বা দ্বিধাগ্রস্থ হলে খোদা তা'লার কাছে হেদায়াত ও মঙ্গল কামনা করে যে নামায পড়া হয়, একে ইস্তিখারার নামায বলে। রাতে শোবার পূর্বে এ নামায পড়তে হয়।
ইস্তিখারার নামায ২ রাকা'ত। প্রথম রাকা'তে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকা'তে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়তে হয়। উভয় রাকা'ত নামায পড়া হলে– অর্থাৎ, তাশাহ্হুদ, দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে অতি মিনতি ও বিনয়ের সাথে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করতে হয়-

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ اَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ ۔
فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا اَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ۔
اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ ۔ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ مَعَاشِيْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَ اصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَ اقْدِرْلِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ ۔

(আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বিকুদরাতিকা ওয়া আসঅ-ালুকা মিন ফাযলিকাল্ আযীম। ফাইন্নাকা তাক্দিরু ওয়ালা আক্দিরু ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু ওয়া আন্তা আ'ল্লামুল গুয়ূব।
আল্লাহুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা খায়রুল্লী ফী দ্বীনি ওয়া মা'আশী ওয়া আ'কিবাতি আম্রী ফাক্বদিরহু লী ওয়া ইয়াস্সিরহু লী সুম্মা বারিক লী ফীহি, ওয়া ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হাযাল আমরা শাররুল্লী ফী দ্বীনি ওয়া মা'আশী ওয়া আকিবাতি আম্রী ফাস্রিফহু আন্নী ওয়াসরিফ্নী আনহু ওয়াক্দির লীয়াল্ খায়রা হায়সু কানা সুম্মা আরযিনী

বিহী)। [বুখারী, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্]।
অর্থঃ হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি তোমার জ্ঞান থেকে মঙ্গল কামনা করছি, তোমার অসীম কুদরত (শক্তি ও মহিমা) থেকে কুদরত প্রার্থনা করছি এবং তোমার অসীম ফযল ভিক্ষা করছি। কেননা, তুমি শক্তিশালী পক্ষান্তরে আমি শক্তিহীন, তুমি সর্বজ্ঞ, আমি অজ্ঞ আর সকল অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তুমি সর্বজ্ঞাত।
হে আল্লাহ্! যদি তুমি জানো, এ কাজ (এ স্থলে কাজের কথা উল্লেখ করতে হবে) আমার জন্যে, আমার ধর্ম ও দুনিয়ার জন্যে এবং আমার উন্নতির জন্যে উত্তম হয় ও এর শেষ পরিণতি কল্যাণকর হয় তাহলে তুমি আমার জন্যে একে নির্ধারিত এবং সহজলভ্য করে দাও এবং আমার জন্যে এতে বরকত ঢেলে দাও। কিন্তু তুমি যদি জানো, এ কাজ আমার জন্যে আমার ধর্ম ও দুনিয়ার জন্যে এবং আমার উন্নতির জন্যে ক্ষতিকর এবং এর শেষ পরিণতি আমার জন্যে অকল্যাণকর হয় তাহলে একে আমার কাছ হতে দূর করে দাও এবং আমাকে উক্ত কাজ হতে ফিরিয়ে রাখ এবং যেখানে আমার জন্যে মঙ্গল নিহিত রয়েছে তাই আমার জন্যে নির্ধারিত করে দাও আর আমাকে এতেই সন্তুষ্ট করে দাও।
(শব্দার্থঃ আল্লাহুম্মা- হে আল্লাহ্, ইন্নী- নিশ্চয়ই আমি, আস্তাখীরু- মঙ্গল কামনা করছি, ইলম- জ্ঞান, ওয়া- এবং, আস্তাকদিরু- আমি কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রার্থনা করছি, আসআলু- আমি চাচ্ছি/ভিক্ষা করছি, তাকদিরু- তুমি পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা রাখ, তা'লামু- তুমি জ্ঞান রাখ, গুয়ুব- অপ্রকাশিত বিষয়সমূহ, ইনকুন্তা তা'লামু- তুমি যদি জানো, খায়র- মঙ্গল, মা'আশী- আমার উন্নতি, আকিবাতি-শেষ পরিণতি, আম্‌র- বিষয়, আকদিরহু লী- এ আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও, শাররুল্লী- আমার জন্য অকল্যাণকর, ওয়াসরিফ্‌নী আন্‌হু- এবং আমাকে উক্ত কাজ হতে ফিরিয়ে রাখো, খায়্‌রা হায়সু- যেখানে মঙ্গল নিহিত রয়েছে, আরযিনী বিহী- এতেই আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও।

কসুফ ও খসুফের নামায

সূর্যগ্রহণকে কসুফ এবং চন্দ্রগ্রহণকে খসুফ বলে। এ উভয় গ্রহণের সময়ে মসজিদে গিয়ে বা-জামাত দু' রাকা'ত নামায পড়তে হয়। তবে আযান বা ইকামত দিতে হয় না। এ নামাযের ক্বিরাত আওয়াজ করে পড়তে হয়। গ্রহণকালের দীর্ঘতা হিসেবে এ নামাযের প্রতি রাকা'আতে কমপক্ষে দু'বার করে রুকু দিতে হয়। কোন বর্ণনায় ৩ রুকুর কথাও এসেছে। অর্থাৎ, ক্বিরাত পড়ার পর রুকু দিতে হবে এরপর রুকু থেকে উঠে কুরআনের আরো কিছু অংশ পড়ে পুনরায় রুকু দিতে হবে এবং তারপর সিজদা হবে। এ নামাযে সূরা ক্বিরাত, রুকু, সিজদা লম্বা করতে হয়। নামায শেষ করার পর ইমাম সাহেব খুতবা দান করবেন । (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)। গ্রহণের সময় সদকা, দান-খয়রাত ও তওবা-ইস্তিগফার করতে হয়।

জানাযার নামায

মৃত ব্যক্তির লাশ দাফন করার পূর্বে তার রূহের মাগফিরাতের জন্য যে নামায পড়া হয় একে জানাযার নামায বলে। জানাযার নামায ফরযে কিফায়া (যে ফরয সবার পক্ষ হতে কিছু লোক আদায় করলেই চলে, তা না হলে সবার ওপর গুনাহ্ বর্তাবে)। মসজিদে বা অন্য কোন স্থানে এ নামায পড়া যায়। ইমাম লাশ সামনে রেখে লাশের বক্ষস্থল বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়াবেন। মুক্তাদীদেরকে এক, তিন, পাঁচ বা অনুরূপভাবে বেজোড় সংখ্যায় কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ নামাযে আযান ও ইকামত নেই। রুকু, সিজদাও নেই। এ নামাযে সর্বমোট চারবার তকবীর পাঠ করতে হয়। প্রথম তকবীরের পর সানা ও তাসমীয়াহ্ পাঠ করার পর সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হয়। দ্বিতীয় তকবীরের পর দুরূদ শরীফ পড়তে হয়। এরপর তৃতীয় তকবীর দিয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ার পর চতুর্থ তকবীর দিয়ে সালাম ফিরাতে হয়।

জানাযার নামাযের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَآئِبِنَا وَ صَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ اُنْثٰنَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ ط وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ ط اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ.

(আল্লাহুম্‌মাগফিরলি হায়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উন্‌সানা। আল্লাহুম্মা মান আহইয়ায়তাহু মিন্না ফাআহ্‌য়িহী আ'লাল ইসলামি ওয়া মান তাওয়াফ্‌ফায়তাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আ'লাল ঈমানি। আল্লাহুম্মা লা তাহ্‌রিমনা আজরাহু ওয়ালা তাফ্‌তিন্না বা'দাহু)
অর্থঃ হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যকার জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ, মহিলা সবাইকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের মাঝে যাকে জীবিত রেখেছ, তাকে তুমি ইসলামের ওপরেই জীবিত রাখ এবং আমাদের মাঝে তুমি যাকে মৃত্যু দান কর তুমি তাকে ঈমানের সাথেই মৃত্যু দান কর। হে আল্লাহ! তার (মৃত ব্যক্তির) ভাল কাজ হতে আমাদেরকে বঞ্চিত রেখো না এবং তার পরে আমাদেরকে কলহ-ফাসাদের মাঝে নিক্ষেপ করো না। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়েয)।
(শব্দার্থঃ আল্লাহুম্মা- হে আল্লাহ্! ইগফির- তুমি ক্ষমা করে দাও, হাইয়্যিনা- আমাদের জীবিতগণ, মাইয়্যিতিনা- আমাদের মৃতগণ, শাহিদিনা- আমাদের উপস্থিতগণ, গায়িবিনা- আমাদের অনুপস্থিতগণ, সাগীরিনা- আমাদের ছোটগণ, কাবীরিনা- আমাদের বড়গণ, যাকারিনা- আমাদের পুরুষগণ, উনসানা- আমাদের স্ত্রীলোকগণ, আহ্‌ইয়ায়তা- তুমি

জীবিত রেখেছ, তাওয়াফ্‌ফায়তা- তুমি মৃত্যু দিয়েছ, মান- যাকে, মিন্না- আমাদের মাঝ থেকে, লা তাহরিমনা- তুমি আমাদেরকে বঞ্চিত রেখো না, আজর- [ভাল কাজের] পুরস্কার, ফিতনা-কলহ, বিবাদ/বিপর্যয়)।

মহিলা হলে 'আজরাহু' এবং 'বা'দাহু'-এর স্থলে যথাক্রমে 'আজরাহা' এবং 'বাদাহা' পড়তে হবে। জানাযার নামায দুইজনের হলে যথাক্রমে 'আজরাহুমা' এবং 'বাদাহুমা', অনেকজন হলে 'আজরাহু' স্থলে 'আজরাহুম' এবং 'বাদাহু' স্থলে 'বাদাহুম' পড়তে হবে।

নাবালকের জানাযার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّ فَـرَطًـا وَّ ذُخْـرًا وَّ اَجْـرًا وَّ شَـافِعًـا وَّ مُشَـفَّـعًـا

(আল্লাহুম্মাজ্‌আলহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাতাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়া আজরাওঁ ওয়া শাফিআওঁ ওয়া মুশাফ্‌ফি'আন)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তাকে আমাদের পক্ষ থেকে কল্যাণ সাধনের অগ্রদূতস্বরূপ এবং আরাম ও মঙ্গলের উপকরণস্বরূপ গণ্য করো আর তাকে আমাদের জন্য উত্তম প্রতিদানের কারণ করো এবং তাকে আমাদের জন্যে এমন সুপারিশকারী গ্রহণ করো যার সুপারিশ গৃহীত হয়। (বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)।

(শব্দার্থঃ আল্লাহুম্মা- হে আল্লাহ্!, ইজআ'লহু লানা- তুমি তাকে আমাদের জন্য বানাও, সালাফান- কল্যাণ সাধনের অগ্রদূতস্বরূপ, ওয়া- এবং, ফারাতান- আরাম সাধনের অগ্রদূতস্বরূপ, যুখরান- মঙ্গলের উপকরণস্বরূপ, আজরান- প্রতিদানের কারণ, শাফিআ'ন- সুপারিশকারী, মুশাফ্‌ফাআ'ন- তোমার দরবারে গৃহীত সুপারিশকারীস্বরূপ)

নাবালিকা হলে 'আজ্‌আল্‌হু' স্থলে اجْعَلْهَا 'ইজআল্‌হা', 'শাফিআন' স্থলে شَافِعَةً 'শাফিআতান্' এবং 'মুশাফ্‌ফিআন' স্থলে مُشَفَّعَةً 'মুশাফ্‌ফিআতান' পড়তে হবে।

গায়েবী জানাযার নামায

মৃত ব্যক্তির লাশের অনুপস্থিতে গায়েবী জানাযার নামায আদায় করতে হয়। এমনকি একাধিক মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেও এ নামায পড়া যায়। নিয়ম-কানুন সাধারণ নামাযে জানাযার অনুরূপ।

মৃতের গোসলের নিয়ম

সামান্য গরম পানিতে কুল গাছের পাতা ভিজিয়ে মৃতকে গোসল দেয়া সুন্নত। কুল পাতা পাওয়া না গেলে সাবান দিয়েও গোসল দেয়া যায়। মৃত ব্যক্তির গোসলের পূর্বে পেট টিপে (চাপ দিয়ে) মল-মূত্র বের করা জরুরী নয়। ওযূ করিয়ে গোসল আরম্ভ করা এবং কর্পূর

লাগিয়ে গোসলের কাজ শেষ করা উচিত। শহীদের জন্যে ওযূ-গোসল এবং কাফন জরুরী নয়। তাঁকে রক্তমাখা কাপড়-চোপড়সহ দাফন করতে হয়। যথারীতি পর্দার মাঝে মৃতকে গোসল দেয়া উচিত। মৃত মহিলা ব্যক্তির গোসল মহিলাগণ কর্তৃক যেন সাধিত হয়।

কাফন

মৃত ব্যক্তিকে যে কাপড় পড়ানো হয় তাকে 'কাফন' বলে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হলে তিন প্রস্থ এবং মহিলা হলে পাঁচ প্রস্থ কাপড় পড়ানোর নিয়ম প্রচলিত আছে। নতুন কাপড়ের অভাবে লাশ ঢাকার মত পরিষ্কার পুরানো কাপড়ও ব্যবহার করা চলে। এর অভাবে কলা পাতা, ঘাস ইত্যাদি দিয়েও লাশকে ঢেকে দাফন দেয়া যায়।

পুরুষের কাফন

১) লিফাফা: মাথা হতে পা পর্যন্ত।
২) ইজার: কোমর হতে পা পর্যন্ত।
৩) পিরহান: ঘাড় হতে গোড়ালি পর্যন্ত।

স্ত্রীলোকের কাফন

১) লিফাফা: মাথা হতে পা পর্যন্ত।
২) ইজার: কোমর হতে পা পর্যন্ত।
৩) পিরহান: ঘাড় হতে গোড়ালি পর্যন্ত।
৪) সীনাবন্দ: বগল হতে জানু পর্যন্ত।
৫) দমনী: মাথার চুল বাঁধার জন্য।

কবর যিয়ারত

যেখানে মৃত ব্যক্তিকে দাফন বা সমাহিত করা হয় একে কবর বলে। অনেকগুলো কবরের স্থানকে কবরস্থান বা গোরস্থান বলে। বর্তমান যুগে কবরকে ঘিরে নানা প্রকার বিদাতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কবরকে নানা প্রকার স্থাপনা নির্মাণ করে সাজানো, ফুল দেয়া, বাতি, আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালানো হয়ে থাকে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এগুলো কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এমনকি তিনি মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত এ ব্যাপারে উম্মতকে সতর্ক করে গিয়েছেন। তিনি (সা.) সেসব মহিলাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা কবরে বাতি জ্বালায়। বাংলাদেশেও অনেক কবর বা মাজার রয়েছে যেখানে অর্থ কামানোর উদ্দেশ্যে নানা রকম অনৈসলামিক ও বিদাতি কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। কবরের সুরক্ষা এবং স্মৃতির জন্যে কবরকে সাদামাটাভাবে এক-আধ হাত উঁচু

করে বাঁধানো যেতে পারে বা ঘের দিয়ে রাখা যেতে পারে, এর বেশি নয়। কবর মৃত্যুকে স্মরণ করায়, আর মৃত্যু আল্লাহকে স্মরণ করায়। কবর যিয়ারত মানে কবর দর্শন। কবরস্থানে গেলে মানুষের মৃত্যুকে স্মরণ হয়, মন বিগলিত হয়। আল্লাহ্‌র কাছে যেতে হবে তা মনে আসে। আর দোয়ার আবেগ সৃষ্টি হয়। সেজন্যে কেবল ইসলামে কবর যিয়ারতের বিধান রয়েছে। এ যুগের ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) কবর যিয়ারত সম্বন্ধে বলেন, "কবরস্থানে এক প্রকার আধ্যাত্মিকতা থাকে"। সকাল বেলায় কবর যিয়ারত করা সুন্নত। এটা পুণ্যের কাজ। এতে মানুষের নিজের অবস্থান সম্বন্ধে স্মরণ হয়। মানুষ এ দুনিয়াতে মুসাফিরের ন্যায়। আজ মাটির ওপরে তো কাল মাটির নিচে। হাদীস শরীফে আছে, যখন মানুষ কবরের কাছে আসে তখন বলে: **"আস্‌সালামু আলায়কুম ইয়া আহলাল কুবূরী মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাত ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম লাহিকুন। আসআলুল্লাহা লানা ওয়া লাকুমুল আ'ফিয়াতা"–** অর্থাৎ, "হে কবরবাসী মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীগণ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আল্লাহ্ চাইলে নিশ্চয় আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো। আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে নিরাপত্তা চাচ্ছি।" (মুসলিম, কিতাবুল জানায়েয)।

কবরবাসীর জন্যে মাগফিরাত বা ক্ষমার দোয়া করা উচিত। আর নিজের জন্যও খোদার কাছে দোয়া করা আবশ্যক। মানুষ সবসময় খোদার দরবারে দোয়ার মুখাপেক্ষী।

মৃত ব্যক্তির জন্যেও দোয়া করা উচিত। তার মর্যাদা উন্নীত হওয়ার জন্যে আর তিনি যদি কোন অপরাধ করে থাকেন তাহলে তার অপরাধ ও পাপ ক্ষমার জন্যে এবং তার ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে দোয়া করা উচিত।

মৃত ব্যক্তির নামে কুলখানী, কুরআনখানী, ফাতেহাখানী, চল্লিশা, খতমে কুরআন প্রভৃতি বৈধ নয়। এগুলো বিদাত। বরং তার নামে দোয়া, ইস্তেগফার, সদকা-খয়রাত প্রভৃতি করলে বা গরীবদের খাবার খাওয়ালে এর পুণ্য থেকে তার লাভ হয়।

কবরে যিনি শুয়ে আছেন যদি তিনি বুযূর্গ হন বা সাধারণ লোকও হন তবুও তার কাছে কিছু চাওয়া, কামনা করা সম্পূর্ণ নিষেধ। কেননা, তার রূহ কবজ হয়ে গেছে, আমল বন্ধ হয়ে গেছে। তার আর কোন কিছু করার নেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল মাযারে গিয়ে এটাই বেশির ভাগ করা হয়ে থাকে। কবরে চুমু দেয়া, সিজদা করা সম্পূর্ণ নিষেধ। (ফিকাহ্ আহমদীয়া, পৃ. ২৫৭-২৬৬)।

ইস্তিসকার নামায

প্রয়োজনের সময় কিংবা ঠিক সময়মত বৃষ্টি না হলে অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ্ তা'লার ফযল ও দয়া আকর্ষণের জন্যে খোলা ময়দানে বা-জামাত এ নামায পড়তে হয়। এ নামায দু রাকা'ত। এতে আযান বা ইকামত নেই। ইমাম উচ্চকণ্ঠে

কিরাত পড়ে দু রাকা'ত নামায আদায় করবেন। এরপর সবাই কিবলামুখী হয়ে দু'হাত উর্ধ্বে তুলে খুব জোরে জোরে, আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করবেন–

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيًّا مَرِيًّا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ-

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَ انْشُرْ رَحْمَتَكَ وَ اَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ ط

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا -

(আল্লাহুম্মাসকিনা গায়সাম্ মুগীসান মারীয়্যান মারীয়ান নাফি'আন গায়রা যার্‌রিন আজি-লান গায়রা আজিলিন। আল্লাহুম্মাস্‌কি ইবাদাকা ওয়া বাহায়িমাকা ওয়ান্‌শুর্ রাহমাতাকা ওয়া আহ্‌য়ি বালাদাকাল মাইয়্যিতা। আল্লাহুম্মাসকিনা আল্লাহুম্মাসকিনা আল্লাহুম্মাসকিনা)

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমাদেরকে মুষলধারে বৃষ্টির পানি দান কর। এমন পানি যা আমাদের সকল ভয়-ভীতি ও হতাশাকে দূরীভূত করে, এমন পানি যা উপকারী, ক্ষতিকারক নয়। (সেই পানি যেন) দ্রুত আসে, বিলম্বে যেন না আসে। হে আল্লাহ! তুমি তোমার বান্দাগণকে এবং তোমার সকল জীব-জন্তুকে পানি পান করাও এবং তোমার রহমতকে বিস্তৃতি দান কর আর এ মৃত শহরকে পুনরায় সঞ্জীবিত কর। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে পানি পান করাও। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে পানি পান করাও। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে পানি পান করাও।

[শব্দার্থ: আল্লাহুম্মাসক্বিনা গায়সাম্ মুগীসান- হে আল্লাহ্! আমাদেরকে মুষলধারে বৃষ্টির পানি দাও, মারী'আন- (এমন পানি যা) আমাদের হতাশা দূর করে, সব কিছু সবুজ শ্যামল করে, নাফিয়ান- (সেই পানি) কল্যাণজনক হয়, গায়রা যার্‌রিন- (কারো জন্যে) ক্ষতিকারক না হয়, আজিলান- (সেই পানি যেন) দ্রুত আসে, গায়রা আজিলিন- বিলম্বে না আসে, আল্লাহুম্মাসকি ইবাদাকা- হে আল্লাহ্! পান করাও তোমার বান্দাগণকে, ওয়া বাহায়িমাকা- এবং তোমার সব জীব-জন্তুকে, ওয়ানশুর রাহ্‌মাতাকা- এবং তোমার রহমতকে তুমি ছড়িয়ে দাও, ওয়া আহ্‌য়ি বালাদাকাল মাইয়্যিতা- এবং তুমি তোমার এ মৃত শহরে জীবন সঞ্চারিত করে দাও , আল্লাহুম্মাসকিনা- হে আল্লাহ্! আমাদেরকে পানি পান করাও]

দোয়ার পর আঁ-হযরত (সা.) নিজের চাদর উল্টিয়ে দিয়ে খোদা তা'লার কাছে এ দোয়া করতেন-'তুমি এভাবেই আকাশ ও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করে দাও'। এছাড়া রসূল করিম (সা.) কখনও-কখনও এ নামাযের আগে কিংবা পরে খুতবাও প্রদান করতেন।

ইশ্‌রাকের নামায

সূর্য উঠার পর হতে বেলা এক প্রহর বা ৩ ঘন্টা তথা এক বর্শা পরিমাণ সূর্য উঠা পর্যন্ত এ নামাযের ওয়াক্ত বা সময়। এ নামায দুই বা চার রাকা'ত পড়তে হয়। এটা নফল– অর্থাৎ, অতিরিক্ত নামাযের অন্তর্ভুক্ত।

চাশ্‌তের নামায

ইশ্‌রাকের নামাযের কিছুক্ষণ পর হতে দ্বি-প্রহর হওয়ার কিছু পূর্ব পর্যন্ত এ নামাযের ওয়াক্ত। দুই বা চার রাকা'ত এ নামায পড়তে হয়। এ নামায নফলের অন্তর্ভুক্ত। এ নামাযকে সালাতুয্ যোহাও বলা হয়।

আওয়্যাবীন নামায

মাগরিব নামাযের পর এবং এশার নামাযের পূর্বে ৬ রাকা'ত নফল নামায পড়া হয় একে সালাতুল আওয়্যাবীন বলা হয়ে থাকে। এ নামাযও নফল নামাযের অন্তর্ভুক্ত।

সালাতুল হাজত

কোন মুশকিলের সম্মুখীন হলে বা দুনিয়াবী কোন প্রকার প্রয়োজনের মুখাপেক্ষী হলে অথবা বিশেষ কোন অভাব পূরণের জন্যে এ নফল নামায পড়তে হয়। এ নামায দু' রাকা'ত। নামাযে বেশি বেশি হামদ, সানা ও দুরূদ এবং নিম্নবর্ণিত দোয়াটি পাঠ করা উচিত। উল্লেখ্য, কুরআনের দোয়া ছাড়া সব দোয়াই সিজদা এবং রুকুতে পড়া যায়। এখানে অভাব মুক্তির একটি দোয়া দেয়া হলো–

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ ۔ سُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَآئِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَّالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِثْمٍ ۔ لَا تَدْعُ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهٗ وَ لَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهٗ وَ لَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رَضًا اِلَّا قَضَيْتَهَا يَآ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ۔

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহুল হালীমুল কারীম। সুবহানাল্লাহি রাব্বিল আরশিল আযীম ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আস্‌আলুকা মুওজিবাতি রাহমাতিকা ওয়া আযাইমা মাগফিরাতিকা ওয়াল গানিমাতা মিনকুল্লি বির্‌রিন ওয়াস্ সালামাতা মিনকুল্লি ইসমিন। লা তাদ'উলি যামবান ইল্লা গাফারতাহু ওয়া লা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু ওলা হাজাতানহিয়া লাকা রাযান ইল্লা কাযাইতাহা ইয়া আরহামার রাহিমীন)

অর্থ: আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি পরম সহিষ্ণু, অতীব দয়ালু, আল্লাহ্ পবিত্র, মহান আরশের প্রভু। সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক। (হে এ সব গুণের অধিপতি আল্লাহ্!) আমি তোমার নিকট সেসব কাজের তৌফিক চাচ্ছি যেগুলো তোমার রহমতের উপকরণ এবং তোমার মাগফিরাতকে (ক্ষমা) নিশ্চিত করে এবং সবরকম অতিরিক্ত পুণ্য ও সবরকম পাপ হতে নিরাপত্তা কামনা করি। হে সর্বাধিক করুণাকারী! তুমি আমার কোন পাপ ক্ষমা না করে ছেড়ো না, আমার কোন চিন্তা দূরীভূত না করে ছেড়ো না এবং আমার কোন প্রয়োজন যা তোমার সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে, পূর্ণ না করে ছেড়ো না।

(শব্দার্থ: হালীমুল কারীম- পরম সহিষ্ণু, পরম দয়ালু, সুবহান- পবিত্র, রাব্ব- প্রভু-প্রতিপালক, আ'রশিল আযীম- মহান আরশ, আস্‌আলুকা- আমি তোমার কাছে চাচ্ছি, মুজিবাতি রাহমাতিকা- তোমার রহমতের উপকরণ, আ'যাইমি মাগফিরাতিকা- তোমার ক্ষমার নিশ্চয়তা, আল গানীমাতা মিন কুল্লি বির্‌রিন- সবরকম অতিরিক্ত পুণ্য, ওয়াস্ সালামাতা মিন্ কুল্লি ইসমিন- সবরকম পাপ থেকে নিরাপত্তা, লা তাদ'উলি যামবান ইল্লা গাফারতাহু- আমার কোন পাপকে ক্ষমা না করে ছেড়ো না, ওয়া লা হাম্মান ইল্লা ফাররাজতাহু- কোন চিন্তা দূরীভূত না করে ছেড়ো না, ওয়া লা হাজাতান ইল্লা ক্বাযায়তাহা- এবং এমন কোন প্রয়োজন যা তোমার সন্তুষ্টির কারণ হতে পারে পূর্ণ না করো ছেড়ো না, ইয়া আর্‌হামার্ রাহিমীন- হে সর্বাধিক করুণাকারী)

বিবাহের খুতবা

বিবাহের মজলিসে উপস্থিত সকলের সামনে দাঁড়িয়ে নিম্নলিখিত খুতবা পাঠ করতে হয়:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَ نَسْتَعِيْنُهٗ وَ نَسْتَغْفِرُهٗ وَ نُؤْمِنُ بِهٖ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۔ وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَ مَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ ۔ وَ نَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ نَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ۔ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يَآ يُّهَاالنَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّ احِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًاo

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ۙ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۚ وَ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًاo

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰ مَنُوا اتَّقُو ا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَo

(আল্‌হামদু লিল্লাহি নাহ্‌মাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগ্‌ফিরুহু ওয়ানু'মিনুবিহী ওয়ানাতাওয়াক্কালু আলায়হি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়ামিন সাইয়্যেআতি আমালিনা মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাইয়্যুযলিল্‌হু ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া নাশ্‌হাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া নাশহাদু আন্না মুহাম্মাদ্ন আ'বদুহু ওয়া রাসুলুহু। আম্মা বা'দু ফা'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্‌ শায়তানির রাজীম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ইয়া আইয়্যুহান্নাসুত্তাকু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাকাকুম মিন্নাফসিওঁ ওয়াহিদাতিন ওয়া খালাকা মিনহা যাওজাহা ওয়া বাস্‌সা মিনহুমা রিজালান কাসীরাওঁ ওয়া নিসাআ, ওয়াত্তাকুল্লাহাল্লাযী তাসাআলুনা বিহী ওয়াল আরহাম, ইন্নাল্লাহা কানা আলায়কুম রাকীবা।

ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুলু কাওলান্‌ সাদীদা ইয়ুস্‌লিহ্‌ লাকুম আমালাকুম ওয়া ইয়াগফির লাকুম যুনূবাকুম ওয়ামাইয়্যুতি'ইল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ফাক্বাদ ফাযা ফাওযান আযীমা।

ইয়া আইয়্যুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়ালতানযুর নাফ্‌সুম্‌ মা ক্বাদ্দামাত লিগাদ, ওয়াত্তাকুল্লাহা ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা তা'মালুন)

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর কাছে আমরা ক্ষমা ভিক্ষা করি, তাঁর প্রতি ঈমান আনি, তাঁর ওপরই ভরসা রাখি। আমরা আমাদের নফস বা প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা হতে এবং নিজেদের খারাপ কাজ হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ্‌ যাকে সৎপথ দেখান তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, এবং আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন, তাকে কেউ হেদায়াত দান করতে পারে না।

আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি এক অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই এবং আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

এরপর আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ্‌র নামে (আরম্ভ করছি) যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী।

"হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, আর তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী বিস্তার করেছেন, এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন কর, এরূপে রক্তসম্পর্কের আত্মীয়তার বন্ধনের ক্ষেত্রেও (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের ওপর পর্যবেক্ষণকারী।" (সূরা নিসা: ২)।

"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ সরল কথা বল। তাহলে আল্লাহ্‌ তোমাদের কাজকে সংশোধিত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে চলবে সে নিশ্চয় মহা সফলতা লাভ করবে।" (সূরা আহ্‌যাব: ৭১-৭২)।

"হে যারা ঈমান এনেছো! তোমার আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং প্রত্যেককেই চিন্তা করে দেখা উচিত, আগামীকালের জন্য সে অগ্রে কি প্রেরণ করেছে। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যে কর্মই কর, সে সম্বন্ধে নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সবিশেষ খবর রাখেন।" (সূরা হাশর : ১৯)।

বিয়ে-শাদীর কাজে তাড়াহুড়ো করা ঠিক নয়। উল্লেখিত আয়াতসমূহে বারবার তাকওয়া বা খোদাভীতির কথা বলা হয়েছে। সুতরাং খোদাভীতিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দান করে বিয়ের সম্বন্ধ স্থির ও বিবাহ কার্য সমাধা করা বাঞ্ছনীয়। সম্বন্ধ স্থির করার পূর্বে ইস্তিখারা করে নেয়া আবশ্যক। বিবাহের সাথে নিম্নলিখিত বিষয়াদি ছাড়া অন্যান্য প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানাদির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো বিদাত এবং আহমদীদের এ থেকে বিরত থাকতে হবে। মসজিদ বা অন্য কোন সুবিধামত স্থানে জামাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট, মুরব্বী অথবা মোয়াল্লেম বা অন্য কোন স্থানীয় ব্যক্তি বিবাহের এলান (ঘোষণা) করবেন। যথারীতি জামাত কর্তৃক নির্ধারিত বিয়ের ৪ কপি ফরম পূরণ করতে হবে। বিয়ের এলানের পূর্বে জামাত কর্তৃক নির্ধারিত বিয়ের ফরম যথাযথভাবে পূরণ হয়েছে কিনা, ছেলে-মেয়ের স্বাক্ষর আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে। দেশের আইন অনুযায়ী বিয়ে রেজিস্ট্রিও করতে হবে। পাত্র পক্ষ সামান্য খোরমা বা মিষ্টি দ্রব্যের ব্যবস্থা করবেন। নববধূকে স্বামী গৃহে নিয়ে গেলে দাওয়াতে ওলীমা বা বৌভাত করা সুন্নত। এ ব্যাপারে সব খরচাদি পাত্রপক্ষকে বহন করতে হবে।

মোহরানা

মোহরানা এক প্রকারের দেনা এবং অবশ্য পরিশোধযোগ্য। (সূরা নিসা : ৫ ও ২৫ নং আয়াত)। সম্ভব হলে বিবাহের সময় এটা স্ত্রীকে দিতে হয় নচেৎ পরে স্ত্রীর সম্মতিক্রমে যথাসম্ভব শীঘ্র দেয়া বিধেয়। মোহরানা আদায়ের পূর্বে স্ত্রী মারা গেলে মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়ে এটা উত্তরাধিকারীদের মাঝে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বন্টন করতে হবে। স্বামীও উত্তরাধিকার হিসাবে তার নির্ধারিত অংশ পাবে। অবশ্য স্ত্রী খুশি হয়ে স্বেচ্ছায় মোহরানা মাফ করে দিলে তা পরিশোধের প্রশ্ন আর উঠে না। (সূরা নিসা : ৫)। কিন্তু জবরদস্তি করে মাফ নেয়া শরীয়তবিরোধী। মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণ সম্বন্ধে শরীয়তে ধরা-বাঁধা কোন নিয়ম নেই। তবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের রেওয়াজ অনুযায়ী, মোহরানার সর্বোচ্চ পরিমাণ পাত্রের দু'বছরের আয়। যেহেতু ইসলাম পুরুষকে চার স্ত্রী রাখার অধিকার দিয়েছে, সেজন্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে সাধারণত বিবাহকালীন প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য পাত্রের ৬ মাসের রোজগারের পরিমাণ টাকা মোহরানা হিসেবে নির্ধারণ করার ব্যবস্থা রেখে এক স্ত্রীর জন্য ৬ মাসের আয়ের পরিমাণ মোহরানা ধার্য করা যেতে পারে। যেখানে পাত্রের কোন সম্পত্তি বা আয় নেই, সেখানে মোহরানার পরিমান ধার্য করা যেতে পারে না, সেক্ষেত্রে স্বামী পরবর্তী সময়ে উপার্জনশীল হলে স্ত্রীকে প্রচলিত জামাতী প্রথা অনুযায়ী মোহরানা দিতে বাধ্য থাকবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রোযা (সিয়াম)

ইসলামী ইবাদতের গুরুত্বপূর্ণ রোকন বা স্তম্ভ হলো সিয়াম বা রোযা পালন। চান্দ্র বছরের নবম মাসের নাম রমযান। রমযান মাসের নাম পূর্বে ছিল 'নাতেক' (তফসীর গ্রন্থ- ফাতহ আল-কাদীর)। রমযান শব্দটি 'রময' মূল ধাতু হতে এসেছে। এর অর্থ পিপাসায় উত্তপ্ত হওয়া। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্বন্ধে বলেছেন, "আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে রময বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোযাদার পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগ-বিলাস হতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণে ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে, সেজন্য এ আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান হয়েছে। আভিধানিকগণ বলে থাকেন, রমযান গ্রীষ্মকালে এসেছিল বলে একে 'রমযান' বলা হয়েছে। আমার মতে এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা আরব দেশের জন্যে এতে কোন বিশেষত্ব থাকতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্ম-কর্মে উদ্দীপনা। 'রময' এমন উত্তাপকেও বলা হয় যাতে পাথর প্রভৃতি পদার্থ উত্তপ্ত হয়।" (আল হাকাম, ২৪ জুলাই, ১৯০১ইং)।

রমযান মাসের নামকরণের কারণসমূহ:

(ক) এ মাসে রোযা রাখার ফলে পিপাসার জন্যে উত্তাপ ও দহনের সৃষ্টি হয়।

(খ) এ মাসের ইবাদতসমূহ মানুষের দেহ হতে পুঞ্জীভূত সূক্ষ্ম পাপরাশিকে দূরীভূত করে।

(গ) এ মাসের ইবাদতসমূহ মানুষের হৃদয়ে এমন এক ভালোবাসা এবং অনুরাগের উত্তাপ সৃষ্টি করে যাতে সে ঐশীপ্রেম ও মানবপ্রেমের দীক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়। (তফসীরে

সগীর, সূরা বাকারার ১৮৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

হযরত রসূল করিম (সা.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছর মুসলমানদের ওপর রমযানের রোযা ফরয করা হয়। রমযানের ইতিহাস, নিয়ম-কানুন, উদ্দেশ্য এবং আদর্শ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে সূরা বাকারার ২৩ নং রুকুতে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। রমযানুল মোবারকের কতগুলো বিশেষত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১) রোযার হাকীকত (তাৎপর্য):

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রোযার হাকীকত বা তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখেছেন "অল্প আহার এবং ক্ষুধা সহ্য করাও আত্মশুদ্ধির জন্য আবশ্যক। এতে দিব্যদর্শন শক্তি– অর্থাৎ, কাশফী শক্তি বৃদ্ধি পায়। মানুষ শুধু খাদ্য গ্রহণ করে বাঁচে না। যে অনন্ত জীবনের প্রতি দৃষ্টি দেয়া একেবারেই পরিত্যাগ করে, সে নিজের ওপর 'ঐশী কোপ' (কহরে ইলাহী) আনয়ন করে। কিন্তু রোযাদারকে লক্ষ্য রাখতে হবে, রোযার অর্থ শুধু এটা নয়, মানুষ অনাহারে থাকবে। বরং খোদার যিকর– অর্থাৎ, তাঁর স্মরণে ব্যস্ত থাকা উচিত। আঁ-হযরত (সা.) রমযান মাসে অনেক বেশি ইবাদত করতেন। এ দিনগুলোতে পানাহারের চিন্তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি মনোনিবেশ করা দরকার। দুর্ভাগ্য সেই ব্যক্তির, যে দৈহিক প্রয়োজনে খাদ্য গ্রহণ করে, কিন্তু আধ্যাত্মিক খাদ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। বাহ্যিক খাদ্যে দৈহিক শক্তি লাভ হয়। একইভাবে আধ্যাত্মিক খাদ্য আত্মাকে কায়েম রাখে এবং এতে আত্মার শক্তিগুলো সতেজ হয়। খোদার কাছে সাফল্য চাও। কারণ তিনি সামর্থ্য দিলেই সব দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে।"

আহারে দেহ শক্তিশালী হয় এবং রোযার মাধ্যমে অনাহারের ফলে আত্মা শক্তিশালী হয়। জড় অনাহারকে যিকরে ইলাহী দিয়ে পূরণ করতে হয়। কারণ যিকরে ইলাহী আত্মার খোরাক। জড়খাদ্য ও ভোগবিলাসে আত্মা মৃতবৎ হয়ে যায় এবং রোযার মাধ্যমে যিকরে ইলাহীতে আত্মা জাগ্রত, সতেজ ও ঐশী শক্তিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরো বলেছেন-

"কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয়, বরং এর একটি তাৎপর্য এবং প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতায় বোঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মাঝেই এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায় ততই তার আত্মশুদ্ধি এবং দিব্যদর্শন শক্তি বৃদ্ধি পায়। খোদার অভিপ্রায় এটাই, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারের সবসময়ই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। খোদা তা'লার যিকর বা স্মরণেই সময় কাটানো উচিত যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব রোযার উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে। রোযা আত্মার প্রশান্তি এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যেই রোযা রাখে

এবং তার রোযা কোন আচার-অনুষ্ঠানের রোযা হয় না, তার উচিত সে যেন সারাক্ষণ হামদ (প্রশংসা কীর্তন), তসবীহ্ (আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা) এবং তাহলীলের (আল্লাহ্‌র তৌহীদ ঘোষণা) মাঝে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্যের (আধ্যাত্মিক খাদ্যের) সৌভাগ্য লাভ হয়।" (আল্ হাকাম: ১৭/০১/১৯০৭ ইং)।

আল্লাহ্ তা'লার খাবারের প্রয়োজন হয় না। আমরা রোযা রেখে অনাহারে থেকে যেমন আল্লাহ্ তা'লাকে অনুসরণ করি, তেমনি যিকরের মাধ্যমে তাঁর গুণাবলীকে স্মরণ করে সেগুলোকেও আমাদের চরিত্রে নকল ও প্রতিফলিত করার সুযোগ দানই হলো রোযার বিধানের উদ্দেশ্য। ঐশী বিধানসম্মত রোযা মানুষকে ঐশী রঙে রঙিন করে। হযরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'প্রত্যেক পুণ্যের জন্য আমি কোন না কোন বস্তুর আকারে পুরস্কার নির্ধারিত করেছি। কিন্তু রোযা আমারই জন্য এর রোযার পুরস্কার আমি স্বয়ং'।" এর অর্থই হচ্ছে, সফল রোযাদারের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় জ্যোতি ও শক্তির বিকাশ করে থাকেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রোযার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেন: "আমাদের দেহে দৈনিক যে রুহানী বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্যে আরও একটি ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ, দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যে তিনি দৈনিক পাঁচবারের নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্যে রমযানে এক মাসের রোযা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। রোযা না রাখার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়তেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে খোদা তা'লা তার সামনে এলেও তাকে সে চিনতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারালে তার অত্যন্ত নিকটাত্মীয় সামনে এসে দাঁড়ালেও সে তাকে দেখতে পারে না। অনেকে মনে করে, তারা রোযা রেখে খোদার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। এরূপ মনে করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। চিকিৎসক কোন রুগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তক্ষরণ করালে যদি সে রুগী মনে করে যে, সে রক্ত দিয়ে ডাক্তারের বড়ই উপকার করেছে, তাহলে তার চেয়ে বড় মূর্খ আর কে আছে? ঔষধ যতই তিক্ত হোক তা রুগীর জন্যে কল্যাণজনক। তদ্রূপ যখন কেউ রমযান মাসে রোযা রাখে, তখন সে খোদা তা'লার উপর অনুগ্রহ করে না; বরং এটা তার উপর খোদা তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এই দিনগুলোকে যত বেশি সদ্ব্যবহার করবো, আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে, যেগুলো ভিতরে ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল।" (দৈনিক আল্ ফযল: ১৯/১২/১৯৬৫ ইং)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) রমযানের ইবাদত সম্বন্ধে বলেন:

"মাহে রমযান পাঁচটি ইবাদতের সমষ্টি। প্রথমটি হলো রোযা রাখা। দ্বিতীয়: ফরয নামায ছাড়াও রাত্রি জাগরণ– অর্থাৎ, রাত্রে নফল ইবাদতসমূহ (তারাবীহ্, তাহাজ্জুদের নামায ইত্যাদি) আদায় করা এবং বিনয়ের সাথে নিজ প্রভুর কাছে সব ধরনের মঙ্গল কামনা করা। তৃতীয়: বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা। চতুর্থ: দান-খয়রাত করা এবং পঞ্চম: প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা হতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা।

২) রোযার ঐতিহাসিক দিক:

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۸۴﴾

(ইয়া আয়্যুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আ'লায়কুমুস্ সিয়ামু কামা কুতিবা আ'লাল্লাযীনা মিন কাবলিকুম লা'আল্লাকুম তাত্তাকুন)

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর এটা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর। (সূরা বাকারা: ১৮৪)।

রোযাকে ফরয করার সাথে-সাথে আল্লাহ্ তা'লা ঐতিহাসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক সম্বন্ধেও ইঙ্গিত করে বলেছেন, এ রোযার নির্দেশ কোন অভিনব ব্যাপার নয় এবং এতে কোন অসহনীয় কষ্টও নেই। ধর্মের ইতিহাস পাঠে জানা যায়, বিশ্বের সব ধর্মেই রোযা অবশ্যপালনীয় ব্যবস্থা ছিল। হযরত মূসা (আ.)-এর অনুবর্তিতায় ইহুদীরা রোযা পালন করে। বাইবেলে হযরত মূসা (আ.) সম্বন্ধে লিখিত আছে, "সেই সময় মোশী (মূসা) চল্লিশ দিবারাত্র সেথা সদা প্রভুর সাথে অবস্থান করলেন, পানাহার করলেন না। আর তিনি সেই দুই প্রস্তরে নিয়মের বাক্যগুলো– অর্থাৎ, দশ আজ্ঞা লিখলেন।" (যাত্রা পুস্তক, ৩৪:২৮)

হযরত ঈসা (আ.) রোযা রাখতেন এবং তাঁর অনুবর্তিতায় খ্রিস্টানরা রোযা পালন করে। ইঞ্জিলে আছে, "তখন যীশু দিয়াবল (শয়তান) দ্বারা পরীক্ষিত হবার জন্যে আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হলেন। আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থেকে শেষে ক্ষুধার্ত হলেন।" (মথি, ০৪ : ২-৩)। এভাবে দেখা যায়, মিশরীয়দের মাঝেও রোযার প্রচলন ছিল। গ্রীকরা রোযা রাখতো এবং হিন্দু ধর্মেও উপবাসব্রত পালনের প্রচলন আছে। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাতে FASTING শীর্ষক অংশে লেখা আছে: BY THE GREATER NUMBER OF RELIGION IN THE LOWER, MIDDLE AND HIGHER CULTURES ALIKE FASTING IS LARGELY PRESCRIBED. অর্থাৎ, সভ্যতার নিম্ন, মধ্য এবং উচ্চ পর্যায় নির্বিশেষে অধিকাংশ ধর্মেই উপবাসের (রোযার) প্রচলন রয়েছে। উল্লেখ্য, একমাত্র ইসলাম ধর্মই রোযার নিয়ম-কানুন এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা

প্রদান করেছে এবং একে এক স্থায়ী ও নির্দিষ্ট রূপ দান করেছে।

৩) তাকওয়ার পথ:

রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো 'লা'আল্লাকুম তাত্তাকুন' (সূরা বাকারাঃ ১৮৪)– অর্থাৎ, রোযার বিধান এ জন্য দেয়া হয়েছে, রোযা রেখে যেন রোযাদারের মাঝে নিষ্ঠা এবং উত্তম চরিত্র জন্মে। সুতরাং কেউ যদি রোযা রেখে এ ফল না পায়, তবে বুঝতে হবে, সে রোযার তাৎপর্য বুঝেনি এবং সে সঠিকভাবে রোযা পালন করেনি। প্রকৃতপক্ষে সে রোযা রাখেনি, শুধু উপবাস ছিল এবং তার উপবাস থাকা আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় ছিল না। একজন বুদ্ধিমান, সাবালক এবং সুস্থ মুসলমান প্রভাত হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌনসম্পর্ক, মিথ্যা, গালি-গালাজ, পরনিন্দা, পরচর্চা (গীবত) এবং সব ধরনের মন্দ কাজ হতে বিরত থাকে, এ সময়ে কুরআন পাঠ এবং এর অর্থ অনুধাবনে ব্রত থাকে, ফরয নামাযসহ তারাবীহ্ এবং তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে, দীন দরিদ্রের সেবা করে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে যিক্‌রে ইলাহী বা খোদার স্মরণে মশগুল থাকার চেষ্টা করে। কেবল এ সমুদয় বিষয় দ্বারা রোযা এবং তাকওয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অর্জন করা যায়। রমযানের মহা বরকতপূর্ণ দিনগুলোতে রোযাদারের চিত্ত এবং দেহের প্রতিটি অংশ কার্যত অনুভব করতে থাকে, তার মাঝে রোযার ফলে এক প্রকার বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এভাবে রোযায় ইসলাহে নফ্‌স বা আত্মশুদ্ধি হয়ে থাকে।

৪) আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও দৈহিক সংযম:

প্রতি বছর রোযা আমাদের কাছে ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণরূপে এসে থাকে। মাহে রমযানে নির্দিষ্ট সময়ে রোযা রাখতে হয়, নির্দিষ্ট সময়ে ইফতার করতে হয়, তারাবীহ্ এবং তাহাজ্জুদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। পিপাসা এবং ক্ষুধার জন্যে মানুষের অনুভব-শক্তি সতেজ হয়। ফলে তার বিবেক বুঝতে পারে, জাতির সেসব দরিদ্র এবং অনুন্নত ব্যক্তিদের অবস্থা কিরূপ যাদের খাওয়ার পয়সা নেই। যেমন, এতীম এবং বিধবাদেরকে কত কী যে সহ্য করতে হয়। রোযাদার যদি চেতনাশীল হয় তাহলে সে সহজে বুঝতে পারে, মানবতার কত বড় শিক্ষা রয়েছে এ রোযার মাঝে! সব শ্রেণীর লোকের মাঝে ঘনিষ্ঠতা, ঐক্য, সাম্য, প্রেম, হৃদ্যতা, শৃংখলাবোধ, পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা, অনুবর্তিতা, উত্তম ব্যবহার, সৌজন্য, সংযম এবং সর্বোপরি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টা– এসব বিষয়ের জন্যে মাহে রমযানে পবিত্র সাধনা এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ রোযার মাধ্যমে মিথ্যা, অহংকার, স্বেচ্ছাচারিতা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যাবাদিতা, অপব্যয়, নেশাপ্রিয়তা, পাষাণচিত্ততা, নির্লজ্জতা ইত্যাদি কদাচারসমূহ সমাজদেহ হতে বিধৌত হয়ে শুধু ব্যক্তি চরিত্রই নয়, জাতীয় চরিত্রেরও উন্নতি সম্ভবপর হয়। কিন্তু রোযা রেখে যদি অসৎ কাজ পরিহারের প্রচেষ্টা না থাকে এবং সৎগুণ অর্জনের উদ্যম না থাকে

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

তাহলে সেই রোযা রাখা নিরর্থক।

এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন, "অনেক লোক ছোট-ছোট কষ্টে ভীত হয়। এ শ্রেণীর লোকও সারা মাস রোযা রাখে এবং কষ্ট করে। এতে তারা প্রমাণ করে, তারা উপবাস করতে এবং এর কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম। এরূপে তাদের কষ্ট স্বীকার করার অভ্যাস হয়ে যায়। অতএব এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, ধর্মের সেবার জন্যে অধিকতর উদ্যমী হওয়া আবশ্যক এবং কষ্ট দেখে ভীত হওয়া উচিত নয়। লক্ষ্য করা উচিত, কাজ করার সংকল্প বা নিয়ত করা ও না করার মাঝে কত প্রভেদ রয়েছে। রমযান মাসে নিয়ত করা হয় যেন রোযাদার দিবাভাগে ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে। কিন্তু অন্য সময়ে এ নিয়ত থাকে না বলে তখন দু' ঘন্টার ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করা যায় না। সুতরাং নিয়ত বা সংকল্পের দ্বারা বড়-বড় কাজ করা সম্ভব। অনুরূপভাবে আমাদের নিয়ত এবং সংকল্পকে এভাবে দৃঢ় করে নেয়া উচিত যেন আমরা খোদার ধর্ম প্রচারে কোন ত্রুটি না করি এবং ধর্মের বিষয়ে কোন কষ্টকে কষ্ট বলে মনে না করি।" (দৈনিক আল্ ফযল: ১২/২/১৯৬৪ ইং)

খোদার জন্যে এবং তাঁর ধর্মের জন্যে যাদের হৃদয়ে ভালোবাসা আছে এবং যারা শুধু দুনিয়ার ভালোবাসায় আত্মহারা হয়নি তাদের জন্যে রমযানের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং অনুপম সাধনার মাঝে এরূপ সংকল্প গ্রহণ করার মহান শিক্ষা রয়েছে ।

৫) রমযানে কুরআন পাঠের গুরুত্ব:

রমযানে কুরআন পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ

(শাহ্‌রু রামাযানাল্লাযী উন্‌যিলা ফীহিল্ কুরআন)

অর্থাৎ, "রমযান সেই মাস যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে কুরআন।" (সূরা বাকারাঃ ১৮৬)

রমযান মাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিশেষত্ব হলো, এ পবিত্র মাসে কুরআন করিম নাযিল করা হয়েছিল। আর প্রতি বছর এ মাসে জীব্রাইল (আ.)-এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে বছরের অন্যান্য সময়ে এবং পূর্বে যতখানি কুরআন অবতীর্ণ হতো, তা পুনরাবৃত্তি করা হতো। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের শেষ বছরের রমযান মাসে হযরত জীব্রাইল (আ.) তাঁর কাছে দু'বার প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত কুরআন করিম আবৃত্তি করেন। (বুখারী)। এতে তিনি বুঝতে পারেন, কুরআন করিম নাযিল সমাপ্ত হয়েছে।

এ পবিত্র মাসে রোযার কল্যাণ, আজ্ঞানুবর্তিতা এবং কুরআন পাঠ–এসব ইবাদত একত্রে মানবচিত্তে এক আশ্চর্য আধ্যাত্মিক অবস্থা সৃষ্টি করে। আঁ-হযরত (সা.) বলেন, "রমযান ও কুরআন বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, 'খোদা! আমি তাকে পানাহার

এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছি, তাই তুমি তার জন্যে আমার সুপারিশ কবুল কর।' কুরআন বলবে: 'আমি তাকে রাত্রে নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি এবং তাকে ঘুমাতে দেইনি, এ কারণে তার জন্যে আমার সুপারিশ কবুল কর।' তাদের সুপারিশ কবুল করা হবে।" (বায়হাকী)।

রোযা রেখে কুরআন করিম পাঠ করা, এর অর্থ বুঝতে চেষ্টা করা এবং এর অনুশাসনাদি পালন করার মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিক দর্শনশক্তি সতেজ হয়। সে শয়তানি চিন্তাভাবনা ও প্রভাব হতে নিরাপদ থাকে। অধিকন্তু মানুষ এক অনাবিল আধ্যাত্মিক প্রশান্তি এবং পরম সম্পদ লাভ করে– যা শুধু অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

সুনিয়ন্ত্রিত সুখাদ্য যেমন দেহকে সুস্থ, সবল ও আনন্দময় করে, তেমনি সুনিয়ন্ত্রিত ইসলামী রোযা আত্মাকে সুস্থ, সতেজ ও উর্ধ্বগামী করে। বস্তুত মাহে রমযানের পবিত্র দিনগুলো বড়ই বরকতপূর্ণ। যে নিতান্তই দুর্ভাগা এবং অপরিণামদর্শী, একমাত্র সে-ই এ কল্যাণ হতে নিজেকে বঞ্চিত রাখে এবং অন্যান্য দিনের মতই পানাহারে মত্ত থাকে।

৬) আল্লাহ্‌র নৈকট্য এবং দোয়া কবুলিয়্যত:

রোযার মাধ্যমে বান্দার হৃদয় যখন বিগলিত হয় এবং তার পার্থিব লালসাগুলো স্তিমিত হয়ে আসে, তখন তার আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ বিকাশ ও পরিবর্ধন লাভ করতে থাকে এবং তার আত্মা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে। বান্দার এ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

(ওয়া ইযা সাআ-লাকা ইবাদী আন্নী ফাইন্নি কারীব, উজীবু দা'ওয়াতাদ্দা'য়ি ইযা দা'আনি, ফাল ইয়াসতাজীবু লী ওয়াল ইউমিনু বী লা'আল্লাহুম্ ইয়ারশুদুন)

অর্থ: "এবং আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে যখন জিজ্ঞেস করে তখন (বল যে) আমি নিকটেই আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাতে তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।" (সূরা বাকারা: ১৮৭)।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে তাঁর বিধান অনুযায়ী রোযা রাখলে দোয়া কবুল হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বান্দার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। সেজন্যে কোন বিপদ আপদে পড়লে এ আদেশের অনুশীলনে রোযা রেখে দোয়া করলে বিপদ কেটে যায়।

৭) হারাম জিনিস পূর্ণরূপে বর্জনের শিক্ষা:

মাহে রমযানে মুসলমানরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে সাময়িকভাবে হালাল খাদ্য-বস্তু এবং কামনা-বাসনাকে পরিহার করে। তাদের হাতের কাছে উপভোগ্য সব বস্তু থাকা সত্ত্বেও তারা সেগুলো ভোগ করে না। একমাস ধরে এ সাধনা চলতে থাকে। এ সাধনার ফলে সে এ শিক্ষা লাভ করে যে, আল্লাহ্‌র আদেশে সে যদি হালাল দ্রব্যসমূহ পরিত্যাগ করতে পারে, তাহলে সেসব জিনিস এবং লোভ-লালসাকে কত বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরিত্যাগ করা উচিত, যেগুলো আল্লাহ্ তা'লা নিষেধ করেছেন। সেজন্য আল্লাহ্ তা'লা রোযা সংক্রান্ত বিষয়ের পরেই বলেন- "তোমরা জেনে শুনে একে অন্যের মাল (ধন সম্পদ) অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং অন্য লোকের সম্পত্তির কোন অংশ আত্মসাৎ করার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষকে কিছু (ঘুষ) দিও না।" (সূরা বাকারা : ১৮৯)। এ আয়াতে রোযার ফলে সমাজ কিভাবে উপকৃত ও দোষমুক্ত হতে পারে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

৮) রোযার আরও কয়েকটি বিশেষ উপকারী দিক:

(ক) সম্পূর্ণ একমাস রোযা এজন্য রাখতে হয় যেন এতে প্রবৃত্তি অবদমিত হয় এবং মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের যোগ্যতার জন্য একটি পূর্ণ সময় পায়।

(খ) চাঁদের হিসাবে রোযা রাখার ফলে সব মৌসুমেরই অভিজ্ঞতা জন্মে এবং রোযার উদ্দেশ্য বছরে বছরান্তরে পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

(গ) বিশেষ মাসে রোযা রাখার উদ্দেশ্য হল সবাই জাতিগতভাবে একসঙ্গে বিশেষ অনুকূল পরিবেশের মাঝে রোযা রেখে এর পূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম হওয়া।

দান-খয়রাত ও ফিতরানা

রোযার মাস বিশেষ দান-খয়রাতের এক সুবর্ণ সুযোগ আনয়ন করে। রোযার সাধনা এবং কৃচ্ছতা মালী কুরবানীর সাথে একত্র হয়ে এক মহান আধ্যাত্মিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। যাকাত, সদকা, ফিতরানা এবং অন্যান্য দান-খয়রাতের মাধ্যমে সমাজের গরীব-দুঃখী সবাই এ মহান সাধনায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং পবিত্র ঈদের খুশীতে শামিল হতে পারে। এ জন্যে হাদীসে এসেছে, মাহে রমযানে রসূল করিম (সা.) ঝড়ের গতিতে দান খয়রাত করতেন। বস্তুত সকল প্রকার রূহানী সাধনার সাথে মালী কুরবানীর এক মহান ত্যাগজনিত তৃপ্তিতেই এ পবিত্র মাসের উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হয় এবং সত্যিকার অর্থে ঈদের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

রোযার প্রকারভেদ

রোযা সাধারণত দুই প্রকার: ১) ফরয রোযা, ২) নফল রোযা। ফরয রোযার উদাহরণ হচ্ছে- রমযানের রোযা, রমযানের (ছুটে যাওয়া) রোযার কাযা, যিহারের (স্ত্রীকে মা বলে ফেলার কারণে) কাফফারার রোযা, জেনে-শুনে রোযা ছেড়ে দেওয়ার কারণে কাফফারার ৬০টি রোযা, কসম খাওয়ার কাফফারার রোযা, মানতের রোযা ইত্যাদি। আর নফল রোযার উদাহরণ হচ্ছে- শাওয়ালের ৬ রোযা, আশুরার রোযা, হযরত দাউদ (আ.)-এর রোযা– অর্থাৎ, একদিন রোযা রাখবে এবং একদিন খাবার খাবে– এভাবে ধারাবাহিকভাবে নফল রোযা রাখা, আরাফাতের দিনের রোযা, প্রত্যেক চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোযা রাখা ইত্যাদি। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২৭২)।

রোযা কাদের ওপর ফরয

১। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে জানিয়েছেন, **"ফামান শাহিদা মিনকুমুশ্ শাহ্‌রা ফালইয়াসুমহু"**– অর্থাৎ, রমযান মাসে যে কেউ জীবিত এবং সুস্থ থাকে তার জন্য রমযান মাসে রোযা রাখা ফরয। (সূরা বাকারা: ১৮৬)।

২। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান, সুস্থ, মুকীম (অবস্থানকারী) মুসলমান পুরুষ এবং মহিলার ওপর রমযান মাসের রোযা রাখা ফরয। বছরের শুধু রমযান মাসের রোযাই ফরয। বাকী অন্যান্য রোযা নফল।

৩। তবে রোগী ও মুসাফীর ব্যক্তিকে এর বাইরে রাখা হয়েছে। (সূরা বাকারা: ১৮৫)। রোগ-মুক্তির পর এবং সফর হতে ফেরার পর সে অন্য কোন দিনে এ সকল রোযা পূর্ণ করবে।

• যারা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতায় আক্রান্ত এবং এ থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণ বা এরূপ দুর্বল ব্যক্তি যাদের পক্ষে পরেও রোযা রাখা সম্ভব নয়, তারা এর পরিবর্তে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী ফিদিয়া আদায় করে দিবে।

• কুরআন করীমে অসুস্থ এবং মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু রসূল (সা.) গর্ভবতী মহিলা, স্তন্যদাত্রী মাকেও অসুস্থের আওতাভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। এরূপভাবে সেই বালক-বালিকাও অসুস্থতার অন্তর্ভুক্ত যার দৈহিক বৃদ্ধি সাধিত হচ্ছে। এ অবস্থায় রোযা রাখার ফলে তার স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। এমন কমবয়সী ছেলে-মেয়েদের রোযা রাখার জন্য মা-বাবার বাধ্য করা উচিত নয়।

• দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী ছাত্র, যে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত রয়েছে, সে-ও অসুস্থ বলে গণ্য হবে। কেননা পরীক্ষার দিনগুলোতে তার মস্তিষ্কের ওপর এমন চাপ থাকে যে, অনেকে পাগল হয়ে যায়। অনেকে গুরুতর অসুস্থ পর্যন্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং এর মাঝে কি-ই-বা উপকারিতা আছে, একবার রোযা রাখবে এবং তারপর চিরদিনের জন্য রোযা

রাখা থেকে বঞ্চিত থাকবে? (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২৭৩ ও ২৯০-২৯৯)।

• রোযা অবস্থায় ক্ষুধা-পিপাসার কারণে প্রাণহানির আশঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি হলে রোযা ভঙ্গ করতে হবে।

রোযার জন্য নিয়ত আবশ্যক

যে ব্যক্তি রোযা রাখবে, তার অবশ্যই রোযা রাখার নিয়ত করা উচিত। আঁ-হযরত (সা.) বলেন, **"মান লাম ইয়াজমা'য়িস সাওমা কাবলাল ফাজরি ফালা সিয়ামা লাহু"**– অর্থাৎ, যে সকালের পূর্বে রোযা রাখার নিয়ত করবে না তার কোন রোযা নেই। (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম)। নিয়ত করার জন্য নির্ধারিত কোন বাক্য মুখ দিয়ে বলতে হবে এমন কোন আবশ্যকতা নেই। মূলত নিয়ত হচ্ছে সেই সংকল্পের নাম যে, সে কোন নিয়তে খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করছে। নফল রোযাতে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা যেতে পারে। তবে এটি শর্তসাপেক্ষ। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২৭৪)।

রোযার নিষিদ্ধ দিন

নিম্নোক্ত দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষেধ:

১) ঈদ-উল-ফিতরের দিন এবং ঈদ-উল-আযহার দিন রোযা রাখা নিষেধ। (মুসলিম)।

২) ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ আইয়ামে তাশ্‌রীকের দিনগুলোতে রোযা রাখা নিষেধ। (তিরমিযী)।

৩) সন্দেহের দিন। (তিরমিযী)।

৪) রমযানের শুভাগমনের উদ্বোধনে রোযা রাখা নিষেধ। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)।

৫) শুধুমাত্র জুমু'আর দিন রোযা রাখা নিষেধ। পূর্বে অথবা পরে একদিন যোগ করে রোযা রাখা যেতে পারে। (বুখারী)।

৬) স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা নিষেধ। (বুখারী ও মুসলিম)।

যে সকল কারণে রোযা ভঙ্গ হয়

জেনে-শুনে খাবার খাওয়া, পান করা এবং যৌন সম্পর্ক করার ফলে রোযা ভেঙ্গে যায়। টিকা লাগালে, ইচ্ছা করে বমি করলে, স্বেচ্ছায় বীর্যপাত করলে রোযা ভেঙ্গে যায়। যদি কেউ ভুল করে রমযানের রোযা ভেঙ্গে ফেলে তবে তার গুনাহ হবে না, কিন্তু কাযা আবশ্যক। রোযা রাখা অবস্থায় মহিলাদের মাসিক শুরু হলে অথবা শিশু জন্ম দেওয়ার কারণে নিফাসের রক্ত চলাকালীন সময়ে রোযা ভেঙ্গে যায়। অবশ্য পরবর্তীতে সেসব

দিনের রোযার কাযা আবশ্যক। রমযানের রাত্রে স্ত্রী-সহবাস নিষেধ নয়।

যে সকল কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

যদি কেউ ভুল করে কোন কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে তার রোযা যেমন ছিল তেমনি থাকবে– অর্থাৎ, রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা হুযূর (সা.) বলেছেন, **"যদি কেউ ভুল করে রোযা অবস্থায় কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে এতে করে তার রোযা ভঙ্গ হবে না। সে তার রোযা পূর্ণ করবে, কেননা তাকে আল্লাহ্ তা'লাই খাইয়েছেন।"** (বুখারী, কিতাবুস সাওম)।

পেটে বা গলায় অনিচ্ছাকৃত বা অসাবধানতাবশত ধোঁয়া, মশা, মাছি, ধূলা-বালি চলে গেলে কিংবা কুলির পানি অজ্ঞাতসারে গিলে ফেললে রোযা ভঙ্গ হয় না। এরূপে কানে পানি গেলে অথবা ঔষধ দিলে, কফ ফেললে, থুথু গিলে ফেললে, অনিচ্ছাকৃত বমি করলে, চোখে ঔষধ দিলে, দাঁত থেকে রক্ত বের হলে, বসন্তের টিকা লাগালে, মেসওয়াক বা ব্রাশ করলে, ঘ্রাণ নিলে, নাকে ঔষধ দিলে, মাথায় বা দাড়িতে তেল দিলে, শিশু বা স্ত্রীকে চুমু দিলে, দিনের বেলায় ঘুমানোর সময় স্বপ্নদোষ হলে, মাথায় পানি দিলে, সুগন্ধি ব্যবহার করলে, আয়না দেখলে, শরীর মর্দন করলে এবং সেহরীর সময় ফরয গোসল না করার কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রসূল করিম (সা.) গোসল না করা অবস্থায় প্রভাত হলে (ফজরের নামাযের পূর্বে) গোসল করতেন এবং রোযা রাখতেন। (বুখারী ও মুসলিম)। দিনের বেলায় মহিলারা সুরমা লাগাতে পারে। পুরুষদের দিনের বেলায় সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "দিনে সুরমা লাগানোর কি-ই-বা প্রয়োজন রয়েছে, রাতে ব্যবহার করুন।" (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২৭৭-২৭৯)।

খাদ্যবস্তু এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে একটি মূলনীতি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক এরূপে বর্ণিত হয়েছে: (ইচ্ছাকৃতভাবে) শরীরে প্রবেশ করানো হয় এরূপ প্রত্যেক বস্তুতে রোযা ভঙ্গ হয় এবং (অনিচ্ছাকৃতভাবে) শরীর হতে বের হয় এরূপ বস্তুতে রোযা নষ্ট হয় না।

ইচ্ছাকৃত রোযা ভঙ্গের কাফফারা

যদি কেউ জেনে-বুঝে খাবার খায় বা পান করে, কারো অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে রমযানের রোযা ভাঙ্গে, দিনে স্ত্রী-সহবাস বা স্বেচ্ছায় বীর্যপাত করার মাধ্যমে রোযা ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে তাকে একটি রোযার জন্য লাগাতার ৬০টি রোযা রাখতে হবে অথবা ৬০ জন মিসকীনকে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী একবেলা খাবার খাওয়াতে হবে অথবা প্রত্যেক

মিসকীনকে দুই সের গম অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য আদায় করতে হবে। কিন্তু তার যদি ৬০টি রোযা রাখা বা ৬০ জন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর সামর্থ্য না থাকে তাহলে তাকে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও দয়া এবং অনুকম্পার ভরসা করতে হবে। এমতাবস্থায় তার জন্য প্রকৃত ইস্তেগফার, অনুশোচনা করা, নিজ ভুলের স্বীকারোক্তি এবং পুনরায় এরূপ কাজ না করার দৃঢ় সংকল্পই যথেষ্ট হবে। (ফিকাহ আহমদীয়া, পৃ. ২৯৮)।

তারাবীহ্ নামায

রমযান মাসে এশার নামাযের পর তারাবীহ নামায পড়তে হয় এবং সাধ্যমত শেষ রাতে তাহাজ্জুদের নামাযও পড়তে হয়। তারাবীহ্‌র নামায সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা নামায অধ্যায়ে করা হয়েছে। সাধারণত বিতরের নামায ও আঁ রাকা'ত তারাবীহসহ সর্বমোট ১১ রাকা'ত নামায পড়তে হয়। (বুখারী, মুসলিম ও মিশকাত)। হযরত ইমাম সুয়ুতী (রহ.) লিখেছেন, ১১ রাকা'তই লোকের মিলিত মত (ইজমা)। কেউ চাইলে ২০ রাকা'ত বা এরও অধিক পড়তে পারে। (ফিকাহ্ আহমদীয়া, পৃ. ২০৮)।

ই'তিকাফ

রমযানের ২০ তারিখ ফজরের নামাযের পর থেকে শুরু করে রমযানের শেষ ১০ দিন শাওয়ালের চাঁদ দেখার পূর্ব পর্যন্ত 'ই'তিকাফ' করা সুন্নত। কুরআন মজীদে এ সম্পর্কে বর্ণনা এসেছে, **"ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ।"** (সূরা বাকারা: ১৮৮)। সহীহ্ হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, "আঁ-হযরত (সা.) রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ওফাত দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর এ রীতি অব্যাহত ছিল।"

ই'তিকাফের ফযিলত সম্পর্কে হযরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন, " যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এক দিন ই'তিকাফে বসে, আল্লাহ্ তা'লা তার ও জাহান্নামের মধ্যে এমন তিনটি পরিখা সৃষ্টি করে দিবেন যাদের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের চাইতেও অধিক দূরত্ব থাকবে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ই'তিকাফ)।

ই'তিকাফের জন্য জামে মসজিদে বসতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে, **"লা ই'তিকাফা ইল্লা ফি মাসজিদিন জামিয়িন"**– অর্থাৎ, ই'তিকাফ এমন মসজিদে করতে হবে যেখানে নিয়মিত বা-জামাত নামায হয়ে থাকে। (আবু দাউদ)। তবে একান্ত বাধ্য হলে বা আশে-পাশে জামে মসজিদ না থাকলে ঘরেও ই'তিকাফে বসা যায়। মহিলারা মসজিদ কিংবা ঘরে উভয় স্থানেই ই'তিকাফে বসতে পারে। তবে তাদের জন্য ঘরে ই'তিকাফে বসা উত্তম।

মু'তাকিফ (ই'তিকাফকারী ব্যক্তি) মসজিদের নিভৃত কোণে পর্দার অন্তরালে বসবেন, কুরআন করিম পাঠ করবেন, খোদার স্মরণে নিমগ্ন থাকবেন, বাজে কথা বলা কিংবা অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত থাকবেন। আবু দাউদ নামক হাদীস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, "ই'তিকাফের দিনগুলোতে রুগী দেখতে যাবে না, জানাযায় যাবে না, স্ত্রী সহবাস/আলিঙ্গন করবে না, শুধু জরুরী প্রয়োজনে (মসজিদের) বাইরে যাবে, রোযা রাখবে।" রুগী দেখতে যাওয়া এবং জানাযার নামাযে শরীক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ আছে। (ফিকাহ আহমদীয়া)।

ফিতরানা

ঈদ-উল-ফিতরের ফিতরানা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। জামাতের বায়তুল-মাল বিভাগ এক 'সা'– অর্থাৎ, প্রায় পৌনে তিন সের খাদ্যশস্য 'সদকাতুল ফিতর' (ফিতরানা) অথবা এর মূল্যের সমান ফিতরানা নির্ধারণ করেছেন। ঈদের দিন সূর্য উদয়ের পূর্বে ভূমিষ্ঠ শিশুর জন্যেও ফিতরানা দেয়া ওয়াজিব। ফিতরানা ঈদের নামাযের আগেই আদায় করা উচিত। কেননা গরীব রোযাদার যেন ফিতরানার অর্থ দিয়ে ঈদের খুশীতে অংশগ্রহণ করতে পারে। ফিতরানা দেয়া কারও ওপর কোন প্রকার অনুগ্রহ নয়। এটা আমাদের জন্যে ইবাদতের অঙ্গ। এমনকি যে ব্যক্তিকে ফিতরানার সাহায্য দেয়া হয়, তার নিজের পক্ষ থেকেও ফিতরানা দেয়া কর্তব্য। যে সম্পূর্ণ ফিতরানা দিতে অক্ষম সে অর্ধেক হারেও আদায় করতে পারে। সকলের অংশগ্রহণের ফলে সদকাতুল ফিতরের ফান্ডটি একটি সাধারণ ফান্ডে পরিণত হয়। সুতরাং এ থেকে যারা উপকৃত হয় তাদের মনে হীনমন্যতার ভাব সৃষ্টি হয় না।

রোযা সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

• রমযান মাসের চাঁদ দেখার পর অথবা অধিকাংশ লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাওয়ার পর অথবা শা'বান মাসের ত্রিশ দিন পার হবার পর দিন হতে রমযানের রোযা শুরু হয়ে যায়। যদি ২৯ শা'বান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার পরেও কয়েকজন লোক চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় এবং তা সঠিক বলে প্রতীয়মান হয় তাহলে পরদিন হতে রোযা শুরু করতে হবে। (মুসনাদ ইমাম আহমদ হাম্বল এবং অন্যান্য হাদীস)।

• রোযা রাখার জন্য সুবেহ সাদেকের পূর্বে সেহরী খেতে হবে (বুখারী)। কোন কিছু না খেয়ে রোযা রাখা ঠিক নয়। এটা করা অপছন্দনীয়। এমতাবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। সেহরী দেরী করে খাওয়া এবং সূর্যাস্তের সাথে-সাথেই ইফতার করাকে হযরত রসূল করিম (সা.) পছন্দ করতেন। (তিরমিযী, আবূ দাউদ)।

• যদি জানা যায়, খাওয়ার সময় প্রভাত হয়ে গিয়েছিল বা যখন ইফতার করা হয়েছিল তখনও সূর্য অস্ত যায়নি তাহলে সে রোযা হবে না, রোযা কাযা করতে হবে। (বুখারী)

• সূর্যাস্ত হওয়ার পর এ দোয়া পড়ে ইফতার করতে হবে- **"আল্লাহুম্মা ইন্নি লাকা সুমতু ওয়াবিকা আমানতু ওয়া 'আলা রিযকিকা আফতারতু।"** অর্থাৎ, "হে আল্লাহ্! নিশ্চয় তোমার জন্যই আমি রোযা রেখেছি, তোমার উপর ঈমান এনেছি এবং তোমার দেয়া রিযিক দিয়ে ইফতার করছি।" (আবু দাউদ, বাব: কাওলুল ইনাদাল ইফতার)।

• খেজুর, দুধ অথবা পানি দিয়ে ইফতার করা সুন্নত। রসূল (সা.) এ সর্ম্পকে বলেছেন, "যখন ইফতার করবে তখন খেজুর দিয়ে ইফতার কর– কেননা এতে বরকত রয়েছে। যদি এটি সহজলভ্য না হয় তাহলে পানি দিয়ে ইফতার কর– কেননা এটি অত্যন্ত পবিত্র জিনিস।" (তিরমিযী, বাব: মা ইয়াসতাহিব্বু আলাইহিল ইফতার)।

• অন্যদেরকে ইফতার করানো খুবই পুণ্যের কাজ। এ সর্ম্পকে আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, "যে রোযাদারকে ইফতার করাবে তার জন্য রোযাদারের সমপরিমাণ পুণ্য রয়েছে, কিন্তু এতে করে রোযাদারের পুণ্যে কোন কমতি হবে না।" (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম)।

• শাওয়ালের ৬টি নফল রোযা রাখাও অতি উত্তম। হাদীসে আছে,"যে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখে এবং এরপর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযাও রাখে, সে যেন সারা বছর রোযা রাখল।" (মুসলিম)। এছাড়া হযরত রসূল করিম (সা.) প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে নফল রোযা রাখতেন। যে মুসলমান যুবক দরিদ্রতাবশত বিয়ে করতে অক্ষম তার জন্য প্রয়োজনমত নফল রোযা রাখা খুবই উপকারী। এতে প্রবৃত্তি দমন হয়ে চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা হয়।

• সারা বছর রোযা রাখা উচিত নয়। (বুখারী)। সারা বছর রোযা রাখলে অন্যান্য অসুবিধা ছাড়াও রোযার যে উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হয়। কারণ তখন রোযা রাখা শরীরের পক্ষে এমনভাবে অভ্যাস হয়ে যায় যে, রোযার ফলে যে বিশেষ উত্তাপ ও দহন সৃষ্টি হওয়ার কথা, তা হতে পারে না। ফলে আত্মশুদ্ধি এবং রোযার অন্যান্য উপকারিতা লাভ করা সম্ভব হয় না।

• সহীহ্ হাদীসে আছে, যখন রমযান মাস আসে তখন বেহেশতের দরজাগুলোকে উন্মুক্ত করা হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। রোযা মু'মিনের জন্যে ঢালস্বরূপ। যে মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী কাজ ত্যাগ করে না, আল্লাহ্র কাছে তার খাদ্য বা পানীয় পরিত্যাগ করার কোন মূল্য নেই। রমযান মাসে এক মহামান্বিত রাত আছে যা হাজার মাস হতে উত্তম। যাকে এ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে সে সব ধরনের মঙ্গল হতে বঞ্চিত এবং দুর্ভাগা।

• রোযা রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ

"যার অন্তর এ কথায় আনন্দিত যে রমযান এসেছে এবং সে এ প্রতীক্ষায় ছিল রোযা এলেই রাখবে, অথচ অসুস্থতার জন্যে রোযা রাখতে পারে না– এরূপ ব্যক্তি আকাশে রোযা হতে বঞ্চিত হবে না। দুনিয়ার অনেক লোক বাহানা খুঁজে এবং ভাবে, দুনিয়ার মানুষকে আমি যেরূপ ধোঁকা দিচ্ছি সেভাবে খোদাকেও ধোঁকা দিচ্ছি। বাহানাকারী নিজের পক্ষ হতে সমস্যা বানিয়ে নেয় এবং ওজরগুলোকে শামিল করে সমস্যাগুলোকে সঠিক সাব্যস্ত করে। কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে সেগুলো সঠিক নয়। ওজর ও বাহানার দরজা খুবই বিস্তৃত। মানুষ চাইলে এ দিয়ে সারা জীবন বসে নামায পড়তে পারে এবং রোযা একেবারেই না রাখতে পারে। কিন্তু খোদা তার নিয়ত ও ভাবধারা অবগত। যার সততা ও আন্তরিকতা আছে– খোদা জানেন, তার অন্তরে মর্মবেদনা রয়েছে, খোদা তাকে প্রকৃত পুণ্য হতে অধিক দান করেন। কারণ, মর্মবেদনা মর্যাদার বিষয়। বাহানাকারী ব্যাখ্যার উপর ভরসা করে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ ভরসার কোন মূল্য নেই।"

(আল হাকাম, ১০/১২/১৯০২, পৃ. ০৯)।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে সার্বিক অর্থে সাধনার এক অপূর্ব সওগাত নিয়ে প্রতিবছর মাহে রমযান আসে। দৈহিক ও আধ্যাত্মিক তথা সার্বিক কল্যাণের জন্যে রমযানের কৃচ্ছতার মাঝে যে মহান সংকল্প ও শিক্ষা নিহিত তা পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের মাঝেই এ মাসের সার্থকতা রয়েছে। নিছক আচার-অনুষ্ঠান ও বাহ্যিকতার মাঝে বিশেষ কোন সার্থকতা নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
হজ্জ

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের অন্যতম। হজ্জের আভিধানিক অর্থ হলো সংকল্প বা ইচ্ছা করা। ইসলামী পরিভাষায় শরীয়তের যথাযথ বিধান অনুযায়ী কা'বা শরীফের যিয়ারতের (দর্শনের) উদ্দেশ্যে গিয়ে নির্ধারিত ইবাদত পালন করাকে হজ্জ বলা হয়।

পবিত্র কাবা শরীফ
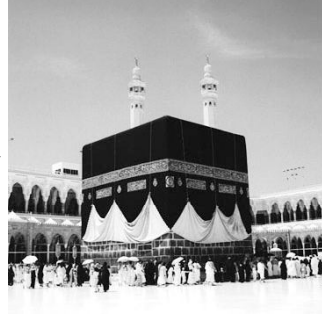
হজ্জের সময়

হজ্জ করার জন্য নির্দিষ্ট মাস নির্ধারিত রয়েছে যাকে 'আশহুরুল মা'লুমাত'– অর্থাৎ, হজ্জের মাস বলা হয়েছে। এ মাস হল তিনটি, যথা: শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ। এদেরকে আশহুরুল হজ্জ বা হজ্জের মাস এজন্যই বলা হয়, কেননা এ মাসগুলোতে হজ্জের প্রস্তুতি, চরিত্রগত সংশোধন এবং হজ্জের কার্যাবলী যথা ইহরাম বাঁধার সূচনা হয়ে যায়। আর এ হজ্জের সর্বশেষ সময়সীমা যিলহজ্জ মাসের ১৩ পর্যন্ত হয়ে থাকে। কুরআন করীমের সূরা বাকারার ১৯৮ নং আয়াতে এ সর্ম্পকে বর্ণিত হয়েছে।

হজ্জ কাদের ওপর ফরয

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "ওয়ালিল্লাহি আলান্নাসি হিজ্জুল বায়তি মানিস্তাতা-আ ইলায়হি সাবীলা"– অর্থাৎ, "কা'বা গৃহের হজ্জ সেসব লোকের উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যারা সেখানে যাবার সামর্থ্য রাখে।" (সূরা আলে ইমরান: ৯৮)। হযরত রসূলে করিম (সা.) বলেছেন, "সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করল না, সে ইহুদী না খিস্টান হয়ে মৃত্যুবরণ করল, সে বিষয়ে আমার কোন পরওয়া নেই।" (তিরমিযী)।
নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতার অধিকারীর ওপরেই হজ্জ ফরয করা হয়েছে:
(১) মুসলমান।
(২) সুস্বাস্থ্যের অধিকারী।

(৩) প্রাপ্ত-বয়স্ক বুদ্ধিমান।
(৪) সংসার পরিচালনার পর হজ্জে যাওয়ার মত আর্থিক সংগতি এবং হজ্জ থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত পরিবারের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোর ব্যবস্থা যার আছে।
(৫) রাস্তার নিরাপত্তা।
(৬) স্ত্রীলোকের জন্য মাহরাম (যাদের সঙ্গে বিবাহ অবৈধ) সঙ্গী থাকা। স্ত্রীলোকের মাহরাম সঙ্গী না নিয়ে হজ্জযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ার বিবরণ সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফের হাদীসে দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া আল্লাহ্ তা'লা সূরা বাকারার ১৯৮ নং আয়াতে হজ্জযাত্রীকে উপযুক্ত পাথেয় সঙ্গে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

হজ্জের স্থান

যে সকল স্থানে হজ্জের কার্যাবলী পালন করতে হয় বা হজ্জ সম্পাদন করতে যেতে হয় কিংবা এমন সব স্থান যা হজ্জ করার এলাকার আওতাভুক্ত তা হলো-
১) কা'বাগৃহ: পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ।
২) হাতিম: কা'বাগৃহের উত্তরপ্রাচীরের সাথে অর্ধবৃত্ত আকারে কিছু খালি স্থান। তোয়াফে এ স্থানকে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।
৩) হাজরে আসওয়াদ: যাকে তোয়াফকালে চুম্বন করতে হয়।
৪) মুলতাযাম: হাজরে আসওয়াদ এবং কা'বার দরজার মধ্যবর্তী উত্তর-প্রাচীরের অংশকে 'মুলতাযাম' বলা হয়। হাজীরা ফিরে যাওয়ার সময় কা'বার এ অংশের সাথে বুক মিলিয়ে থাকে।
৫) রুকনে ইয়ামেনী: কা'বাগৃহের দক্ষিন-পশ্চিম পার্শ্ব যেহেতু ইয়েমেনের দিকে এজন্য এই কোণাকে 'রুকনে ইয়ামেনী বলা হয়। তোয়াফের সময় এই কোণাকে স্পর্শ করা অথবা চুমু দেয়া মুস্তাহাব।
৬) মুতাফ: কা'বাগৃহের চতুর্পার্শ্বে মর্মর পাথর দিয়ে তৈরী একটি বৃত্ত। এ স্থানেই কা'বাগৃহের চারপাশে প্রদক্ষিণ করতে হয়। তোয়াফ একটি ইবাদত যা কা'বাগৃহকে সাতটি চক্কর দিয়ে শেষ করতে হয়।
৭) মাকামে ইবরাহীম: তোয়াফের সাত চক্কর দেয়ার পর দুই রাকা'ত নামায পড়া ওয়াজিব। এই দুই রাকা'ত নামায 'মাকামে ইবরাহীমে' আদায় করলে অধিক সওয়াব হয়।
৮) যমযম: মাকামে ইবরাহীমের বাম দিকে এবং কা'বা থেকে উত্তর দিকে একটি কূপ। কা'বার দিকে মুখ করে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে যমযমের পানি পান করা হয়ে থাকে।
৯) মসজিদুল হারাম: কা'বার চতুর্পার্শ্বে দীর্ঘ ও বৃত্ত আকারের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনের সুবিস্তৃত ও প্রশস্ত মসজিদ যেখানে মানুষ বৃত্তের আকারে কাতার বানিয়ে এবং কা'বাগৃহের দিকে

মুখ করে নামায পড়ে থাকে।
১০) সাফা ও মারওয়া পাহাড়: মক্কায় মসজিদে হারামের নিকটবর্তী দক্ষিণ দিকের দু'টি ছোট-ছোট পাহাড়– যেখানে হাজীরা হজ্জ ও উমরাহ করার সময় দৌড়ে থাকেন।
১১) মক্কার বাইরের স্থান:
ক) মিনা: এ স্থানে শয়তানকে পাথর মারা হয়। হাজীরা মক্কা থেকে এখানে ৮ যিলহজ্জ চলে আসেন। এ স্থানেই ঐ দিনের যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায এবং ৯ যিলহজ্জ ফজরের নামায পড়া হয়। এ ময়দানেরই একপাশে সেই মহান কুরবানীর স্থান যেখানে প্রতি বছর হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর স্মৃতির স্মরণে লক্ষ-লক্ষ পশু যবাই করা হয়ে থাকে।
খ) মুযদালিফা: আরাফাত হতে মিনায় ফিরার পথে 'মাশআরুল হারাম' পাহাড়ের পাদদেশে এ স্থানে রাত্রিযাপন এবং মাগরিব ও এশার নামায পড়তে হয়।
গ) আরাফাত: মক্কা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ৯ মাইল দূরে সেই মহান স্থান– যেখানে ৯ যিলহজ্জ হাজীরা একত্রিত হয়ে থাকেন।

হজ্জের রোকন

হজ্জের তিনটি রোকন বা ফরয (অবশ্য পালনীয়) কর্ম রয়েছে। এগুলো হলো–
১) ইহরাম অর্থাৎ, নিয়ত করা।
২) উকূফে আরাফাহ– অর্থাৎ, ৯ যিলহজ্জ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান।
৩) তোয়াফে যিয়ারত যাকে তোয়াফে ইফাযা-ও বলা হয়। অর্থাৎ, সে তোয়াফ যা আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের পর ১০ যিলহজ্জ অথবা এর পরবর্তী তারিখগুলোতে কা'বা গৃহে করা হয়ে থাকে। ৯ যিলহজ্জ যদি কোন ব্যক্তি আরাফাতের ময়দানে অল্প সময়ের জন্য হলেও অবস্থান না করতে পারে তাহলে তার হজ্জ হবে না। তাকে পুনরায় পরবর্তী বছর ইহরাম বেঁধে হজ্জ করতে হবে।

হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকার। তা হলো-
(১) হজ্জে মুফরাদ: সেই হজ্জ যাতে মিকাত (এমন স্থান যেখান থেকে মক্কায় আসার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয়) হতে শুধুমাত্র হজ্জ করার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয়। এতে উমরাহ্ করতে হয় না।
(২) হজ্জে তামাত্তো: তামাত্তো শব্দের অর্থ হল উপকৃত হওয়া। অর্থাৎ, হাজীর একই সফরে দু'টি কল্যাণ লাভ করা। প্রথমত: উমরাহ করা, দ্বিতীয়ত: হজ্জ করা। এ জন্য হাজী হজ্জের মাসগুলোতে সর্বপ্রথম শুধু উমরাহ্র জন্য ইহরাম বেঁধে উমরাহ্র পর– অর্থাৎ,

বায়তুল্লাহ্র তোয়াফ ও সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাত চক্কর দেয়ার পর মাথার চুল কর্তন করে ইহরাম খুলে ফেলবে। এরপর ৮ যিলহজ্জ বা এর পূর্বে নতুন করে হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জের অনুষ্ঠান পূর্ণ করবে। হজ্জে মুফরাদ ব্যক্তির জন্য ১০ যিলহজ্জ কুরবানী আবশ্যক নয়, কিন্তু হজ্জে তামাত্তো পালনকারী ব্যক্তির জন্য ১০ যিলহজ্জ কুরবানী করা আবশ্যক। যদি কুরবানী দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে এর পরিবর্তে ১০টি রোযা রাখবে। এর মধ্যে থেকে তিনটি হজ্জের দিনগুলোতে– অর্থাৎ, ৭, ৮, ৯ যিলহজ্জ তারিখে আর বাকী সাতটি রোযা ঘরে ফিরে আসার পর রাখতে হবে।

(৩) হজ্জে কিরান: হজ্জে কিরান এমন হজ্জকে বলা হয়, যাতে মিকাত (ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত স্থান) হতে হজ্জ এবং উমরাহ্ উভয় একসাথে আদায় করার নিয়তে ইহরাম বাঁধা হয় এবং মক্কায় পৌঁছে সর্বপ্রথম উমরাহ্ করবে তারপর ইহরাম না খুলে সে ইহরামেই হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি পালন করবে। হজ্জে কিরান সম্পাদনকারী ব্যক্তির জন্যও ১০ যিলহজ্জ কুরবানী করা আবশ্যক। অন্যথায় ওপরে বর্ণিত নিয়মনুযায়ী রোযা রাখবে।

মানাসিকে হজ্জ বা হজ্জের অনুষ্ঠানাবলী

(ক) ইহরাম, (খ) তোয়াফ বা বায়তুল্লাহ্ পরিক্রমণ, (গ) সায়ী বা সাফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাত চক্কর দেয়া, (ঘ) উকূফে আরাফাত বা আরাফাতে অবস্থান, (ঙ) মুজদালিফা ও মীনাতে অবস্থান, (চ) রমি বা কংকর নিক্ষেপ করা, (ছ) কুরবানী করা, (জ) তোয়াফে বিদা প্রভৃতি। নিচে উক্ত অনুষ্ঠানগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল:

ক) ইহরাম:
হজ্জের বিশেষ পোশাক সেলাইবিহীন দু'টি চাদর। একটি পরিধান করতে হয় এবং অপরটি শরীরে জড়িয়ে নিতে হয়। এ নির্দেশ শুধু পুরুষের বেলায় প্রযোজ্য। মহিলারা সাধারণ পোষাক পরিধান করতে পারেন, তবে মুখ আবৃত করা নিষেধ। ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা উচিত। ইহরামের জন্য দু' রাকা'ত নামায পড়ার পর নিয়ত করার বিধান আছে। মুহরিম তথা ইহরাম বাঁধা ব্যক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যথা : মাথা (শুধু পুরুষের জন্য) ও মুখ আবৃত করা, সুগন্ধি ব্যবহার, কেশ মুন্ডন, নখ কাটা, শিকার করা, কোন প্রাণী হত্যা করা, ঝগড়া-বিবাদ করা, গালমন্দ অথবা বাজে কথা বলা, বিবাহ করা বা বিবাহ পড়ান, সহবাস ইত্যাদি। ইহরাম অবস্থায় উচ্চঃস্বরে 'তালবীয়া' পাঠ করতে হয়। তালবীয়ার বাক্যগুলো এরূপ- **"লাব্বায়িকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়িকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়িক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নি'আমাতা লাকা ওয়াল মুলকা, লা শারীকা লাকা"**– অর্থাৎ, "উপস্থিত, হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত; আমি উপস্থিত, তোমার কোন শরীক নেই, আমি উপস্থিত; নিশ্চয় সব

প্রশংসা এবং অশেষ অনুগ্রহের তুমিই অধিকারী এবং তুমি আধিপত্যেরও (মালিক), তোমার কোন অংশীদার নেই।" ইহরাম, হজ্জ ও উমরাহ্‌র জন্য তালবীয়া পাঠ করা একান্ত জরুরী। হজ্জের ৩টি ফরযের মধ্যে এটিও অন্যতম।

খ) তোয়াফঃ

দোয়া সহকারে পবিত্র কা'বা গৃহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করাকে 'তোয়াফ' বলে। প্রথম তিন চক্করে দ্রুত পদক্ষেপ সহকারে এবং কাঁধ দুলিয়ে প্রদক্ষিণ করাকে 'রমল' বলে। প্রথম তোয়াফকে 'তোয়াফে কুদুম' বলা হয়। তোয়াফের ক্ষেত্রে হাতিম (কা'বার পরিত্যক্ত স্থান)-ও কা'বাগৃহের অন্তর্গত। কা'বাগৃহের যে কোণে 'হাজরে আসওয়াদ' (কালো পাথর) অবস্থিত সেই কোণ হতে তোয়াফ শুরু করতে হয়। প্রতি চক্কর শেষে কালো পাথরকে চুম্বন করতে হয়। চুম্বন করা সম্ভব না হলে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেও চলবে। উল্লেখ্য, হযরত উমর (রা.) একদিন তোয়াফকালে চুম্বন করতে গিয়ে বলেছিলেন, "হে পাথর! আমি জানি তোর ভাল-মন্দ করার কোনই ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার প্রিয় নবীকে চুম্বন করতে দেখেছি বলে আমিও তোকে চুম্বন করলাম।" (বুখারী ও মুসলিম)। হাজরে আসওয়াদের পূর্ব কোণকে 'রুকনে ইয়ামনী' বলে। সেই কোণকেও স্পর্শ বা চুম্বন করা যায়। সাত তোয়াফের পর মাকামে ইবরাহীমে দু রাকা'ত নামায পড়ার বিধান আছে। ১০ যিলহজ্জ মীনাতে কুরবানী করার পর ১০, ১১ বা ১২ তারিখের মধ্যে বায়তুল্লাহ্‌র তোয়াফ করা হজ্জের অন্যতম ফরয। এ তোয়াফকে "তোয়াফে যিয়ারত" বলে।

গ) সায়ীঃ

সাফা পাহাড় হতে শুরু করে মারওয়া পাহাড় পর্যন্ত সাতবার চক্কর দিয়ে আসাকে 'সায়ী' বলে। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি স্থানে হযরত বিবি হাজেরার স্মৃতি স্মরণার্থে তাঁর অনুকরণে দৌড় দিতে হয়। হজ্জ এবং উমরাহ্‌কারীদের জন্য এটিও একটি অনুষ্ঠান। সায়ীর পর যমযমের পানি পান করা সুন্নত।

ঘ) উকূফে আরাফাতঃ

৯ যিলহজ্জ সূর্য ঢলে পড়ার পর হতে সূর্যাস্তের পর পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করাকে 'উকূফ' বলে। সেদিন যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়া এবং দোয়া ও ইস্তেগফারের মাঝে সময় অতিবাহিত করতে হয়। এটি হজ্জের একটি প্রধান ফরয। রসূলে করিম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ৯ যিলহজ্জ দিনে অথবা রাত্রে যে কোন এক মুহূর্তে আরাফাতে অবস্থান করেছে তার হজ্জ সম্পূর্ণ হয়েছে।" আরাফাতে অবস্থানও হজ্জের অন্যতম প্রধান ফরয।

ঙ) মুজদালিফা ও মীনাতে অবস্থানঃ

৮ যিলহজ্জ হতে ৯ যিলহজ্জ আরাফাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মীনাতে অবস্থান করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া সুন্নত। আবার ১০ যিলহজ্জ হতে ১২ অথবা ১৩ যিলহজ্জ পর্যন্ত মীনায় থাকতে হয়। আরাফাত হতে মীনায় ফেরার পথে 'মাশআরুল হারাম' পাহাড়ের পাদদেশে মুজদালিফা নামক স্থানে রাত্রিযাপন ও সেখানে মাগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়ার বিধান আছে।

চ) রমি করা বা কংকর নিক্ষেপঃ

জামারাতুল আকাবা, উলা ও উসতাতে পাথর নিক্ষেপকে 'রমি' বলে। ১০ যিলহজ্জ দ্বিপ্রহরের পূর্বে শুধু আকা'বাতে এবং ১১ ও ১২ তারিখে (সম্ভব হলে ১৩ তারিখেও) সূর্য ঢলে পড়ার পর যথাক্রমে উলা, উসতা ও আকা'বাতে সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। সাধারণত একে রূপকভাবে শয়তানের উপর পাথর নিক্ষেপ করা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ছ) কুরবানী করাঃ

কিরান ও তামাত্তো হাজীদেরকে প্রথম দিন 'রমি' (প্রস্তর নিক্ষেপ) করার পর ১২ তারিখের মধ্যে মীনায় কুরবানী করতে হয়। কুরবানীর পর মস্তক মুন্ডন করার রীতি আছে। যারা কুরবানী করার সামর্থ্য রাখে না তারা দশটি রোযা রাখবে। (সূরা বাকারা : ১৯৭)।

জ) তোয়াফে বিদাঃ

বিদেশী হাজীদেরকে মক্কা ত্যাগের পূর্বে শেষ বারের মত কা'বা শরীফের 'তোয়াফ' করতে হয়। তাই বিদায় কালের তোয়াফকে 'তোয়াফে বিদা' বলা হয়।

হেরেমের সীমা

মক্কা শরীফ হতে কোন দিকে তিন মাইল, কোন দিকে সাত মাইল এবং জেদ্দার দিক হতে দশ মাইলের মধ্যবর্তী স্থানকে হেরেমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ নির্ধারিত সীমার মধ্যে শিকার করা, কোন প্রাণীকে বিতাড়িত করা এবং ঘাস বা বৃক্ষ কর্তন করা নিষিদ্ধ। তবে প্রয়োজনবোধে হিংস্র ও ক্ষতিকর প্রাণী বধ করার অনুমতি আছে।

মিকাত

এটি হলো হেরেমের সীমানায় ইহরাম বাঁধার নির্ধারিত কতগুলো স্থান। ভারত, বাংলাদেশ ও পূর্বাঞ্চলের লোকদের জন্য 'ইয়ালমলাম পাহাড়'-কে 'মিকাত' নির্ধারণ করা হয়েছে। যারা মিকাতের সীমানার মাঝে বসবাস করে তারা নিজ-নিজ গৃহ থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

হজ্জ ও উমরাহ্

৮ যিলহজ্জ হতে ১৩ যিলহজ্জ সময়ের মাঝে অনুষ্ঠিত শরীয়ত নির্ধারিত কর্মকে হজ্জ বলে। বছরের অন্যান্য দিনে ইহরামের সাথে 'তোয়াফ' ও 'সায়ী' করাকে 'উমরাহ্' বলে। ফরয নামাযের সাথে যেরূপ সুন্নত ও নফল নামায পড়ার রীতি আছে, তদ্রূপ হজ্জের আগে ও পরে সুন্নত এবং নফল উমরাহ্ করা হয়। হজ্জে ভুল-ক্রটির জন্য ফিদিয়া, সদকা, কুরবানী ও রোযার ব্যবস্থা রয়েছে। (বিস্তারিত অবগতির জন্য সূরা বাকারার ২৪ নং রুকু ও সূরা মায়েদার ১৩ রুকু দ্রষ্টব্য)।

কা'বা শরীফ ও হজ্জের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কোন-কোন বর্ণনা অনুযায়ী কা'বা শরীফের প্রথম বা মূল প্রতিষ্ঠাতা হলেন হযরত আদম (আ.)। (তফসীর ইবনে কাসীর)। পবিত্র কুরআনের মতে, এটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম ইবাদতগৃহ। বলা হয়েছে:

"ইন্না আউয়ালা বাইতিউঁ উযিয়া লিন্নাসি লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবারাকাওঁ ওয়া হুদাল্লিল আলামিন"– অর্থাৎ, "নিশ্চয় সর্বপ্রথম মানব জাতির জন্য যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তা হল বাক্কাতে, তা সমগ্র বিশ্বের জন্য আশিসপূর্ণ ও হেদায়েতের কারণ।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭)। যবুর কিতাবেও এর উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। (Psalms 84: 4-6)। উল্লেখ্য, বাক্কা সেই উপত্যকার প্রাচীন নাম যেখানে বর্তমান মক্কা নগরী অবস্থিত। আজ হতে প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে খোদাপ্রেমিক ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে আপন প্রিয়তমা স্ত্রী হযরত হাজেরা এবং স্নেহের পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে বর্তমান মক্কা শহর যেখানে অবস্থিত সেখানে রেখে যান। সে যুগে উক্ত স্থান সম্পূর্ণ জনমানবহীন ছিল। জীবনধারণের কোন উপকরণ সেখানে ছিল না। হযরত ইবরাহীম (আ.) সামান্য কিছু খাদ্য এবং পানীয়ের ব্যবস্থা করতো আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে স্বীয় স্ত্রী-পুত্রকে রেখে নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে কয়েক দিনে যখন খাদ্য ও পানীয় নিঃশেষ হয়ে গেল তখন ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর পুত্র ইসমাঈলকে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অসহায় জননী হাজেরা পানির সন্ধানে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে ইতস্তত ছুটোছুটি করতে থাকেন। সব চেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, তখন আল্লাহ্ তা'লা মরুভূমির তলদেশ হতে এক সুস্বাদু পানীয় জলের ফোয়ারা নির্গত করেন। প্রাচীন গ্রন্থেও এর বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। (আদিপুস্তক, ২১:২৯)।

এ ফোয়ারা পরবর্তীকালে 'যমযম কূপ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীকালে এ কূপকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে ওঠে এবং পবিত্র মক্কা নগরীর ভিত্তি স্থাপিত হয়। আল্লাহ্র

নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) পুনরায় স্ত্রী-পুত্রের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য মক্কায় আগমন করেন। আল্লাহ্ তাঁকে স্বপ্নযোগে একমাত্র প্রিয় পুত্রকে কুরবানী করার নির্দেশ প্রদান করেন। তৎকালীন যুগে সমাজে নরবলির প্রচলন থাকায় হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী পুত্র ইসমাঈলকে জবাই করতে উদ্যত হন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যাদেশ বাণী দিয়ে ইসমাঈলের পরিবর্তে পশু কুরবানী করার আদেশ দিয়ে ইসমাঈলকে আল্লাহ্র বাণী প্রচারের জন্য উৎসর্গ করার হুকুম প্রদান করেন। এজন্যই হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পুণ্য-স্মৃতির স্মরণে প্রতি বছর পশু কুরবানীর প্রচলন হয়েছে। হযরত আদম (আ.) কর্তৃক নির্মিত ইবাদতগৃহটি তখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই আল্লাহ্ সেই গৃহকে পুনর্নির্মাণের জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে নির্দেশ প্রদান করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর সহযোগে কা'বা গৃহকে নতুন করে গড়ে তোলেন। নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ্ তা'লা হজ্জের ঘোষণা করার আদেশ প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "ওয়া আয্যিন ফিন্নাসি বিল হাজ্জ"– অর্থাৎ, "হে ইবরাহীম! তুমি সকল মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর।" (সূরা হাজ্জ : ২৮)।

ছাদবিহীন কা'বা গৃহটি ৯ হাত উঁচু, ২৩ হাত দীর্ঘ এবং ২২ হাত প্রস্থবিশিষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে কা'বা গৃহের আরও বহুবার সংস্কার করা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে কোরাইশরা যখন কা'বাগৃহের সংস্কার করে তখন পাথরের অভাবে মূল গৃহটিকে বাধ্য হয়ে কিছুটা ছোট করতে হয়। সেই পরিত্যক্ত অংশের নাম 'হাতিম'। তোয়াফের হিসাব রক্ষার সুবিধার্থে গৃহের এক কোণে কালো রঙের একটি পাথর স্থাপন করা হয়। এ পাথরই 'হাজরে আস্ওয়াদ' নামে পরিচিত। বাইবেলেও এ পাথরের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, যথা- "তা পরীক্ষাসিদ্ধ প্রস্তর, বহুমূল্যবান কোণের প্রস্তর, অতি দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত।" (যিশাইয়, ১৮:১৬)।

পবিত্র কা'বা, হজ্জ এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ঘটনা পবিত্র কুরআনের সূরা মায়েদার ১৩ তম রুকু, সূরা বাকারার ১৫, ২৪ ও ২৫ তম রুকু, সূরা হাজ্জের ৪র্থ রুকু, সূরা আস্ সাফ্ফাতের ৪র্থ রুকু, সূরা ইবরাহীমের ৬ষ্ঠ রুকু, সূরা আনকাবূতের ৭ম রুকুতে বর্ণিত হয়েছে। তৎসঙ্গে বাইবেলের আদিপুস্তকের ২, ১২, ১৬, ১৭, ১৮ অধ্যায় এবং যিশাইয়ের ৪৫: ১৩-১৪ পদেও বর্ণিত হয়েছে।

হজ্জের উদ্দেশ্য ও শিক্ষা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাঁর বিখ্যাত "তফসীরে কবীর"-এ সূরা হজ্জের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন নিম্নে এর অংশ-বিশেষের ভাবার্থ প্রদান করা হলো:

"আল্লাহ তা'লা বলেছেন, আমি ইবরাহীমকে এ-ও বলে দিয়েছিলাম, এ আদেশ শুধু

তোমার জন্যই নয়, বরং সমস্ত মানবজাতির জন্য। মানুষ দূর-দূরান্ত হতে আগমন করবে আর এভাবে সারা দুনিয়ায় একটি মাত্র ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথকে সুগম করবে। লোকেরা কুরবানী করার পর গোসল করে নিজেদের দেহের মলিনতা দূর করার সাথে-সাথে তাদের অন্তরকে পরিষ্কার করবে এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে যে ওয়াদা করেছিল তা পূর্ণ করবে আর সেই সাথে এ পুরাতন গৃহের তোয়াফ করবে। এতে যেন কেউ এ কথা না বুঝেন, এ প্রাণহীন বস্তুকে খোদার তুল্য সম্মান প্রদান করা হয়েছে। তোয়াফ একটি প্রাচীন পদ্ধতি– যা কুরবানীর প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হতো। কোন লোক অসুস্থ হলে তার চারদিকে তোয়াফ করা হতো। এর উদ্দেশ্য ছিল রোগগ্রস্ত ব্যক্তির পরিবর্তে তোয়াফকারী নিজের জীবন কুরবানী করতে চায়। আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যুগে-যুগে এমন সব লোকের উদ্ভব হবে যারা এ গৃহের সম্মান এবং আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতকে কায়েম রাখার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করবে। অন্যথায় বাহ্যিকভাবে এ তোয়াফের কোন মূল্য নেই।

সূরা হজ্জের বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের অন্যতম প্রধান ইবাদত হজ্জের উল্লেখ করে বলেছেন, প্রতি বছর লক্ষ-লক্ষ লোক বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন জাতি, অসংখ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং নানা ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় একত্র হয়ে এ সত্যেরই সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে যে, তাদের মাঝে বর্ণ, গোত্র ও ভাষার শত-শত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ইসলামের তৌহীদমন্ত্র তাদেরকে একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছে। সমবেত মুসলিমরা তাদের কর্ম দিয়ে এটিও প্রমাণ করে, এ কা'বা গৃহের হেফাযতের জন্য তারা সদা প্রস্তুত এবং কোন শক্তিই কা'বার বিনাশ ও মুসলমানদের একতাকে নষ্ট করতে সক্ষম নয়। সমবেত মুসলিম জনতা পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে ইসলাম প্রচার লাভ করেছে দেখেই আনন্দিত হয় না, বরং এক অনাবাদ ও অনুর্বর অঞ্চল হতে একদিন যে ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল– সেই ধ্বনির ডাকে সাড়া দিয়ে লক্ষ-লক্ষ লোকের একত্রিত হবার দৃশ্য দেখেও নিজেদের ঈমানকে তাজা করে।

যেখানে রসূল করিম (সা.)-এর জন্ম ও কর্মভূমি ছিল, যেখানে একসময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বাক্য উচ্চারণ করার অনুমতি ছিল না, আজ সেখানে লক্ষ কণ্ঠে **"আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল্ হামদ' এবং 'লাব্বায়িকা আল্লাহুম্মা লাব্বায়িক, লাব্বায়িকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়য়িক'** বজ্রনিনাদে ধ্বনিত হচ্ছে। প্রতি বছর অগণিত লোক সমবেত হয়ে জীবন্ত ধর্ম ইসলাম এবং রসূল করিম (সা.)-এর সত্যতা প্রমাণ করছে। হজ্জের প্রকৃত আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য হলো, সব ধরনের সম্পর্ককে ছিন্ন ও চূর্ণ করে একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করা। তাই এ উদ্দেশ্যকে বাস্তবে সার্থক করে তোলার জন্য সামর্থ্যবান লোকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন পার্থিব সব কিছুকে পরিত্যাগ করে মক্কা মুকার্‌রমায় উপস্থিত হয় এবং এভাবে জন্মভূমি, প্রিয় পরিবার-পরিজন ও

সহায়-সম্পদকে কুরবানী করার শিক্ষা গ্রহণ করে। পার্থিব বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিজেকে সমর্পিত করাই হজ্জের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাই যদি কেউ স্বপ্নে হজ্জ করতে দেখে তা হলে এর তা'বির (ব্যাখ্যা) হলো, উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া। আর মানবজন্মের একমাত্র উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। তাই হজ্জ মানবজন্মের উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করতে সাহায্য করে। হজ্জ সম্পন্ন করতে গিয়ে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা পালনের মধ্য দিয়ে প্রত্যেক হাজী প্রায় চার হাজার বছর পূর্বের হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত হাজেরার অতুলনীয় ঐশী প্রেম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার অপূর্ব দৃশ্যকে স্বচক্ষে দর্শন করে নিজেদেরকে তদ্রূপ গড়ে তোলার প্রেরণা লাভ করে। আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিঃশেষে সবকিছু দান করলে এতে ক্ষয় হয় না, জয় ও অমরত্ব লাভ করা যায়– হজ্জ এ শিক্ষাকে জ্বলন্ত ও জীবন্ত করে তুলে ধরে।

হজ্জের আরও একটি প্রধান শিক্ষা হলো, মুসলমানদের অন্তরে কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসা সৃষ্টি করা। ইসলামের মূল কেন্দ্রে একত্র হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত মু'মিন ভাইয়েরা একে অপরের সমস্যাকে উপলব্ধি করার এবং তার সাথে-সাথে একে অপরের সৌন্দর্যকে দর্শন করে নিজেদের জীবনকে উৎকৃষ্ট আদর্শে রূপায়িত করে বিশ্ব শান্তির পথকে সুগম করার সুযোগ লাভ করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতীকসূমহ

যেসব বস্তু বা স্থানের সাথে হজ্জ পালনকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে সেগুলোকে কুরআন করিমে 'শা'আয়িরুল্লাহ্'– অর্থাৎ, 'আল্লাহ্‌র নিদর্শন' বা প্রতীকরূপে আখ্যা দেয়া হয়েছে। (সূরা বাকারা: ১৫৯, সূরা মায়েদা: ৩, সূরা হাজ্জ: ২৩)।

বস্তুতপক্ষে এগুলোকে আল্লাহ্ তা'লা কতগুলো অন্তর্নিহিত বিষয়ের প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন যার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

(ক) কা'বা বা বায়তুল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র ঘর) উপাসনার সুপ্রাচীন এবং সর্বপ্রথম গৃহ। এ গৃহের চারদিকে হজ্জ যাত্রীরা দোয়া পড়তে-পড়তে তোয়াফ বা প্রদক্ষিণ করেন। ঘোষণা করেন আল্লাহ্‌র একত্ব ও মহত্ত্বের কথা। সমস্ত মানবজাতির একত্বের শিক্ষাও এ তোয়াফের মাঝে নিহিত আছে।

(খ) সাফা ও মারওয়ার মাঝে দৌড়ানোর মাধ্যমে হাজীরা স্মরণ করেন হযরত ইসমাঈল (আ.) এবং হযরত হাজেরার করুণ অবস্থার কথা। তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা জনমানবহীন অঞ্চলে নির্বাসিত, নিঃসহায় বান্দাকে সাহায্য করেছিলেন।

(গ) 'মিনা' শব্দটি 'উমনীয়া' শব্দ হতে এসেছে। এর অর্থ হল, কোন উদ্দেশ্য বা কোন অভিপ্রায়। মীনাতে যাওয়ার উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ লাভের ইচ্ছা পোষণ করা। মীনা হতে মুজদালিফায় গমন করতে হয়।

(ঘ) 'মুজদালিফা' শব্দটির অর্থ হলো নৈকট্য। এর দ্বারা হাজী হৃদয়ঙ্গম করেন, যে উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন তা নিকটতর বা আসন্ন। মুজদালিফার আরেকটি নাম হলো, 'মাশ'আরুল হারাম' বা পবিত্র প্রতীক। এটা ইঙ্গিত করছে, আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হবার এক পরম লগ্ন উপস্থিত হয়েছে। মুজদালিফার পর আরাফাতে যেতে হয়।

ঙ) 'আরাফাত' কথাটির মূল অর্থ চিনতে পারা বা জানতে পারা। আরাফাতের অবস্থান হজ্জযাত্রীকে হাশরের ময়দানের সেই অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যখন সে নিশ্চিতভাবে খোদাকে জানতে পারে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে।

(চ) বিশ্ববাসীর এ মহামিলনের জন্য যে স্থানকে আল্লাহ্ তা'লা নির্বাচিত করেছেন, তা কোন শস্য- শ্যামল, সুশোভিত স্থান নয়, বরং তা কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এক অনুর্বর, শুষ্ক ভূমি। (সূরা কাহাফ: ৩৮)। সেখানে রয়েছে শুধু বিস্তীর্ণ বালুকারাশি, কঙ্কর এবং ভঙ্গুর শিলাময় ভূমি। এরূপ একটি স্থান এজন্য নির্বাচিত করা হয়েছে যেন এতে আমরা বুঝতে পারি, এ স্থানে সাধারণ কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আকর্ষণ নেই। সেখানে যদি কেউ যায় তবে তার যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে খোদা, একমাত্র খোদারই নৈকট্য লাভ। এজন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, জেনে রেখো, তোমাদেরকে এ স্থানে একত্র করা হয়েছে তাঁর সাথে মিলিত হবার জন্য (কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে নয়)। (সূরা বাকারা : ২০৪)

(ছ) 'ইহরাম' দ্বারা কিয়ামতের দৃশ্যের কথা মনে করানো হয়। মৃত ব্যক্তির ন্যায় হজ্জযাত্রী সেলাইবিহীন দু'টি চাদর দিয়ে নিজ দেহ আবৃত করেন। এ অবস্থা আরাফাতে অবস্থানকালে হজ্জযাত্রীদের কিয়ামত দিবসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যেন মৃত অবস্থা হতে শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃত হয়ে মানবমন্ডলী তাদের রবের (প্রভু-প্রতিপালকের) সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।

(জ) মীনাতে অবস্থানকালে তিনটি স্তম্ভে (জামারাতুল উলা বা দুনিয়া, উস্তা এবং আকাবা) তিন বার প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে হজ্জযাত্রী মানব জীবনের তিনটি স্তর সম্বন্ধে স্মরণ করে। এগুলো হলো– (১) পার্থিব বা দুনিয়ার জীবন যা 'জামারাতুদ দুনিয়া' বা নিকটস্থ স্তম্ভ দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, (২) কবরের স্তর বা মধ্যবর্তী স্তম্ভ (ইহজীবন এবং পরজীবনের মাঝে বিদ্যমান) যা 'জামারাতুল উস্তা' বা মধ্যবর্তী স্তম্ভ বলে অভিহিত এবং (৩) পরকালের জীবন (যা আকাবা বলে পরিচিত) যা 'জামারাত আল-আকাবা' দিয়ে চিহ্নিত হয়েছে। এ সব স্তম্ভে প্রস্তর নিক্ষেপ শয়তানকে প্রস্তরাঘাত করার প্রতীক মনে করা হয়। ফলে মানুষের মন হতে সব কুপ্ররোচনা এবং কুচিন্তা বিতাড়িত হয়। কেননা আল্লাহ্‌র উপস্থিতি শয়তানকে বিতাড়িত করে।

(ঝ) পশু কুরবানীর মাধ্যমে হজ্জযাত্রীগণ স্মরণ করেন হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীর কথা, তাঁদের অতুলনীয় ত্যাগ এবং তিতিক্ষার কথা। রূপকভাবে এর মাঝে এ শিক্ষা নিহিত রয়েছে, মানুষ যেন শুধু নিজেকে কুরবানী করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত না রাখে, উপরন্তু তাকে তার ধন-সম্পদ এমন কি

সন্তান-সন্ততিকেও আল্লাহ্‌র পথে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

(ঞ) কা'বার চতুর্দিকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা, সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাতবার দৌড়ানো ইত্যাদির মাঝে 'সাত' সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ। আরবী ভাষায় 'সাত' পূর্ণতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (আল আকরাব, আল্ মাওয়ারিদ প্রভৃতি আরবি অভিধান দ্রষ্টব্য)। বিশেষ করে হজ্জের সময় এবং জীবনের অন্যান্য বিষয়েও হজ্জযাত্রীকে 'পূর্ণতার' দিকে দৃষ্টি দিতে হবে– অর্থাৎ,, কোন প্রকার অসমাপ্ত বা অপূর্ণ কাজে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না।

সংক্ষেপে বলা যায়, হজ্জের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনের মাঝে যেসব জিনিস ব্যবহার করা হয় বা যেসব কাজ করা হয় সেগুলো প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রতীকগুলোতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।" [তফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, সূরা বাকারার ২০৪ নং আয়াত। প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা)]।

পরিশিষ্ট

সূরা বাকারার ২০৪ নং আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে হজ্জের তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সারমর্ম 'তফসীরে কবীরে' বর্ণিত হয়েছে, "হজ্জ একটি মহান আধ্যাত্মিক বিধান। কুরআনের শিক্ষা অনুসারে মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম উপাসনালয় বা ইবাদত গৃহ হলো কা'বা। (সূরা আলে ইমরান : ৯৭)। হযরত আদম (আ.) এটি নির্মাণ করেছিলেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) এ কা'বা পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। কুরআন করীম একে 'সুপ্রাচীন গৃহ' বলে অভিহিত করেছে। (সূরা হাজ্জ: ৩০ ও ৩৪ নং আয়াত)। ইহুদী শাস্ত্রের এক বর্ণনায় আছে,"আব্রাহাম সেই উপাসনালয় পুনর্নির্মাণ করেছিলেন– যা আদম কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এরপর তা নূহের মহাপ্লাবনে বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং নূহ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়েছিল এবং পরে ভাঙ্গনের যুগে (Age of Divisions) বিধ্বস্ত হয়েছিল।

[The Targums of Onkelos and Jona: Han Ben Uzziel. Translated by: T.W. Ethebrige, Page : 226]

এ বর্ণনার সাথে একমাত্র কা'বারই সামঞ্জস্য রয়েছে। কারণ এত প্রাচীনকালের এরূপ আর কোন উপাসনালয় নেই। এটি আল্লাহ্‌র একান্ত অভিপ্রায় যে, এ কেন্দ্রস্থলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মানুষ একত্রিত হয়ে মানবজাতির একত্ব এবং বিশ্বনিয়ন্তা খোদা তা'লার সাথে সকল মানুষের নিগূঢ় সম্পর্কের বিষয়ে অবহিত হবে। বিভিন্ন জাতিতে বিরাজমান কৃত্রিম পার্থক্যগুলোকে ভুলে মানবতাবোধের ঐক্য-বন্ধনে আকৃষ্ট হবার জন্য হজ্জের এ

অনুষ্ঠান তথা মহামিলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থান ও বিভিন্ন জাতির লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে একত্র হয়ে একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে এবং কল্যাণমূলক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এ সুযোগকে হজ্জযাত্রীর জন্য আরও বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে শুধু মক্কার চার দেয়ালের মাঝেই তাকে থাকতে বলা হয়নি, অধিকন্তু মীনা, মুজদালিফা, আরাফাত এবং পুনরায় মীনায় অবস্থান করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

[তফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, সূরা বাকারার ২০৪ নং আয়াত। প্রণেতাঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা)]।

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া

হযরত সুফী আহমদ জান লুধিয়ানীর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ হতে বায়তুল্লাহ্ শরীফে এ দোয়া পাঠ করানো হয়। দোয়াটির বঙ্গানুবাদ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো–

"হে করুণাময় আল্লাহ! তোমার অধম, অযোগ্য ও গুনাহগার দাস গোলাম আহমদ, যে তোমারই দেশ ভারতে বাস করে। তার এ বিনীত নিবেদন, হে রাহমানুর রাহীম! তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও এবং আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং পাপ ক্ষমা করো, কেননা তুমি গাফুরুর রাহীম। আমায় দিয়ে এমন কাজ সম্পূর্ণ করাও যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আমার আর আমার নফসের (নফসে আম্মারার) মাঝে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব সৃষ্টি করো। আমার জীবন, আমার মরণ এবং আমার যাবতীয় শক্তি তোমার রাস্তায় নিয়োজিত করো। তোমার প্রেমের মাঝে আমাকে জীবিত রাখো এবং তাতেই মৃত্যু দান করো। তোমার প্রিয় লোকদের মধ্যে হতে আমাকে উত্থিত করো। হে আরহামুর রাহেমীন! যে কাজের প্রচারের জন্য তুমি আমাকে আদিষ্ট করেছ এবং যে সেবার জন্য তুমি আমার অন্তরে প্রেরণা সৃষ্টি করেছ, একে তোমারই অনুগ্রহে পূর্ণতা দান করো। এ অধমের হাতে বিরুদ্ধবাদী এবং ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞ লোকদের হুজ্জত পূর্ণ করো। এ অধম এবং তার প্রিয় ও একান্ত বাধ্য অনুসারীদের ক্ষমা করো এবং তাদেরকে অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রয় দাও এবং তাদেরকে সাহায্য দান করো। আমার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণের উপর অশেষ দুরূদ, সালাম ও কল্যাণ অবতীর্ণ করো। আমীন, সুম্মা আমীন।"

(দৈনিক আল্ ফযলঃ ১১ অক্টোবর ১৯৪২ ইং)।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যাকাত

যাকাতের অর্থ হল মাল বা সম্পদের বৃদ্ধি হওয়া এবং সম্পদকে পবিত্র করা। এটি ইসলামের তৃতীয় রোকন বা স্তম্ভ। এটি এরূপ সদকা বা দান– যা ধনী ব্যক্তির কাছ থেকে নিয়ে গরীব এবং অভাবীকে দেয়া হয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন-

وَمَآ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ زَكٰوةٍ تُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُضۡعِفُوۡنَ

(ওয়ামা আতায়তুম মিন্ যাকাতিন্ তুরীদূনা ওয়াজ্হাল্লাহি ফাউলাইকা হুমুল মুয'য়িফুন)

অর্থ: "আর আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যাকাত হিসেবে যা দাও সেক্ষেত্রে এরাই সেইসব লোক, যারা (যাকাতের মাধ্যমে নিজেদের ধন-সম্পদ) বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে।" (সূরা রূম : ৪০)।

যাকাত শব্দের অর্থ

যাকাত শব্দের নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার অর্থ হয়:

ক) কোন জিনিসের বৃদ্ধি পাওয়া এবং আশিসপূর্ণ হওয়া।
খ) খারাপ অবস্থা হতে উত্তম অবস্থায় উন্নীত হওয়া।
গ) স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা।
ঘ) 'তাহারাত' লাভ করা বা পবিত্র হওয়া।
ঙ) প্রশংসার যোগ্য হওয়া।
চ) উচ্চ পর্যায়ের বস্তু।
ছ) সম্পদের যাকাত দেয়া যাতে সেই সম্পদ পবিত্র হয়।
জ) কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সদকাকে যাকাত বলা হয়, কেননা এটি দেয়ার ফলে মাল বরকতপূর্ণ হয়, বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষয়-ক্ষতি ও বিপদ হতে মুক্ত হয়।
(তফসীরে কবীর, সূরা বাকারার ৪৪ নং আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে গরীবদের দেয়ার নাম যাকাত। এতে উত্তম পর্যায়ের সহানুভূতির শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এভাবে মুসলমানরা সামাজিক বিপদাবলী মোকাবেলা করতে সক্ষম হতে পারে।"

এটি আদায় করা ধনীর উপর ফরয। ফরয না হলেও মানবীয় সহানুভূতির অনুপ্রেরণায় গরীবদের সাহায্য করা উচিত। কিন্তু আজকাল আমি দেখি, প্রতিবেশী যদি অভুক্ত থেকে মৃত্যুমুখী হয়, তবুও ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। অথচ অধিকাংশ লোক নিজ আরাম-আয়েশের

দিকে খেয়াল রাখে। খোদা তা'লা আমার হৃদয়ে যে কথাটি উদ্রেক করেছেন আমি তা বর্ণনা না করে থাকতে পারি না। মানুষের মাঝে সহানুভূতি একটি উচ্চাঙ্গের শক্তি বা গুণ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لَنۡ تَنَالُوا الۡبِرَّ حَتّٰى تُنۡفِقُوۡا مِمَّا تُحِبُّوۡنَ

(লান্ তানালুল বির্‌রা হাত্তা তুনফিকু মিম্মা তুহিব্বুন)

অর্থ: "তোমরা কখনও প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না– যে পর্যন্ত তোমরা যা ভালোবাস তা থেকে খরচ না কর।" (সূরা আলে ইমরান : ৯৩)।

"অনেক লোক আছে যারা বাসী এবং নষ্ট রুটি ও তরকারি– যা কোন কাজে আসে না, সেগুলো গরীবকে দেয় এবং মনে করে আমরা পুণ্যের কাজ করে ফেলেছি। এরূপ ধারণা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।" (মাজমুয়া ফাতওয়া আহমদীয়া, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬০)।

যাকাতের নির্দেশ

কুরআন করীমে বহু জায়গায় যাকাতের স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো, সব মানুষের ধন-সম্পদ কোন না কোন লোকের সাহায্য নিয়েই উপার্জিত হয়। এ উপার্জনে অনেক সময় অন্যের হক বা অধিকার শামিল হয়ে থাকে। মজুরী হিসেবে অন্যদের হক মিটিয়ে দেয়ার পরও ধনীর সম্পদে অন্যদের কিছু অধিকার বাকী থেকে যায়। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ সকল মানুষের জন্য, কোন ব্যক্তি বিশেষের জন্য নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَ لَـكُمۡ مَّا فِى الۡاَرۡضِ جَمِيۡعًا

(হুয়াল্লাযী খালাক্বা লাকুম মা ফীল আরযি জামী'আন)

অর্থ: "তিনিই [আল্লাহ্ যিনি] পৃথিবীতে যা-ই আছে সবই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা বাকারা: ৩০)।

সুতরাং শ্রমিক যখন সম্পদ সৃষ্টি করে তখন মজুরী পাওয়ার পরও সেই সম্পদে শুধু তাদেরই নয়, অন্যান্য মানুষেরও কিছু না কিছু অধিকার থাকে। এ অধিকার পূর্ণ করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অভাবী লোকদের মাঝে তা বিতরণের জন্য যাকাতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন-কোন যাকাত এ জন্য দিতে হয় যে, এগুলো সার্কুলেশন বা আবর্তনে না থাকার ফলে সমাজ পূর্ণ উপকারিতা হতে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া যাকাতের নির্দেশ এ জন্য দেয়া হয়েছে, অনেক সময় কোন-কোন লোক গরীবদের প্রতি নানা কারণে দৃষ্টি দিতে পারে না বা দেয় না। সেজন্য যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের বাঁচার ন্যূনতম অধিকারকে বিধিবদ্ধভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং "বায়তুল মাল" (খিলাফতের অধীন

কোষাগার) হতে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে। কারণ, গরীব লোকদেরও আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে রক্ষা করার জন্যই শরীয়ত ধনীর কাছ থেকে যাকাত, সদকা প্রভৃতির আকারে তাদের অধিকার আদায় করার ব্যবস্থা করেছে। অবশ্য যাকাত গরীবদের উপর কোনো অনুগ্রহ নয়, বরং এটি দানকারীর নিজস্ব মঙ্গলের জন্য এবং তার মাল পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করার জন্য দেয়া অত্যাবশ্যক। এজন্য কুরআন করীমে বারবার এসেছে-

يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

(ইউকিমুনাস্ সালাতা ওয়া ইউতুনায্ যাকাতা)

অর্থ: "তারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়।"

আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেছেন, "মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজে বাধা দেয় এবং তারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এরাই এমন যাদের ওপর আল্লাহ্ অবশ্যই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এমন বাগানসমূহের– যাদের পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে, সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে।" (সূরা তাওবা: ৭১-৭২)।

আল্লাহ্র পথে খরচ করলে ধন-সম্পদ হ্রাস পায় না, বরং বৃদ্ধি পায়। কারণ আল্লাহ্ তা'লা রিযক বা উপজীবিকা (Provisions) বাড়িয়ে দেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী অন্যদের কমিয়ে দেন। তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۭ وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

(কুল ইন্না রাব্বী ইয়াব্সুতুর রিয্কা লিমাইঁয়্যাশাউ মিন্ ই'বাদিহী ওয়া ইয়াকদিরু লাহু ওয়ামা আন্ফাক্তুম মিন শায়য়িন ফাহুয়া ইউখলিফুহু ওয়া হুয়া খায়রুর্ রাযিকীন)

অর্থ: "তুমি বল, 'নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক স্বীয় বান্দাদের মধ্য হতে যার জন্য চান রিয্ক (এর ক্ষেত্র) সম্প্রসারিত করে দেন এবং যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। এবং তোমরা যা কিছু খরচ করবে তিনি অবশ্যই এর প্রতিদান দিবেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই সর্বোত্তম রিয্ক দানকারী'।" (সূরা সাবা : ৪০)।

আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেছেন-

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۭ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

(মাসালুল্লাযীনা ইউনফিকুনা আমওয়ালাহুম ফী সাবীলিল্লাহি কামাসালি হাব্বাতিন্ আম্বাতাত্ সাব'আ সানাবিলা ফী কুল্লি সুমবুলাতিম্ মিআতু হাব্বাতিন, ওয়াল্লাহু ইউযা'য়িফু লিমাইঁয়্যাশাউ ওয়াল্লাহু ওয়াসি'উন আলীম)

অর্থ: "যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করে, তাদের দৃষ্টান্ত এক শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশ' শষ্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যার জন্য চান (এর চেয়েও) বৃদ্ধি করে দেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, সর্বজ্ঞ।" (সূরা বাকারা : ২৬২)।

এছাড়া আল্লাহ্র পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করলে মানুষ কুরবানীর মাধ্যমে এমন একটা আনন্দ অনুভব করে যাতে তার আত্মা সতেজ হয়, ঈমান বাড়ে এবং মজবুত হয়। (সূরা বাকারা : ২৬২)।

যাকাত প্রদানের বরকত সম্বন্ধে সহীহ্ বুখারী এবং অন্যান্য হাদীসে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে এসেছে, "যখনই কেউ হযরত রসূল করিম (সা.)-এর কাছে যাকাত নিয়ে উপস্থিত হতেন তখনই তিনি তার নাম ধরে এ প্রার্থনা করতেন,"হে আল্লাহ! এ ব্যক্তি এবং তার বংশধরের ওপর তোমার নেয়ামত নাযিল কর।" সেই ব্যক্তির জন্য কত অপূর্ব এ নেয়ামত যে আল্লাহ্র প্রিয়তম বান্দা রসূল করিম (সা.)-এর এ দোয়ায় নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে।

যাকাত কার ওপর ফরয

প্রত্যেক সুস্থ, বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক ধনসম্পদের অধিকারী লোক, যার কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা, রূপা, টাকা অথবা ব্যবসার পুঁজি এবং সামগ্রী, গৃহপালিত পশু পুরো **১** বছর জমা রয়েছে তার জন্য যাকাত দেয়া ফরয। যাকাত হালালভাবে উপার্জিত সম্পদের উপর দেয়া আবশ্যক এবং প্রতি বছর দিতে হয়। ঋণী ব্যক্তির জন্য যাকাত ফরয নয়।

যাকাতের উপকারিতা

যাকাত এজন্য দিতে হয়, যেন আল্লাহ্র সাথে প্রকৃত ভালোবাসা এবং সত্যিকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। যাকাতে কৃপণতার অভ্যাস দূর হয় এবং জাতির গরীবদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হয়। যাকাত ধন-সম্পত্তির প্রতি ভালোবাসা ও আসক্তি হতে রক্ষা করে এবং ধর্মকে দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেয়ার শক্তি দান করে। আল্লাহ্ তা'লা বিত্তশালী ব্যক্তিদের সম্পর্কে রসূল করিম (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছেন:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۭ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۭ

(খুয মিন আমওয়ালিহিম্ সাদাকাতান তুতাহ্হিরুহুম ওয়া তুযাক্কীহিম ওয়া সাল্লি

আলায়হিম ইন্না সালাতাকা সাকানুল লাহুম)
অর্থ: “তাদের ধন-সম্পদ হতে তুমি সদকা (যাকাত) গ্রহণ করো, যেন এ দিয়ে তুমি তাদেরকে পবিত্র করতে পার এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করতে পার ও তাদের জন্য দোয়া কর। নিশ্চয় তোমার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তির কারণ হবে।” (সূরা তওবা : ১০৩)।
সুতরাং যাকাত দেয়ার ফলে একদিকে নিজের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হবে, স্বীয় ধন-সম্পদ পবিত্র হবে, অন্যদিকে রসূল (সা.)-এর দোয়ারও অংশীদার হবে। কত সৌভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে হুযূর (সা.)-এর দোয়ার অংশীদার হয়!

যাকাত দিলে ধন-সম্পদ কমে না

কোন-কোন দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি মনে করেন, যাকাত দিলে ধন-সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় থাকে। কিন্তু আল্লাহ্ই সব উপজীবিকা বা রিযকের মালিক। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন:

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ
وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٦٩﴾

(আশ্শায়ত্বানু ইয়াইদুকুমুল্ ফাক্বরা ওয়া ইয়ামুরুকুম বিল্ফাহ্শায়ি ওয়াল্লাহু ইয়ায়িদুকুম মাগফিরাতাম্ মিন্হু ওয়া ফায্লান্ ওয়াল্লাহু ওয়াসি'উন আলীম)
অর্থ: “শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং সে তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজ পক্ষ হতে তোমাদেরকে ক্ষমা এবং আশিসের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্তুত আল্লাহ্ প্রাচুর্য দানকারী (ও) সর্বজ্ঞ।” (সূরা বাকারা : ২৬৯)।
এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা শয়তানী প্ররোচনা হতে মানুষকে সতর্ক করেছেন। শয়তানী প্ররোচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানুষ যখন আল্লাহ্র পথে খরচ করার জন্য দারিদ্রের ভয় করে, তখন দারিদ্র এবং অশ্লীলতা (সমাজের গরীবদের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি না দেয়ার জন্য) প্রবলভাবে সমাজ দেহকে জর্জরিত করে ফেলে। তখন ধনী-দরিদ্র সবারই পক্ষে জীবন ধারণ করা অসহনীয় হয়ে পড়ে। দারিদ্র এবং সামাজিক কদাচার সকলকেই প্রভাবিত করে। এ অবস্থা সৃষ্টি হবার পূর্বেই সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আল্লাহ্র পথে খরচ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

যাকাতের শর্ত বা যাকাত কখন দিতে হবে

যার কাছে পুরো এক বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা থাকে অথবা ব্যবসায় টাকা নিয়োজিত থাকে, তাকে এর উপর চল্লিশ ভাগের একভাগ (১/৪০) যাকাত দিতে হবে।

পুরো এক বছর সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সেই রূপার মূল্যের পরিমাণ বা সেই মূল্যের বেশি স্বর্ণ থাকলে এর (মূল্যের) চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। এভাবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা এর বেশি রূপা থাকলে এর পরিমাণের চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। যেসব অলংকার মাঝে-মাঝে ব্যবহার করা হয় আর তা যদি উল্লেখিত নিসাব বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী থেকে থাকে তাহলে এর ওপরও উল্লেখিত হিসেবে যাকাত দিতে হবে। উল্লেখ্য, সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের পরিমাণের চেয়ে কম মূল্যের ব্যবহার্য গহনার ওপর যাকাত দিতে হবে না।
চল্লিশটি বকরী থাকলে একটি বকরী, পাঁচটি উটের জন্য একটি বকরী, ত্রিশটি গাভী বা মহিষের জন্য একটি বাছুর যাকাত হিসেবে দিতে হবে। যে জমিতে কূয়া অথবা খাল হতে পানি সেচ করা হয় এর উৎপন্ন দ্রব্য হতে বিশভাগের একভাগ এবং যে জমিতে পানি সেচ করতে হয় না এর উৎপন্ন দ্রব্যের দশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে। উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যাপারে যাকাত তখনই দিতে হবে যদি উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ আনুমানিক ২১ মণ হয়।
যাকাত প্রতি বছর আদায় করার মেয়াদ সেই সময় হতে নির্ধারণ করতে হবে যে সময় হতে তার কাছে অর্থ-সম্পদ অথবা অলংকার মজুদ থাকে। কেউ নিজের টাকা অন্যকে ঋণস্বরূপ দিলে সেই টাকার ওপর যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু উক্ত টাকা ফেরত পাওয়ার পর যাকাত দিতে হবে।
অলংকার ও গহনার যাকাত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, “ যে গহনা সব সময় ব্যবহার করা হয় এর যাকাত দিতে হবে না। এরূপ গহনা যা গচ্ছিত থাকে, কিন্তু কখনও-কখনও পরিধান করা হয় এবং কখনও-কখনও গরীব স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করতে দেয়া হয় এর সম্পর্কে কারও কারও ফতোয়া হলো, এগুলোর যাকাত দিতে হবে না। যে গহনা মাঝে মাঝে পরিধান করা হয়, কিন্তু অন্যদের ব্যবহার করতে দেয়া হয় না এর যাকাত দেয়াই উত্তম। কেননা, এ শুধু নিজের জন্যই ব্যবহৃত হয়। এভাবে আমার গৃহে আমল করা হয় এবং প্রত্যেক বছরের শেষে যাকাত দেয়া হয়। যে গহনা টাকার ন্যায় সঞ্চিত রাখা হয়, এর উপর যাকাত দেয়া সর্ম্পকে কোন মতবিরোধ নেই।” (মাজমুয়া ফাতাওয়া আহমদীয়া, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৮)।

বিভিন্ন সম্পদের ওপর প্রদত্ত যাকাতের হিসাব

বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর যাকাতের পরিমাণ (নিসাব) আলাদা-আলাদা হিসাব করতে হবে– অর্থাৎ, স্বর্ণের উপর প্রদত্ত যাকাতের হিসেবের সময় শুধু স্বর্ণের পরিমাণের কথাই ভাবতে হবে। অনুরূপভাবে ছাগল এবং গাভীর উপর প্রদত্ত যাকাতের হিসাবের জন্য আলাদা আলাদাভাবে যাকাতের হিসাব করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তির নিকট যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকে এবং তিন তোলা স্বর্ণ থাকে এবং এর মূল্য সাড়ে বায়ান্ন

তোলা রূপার মূল্য অপেক্ষা কম হয় তাহলে শুধু রূপার উপর (রূপার মূল্যের চল্লিশ ভাগের একভাগ) যাকাত দিতে হবে, তিন তোলা স্বর্ণের ওপর যাকাত দিতে হবে না। আবার কারো কাছে যদি পাঁচটি উট এবং পাঁচটি গাভী থাকে শুধু উটের জন্যই যাকাত হবে। মোটকথা, যাকাতের বিষয়গুলো পৃথকভাবে নিম্নতর পরিমাণ বা সংখ্যা (হিসাব) অতিক্রম করলে যাকাত দিতে হবে।

নিম্নে ছকের সাহায্যে বিভিন্ন সম্পদের ওপর প্রদত্ত যাকাতের হিসাব তুলে ধরা হল।

মাল বা সম্পদ	**এক বছরকাল সংরক্ষিত নিম্নতর পরিমাণ (নিসাব) হিসেবে মাল যার জন্য যাকাত দিতে হবে।**	**যাকাতের পরিমাণ**
১। রূপা	সাড়ে বায়ান্ন তোলা বা এর বেশি (পরিমাণ) থাকলে।	চল্লিশ ভাগের একভাগ (১/৪০) বা সমপরিমাণ অর্থ
২। সোনা	সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের সমান সোনা থাকলে বা এর বেশি (পরিমাণ) থাকলে।	ঐ
৩। সোনার গহনা	সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের সমান (নিয়মিত ব্যবহার্য গহনা ব্যতীত) সোনা থাকলে বা এর বেশি পরিমাণ থাকলে।	ঐ
৪। রূপার গহনা	সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের সমান (নিয়মিত ব্যবহার্য গহনা ব্যতীত) রূপা থাকলে বা এর বেশি থাকলে।	ঐ
৫। নগদ টাকা	সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের টাকা (নোট ও মুদ্রা) থাকলে বা এর বেশি (পরিমাণ) থাকলে।	ঐ
৬। কারবারে, ব্যবসায় নিয়োজিত মূলধন	কোন বছরের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যত টাকা ব্যবসায় লাগানো হয় তখন হতে বছরের শেষ পর্যন্ত মোট বাৎসরিক মূলধনের হিসাব বের করে যাকাত দিতে হবে। * (উদাহরণ দ্রষ্টব্য)	ঐ

৭। জমির উৎপন্ন দ্রব্য	ক) যে জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য পানি সেচ করা হয়, এর ২১ মণ ৫ সের শস্যের উপর বা তদুর্দ্ধ পরিমাণের উপর।	বিশ ভাগের এক ভাগ
	খ) যে জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য পানি সেচ করা হয় না, এর ২১ মণ ৫ সের শস্যের উপর বা তদুর্দ্ধ পরিমাণের উপর।	দশ ভাগের এক ভাগ
মাল বা সম্পদ	এক বছরকাল সংরক্ষিত নিম্নতর পরিমাণ (নিসাব) হিসেবে মাল–যার জন্য যাকাত দিতে হবে।	যাকাতের পরিমাণ
	গ) কৃষকের কাছে যখন কোন জমি ইজারা থাকে তখন তাকে এর উৎপাদিত শস্যের যাকাত (ক) বা (খ) শর্ত অনুসারে (যে শর্ত প্রযোজ্য) দিতে হয়।	১/২০ বা ১/১০ ভাগ
	ঘ) যখন কোন জমি বর্গা থাকে তখন তার উৎপাদিত শস্যের যাকাত জমির মালিক এবং বর্গাদার সব উৎপাদনের উপর মিলিতভাবে (ক) বা (খ) শর্তানুসারে দিবে (যাকাত দেয়ার পর ফসল বন্টন করবে)	১/২০ বা ১/১০ ভাগ
৮। গৃহপালিত পশু	গৃহপালিত পশু ৪০টি বকরীর জন্য একটি বকরী, ৫টি উটের জন্য একটি বকরী, ৩০টি গাভী বা মহিষের জন্য ১টি বাছুর যাকাত দিতে হবে।	

* উদাহরণ: যদি কোন ব্যক্তি তার ব্যবসায় প্রথম মাসে ২৫০.০০ টাকা, দুই মাস পর ২০.০০ টাকা এবং চার মাস পরে ৫০০.০০ টাকা বিনিয়োগ করে তাহলে বৎসরান্তে তাকে নিম্নলিখিত হিসেব অনুযায়ী গড় ৬০০.০০ টাকার ওপর চল্লিশ ভাগের একভাগ– অর্থাৎ, ১৫.০০ টাকা যাকাত দিতে হবে।

২৫০.০০ X ১২মাস = ৩০০০.০০ টাকা

২০.০০ X ১০মাস = ২০০.০০ টাকা

৫০০.০০ X ০৮মাস = ৪০০০.০০ টাকা

মোট = ৭২০০.০০ টাকা

মূলধন বা পুঁজির গড় = ৭২০০/১২ = ৬০০ টাকা।

যাকাতের পরিমাণ = ৬০০.০০ X (১/৪০) = ১৫.০০ টাকা

অতএব ৬০০.০০ টাকার প্রদত্ত যাকাতের পরিমাণ = ১৫.০০ টাকা

যাদের মাঝে যাকাত বিতরণ করা যায়

কুরআন করীমে এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তা হলো:

"সদকা কেবল অভাবী, অসহায়, এবং (সদকার কাজে নিয়োজিত) কর্মচারীদের প্রাপ্য। আর (এ সদকার অর্থ তাদেরও প্রাপ্য) যাদের অন্তরকে ধর্মের প্রতি অনুরাগী করা প্রয়োজন। আর দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের (ঋণমুক্তির জন্য) এবং আল্লাহ্‌র পথে সাধারণ ব্যয় নির্বাহের ও মুসাফিরদের জন্যও (এ সদকার অর্থ খরচ করা যাবে)। এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিধান। আর আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাবান।" (সূরা তওবা : ৬০)।

অতএব কুরআন করীমের শিক্ষানুযায়ী নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের মাঝে যাকাত বিতরণ করতে হবে:

১) ফকীর তথা এমন লোক– যারা দারিদ্র অথবা অসুস্থতার কারণে আর্থিকভাবে ভেঙ্গে পড়েছে।

২) মিসকীন তথা এমন লোক যাদের কাজ করার সামর্থ্য আছে, কিন্তু কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপায় বা উপকরণ নেই।

৩) যেসব ব্যক্তি যাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত অথবা যাকাতের হিসাব রাখে অথবা অন্য কোনভাবে যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত থাকে।

৪) এমন নও-মুসলিম যারা গৃহ হতে বিতাড়িত এবং যাদের অর্থাভাব রয়েছে।

৫) যুদ্ধবন্দী, দাস অথবা অন্যলোক– যাদেরকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তিলাভের সুযোগ দেয়া হয়।

৬) যেসব ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম অথবা এমন ব্যক্তি যার ব্যবসায়-বাণিজ্যে অস্বাভাবিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৭) কোন মহান কাজের জন্য।

৮) যে লোক সফরে অর্থাভাবে আটকা পড়ে গিয়েছে অথবা যারা জ্ঞান লাভের জন্য সফর করছে অথবা যারা সামাজিক কল্যাণ সাধনের জন্য সফর করছে।

বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির জন্য এবং এমন লোক– যার কাছে এক দিনেরও আহার নেই তাকে

অবশ্যই যাকাত দিতে হবে। ইমাম বা খলীফার তত্ত্বাবধানে যাকাত সংগ্রহ এবং বিতরণ করতে হবে। কেউ ব্যক্তিগতভাবে যাকাত বিতরণ করতে পারবে না। তবে যাকে সে দান করতে চায় তার দরখাস্ত খলীফার কাছে প্রেরণ করা যাবে।

যাকাত সম্পর্কিত অন্যান্য নিয়মাবলী

• নাবালক বা পাগলের সম্পদের যাকাতের জন্য অভিভাবক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

• বছরের প্রথমে কোন সম্পদের নিসাব (ন্যূনতম পরিমাণ) পূর্ণ না হয়ে যদি শেষের দিকে পূর্ণ হয় তবে শেষের মালের ওপর যাকাত দিতে হবে।

• বছরের মাঝে কোন সময়ে মাল সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে গেলে এবং দ্বিতীয়বার পুনরায় সেই মাল তৈরি হলে বা হস্তগত হলে যখন হতে দ্বিতীয়বার মাল এসেছে, তখন থেকেই বছর ধরা হবে।

• বছরের মাঝে কোন সময়ে মাল চুরি বা লুণ্ঠিত বা দখলচ্যুত হলে এবং কোন কারণে সেই মাল পুনরায় ফেরত পাওয়া গেলে বছরের শেষে তারও যাকাত দিতে হবে।

• কোন ব্যক্তি বছরের মাঝে কোন মাল অন্য ব্যক্তির সাথে বিনিময় করলে উভয় ব্যক্তির যাকাতের তারিখ মালের বিনিময়ের দিন হতে শুরু হবে।

• চান্দ্র মাসের হিসেবে বছর গণনা করতে হবে। সেই মাস হতে বছর শুরু হয়ে যায় যখন হতে কোন নিসাব পরিমাণ মাল অধিকারে আসে এবং ১২ চান্দ্র মাস অতিবাহিত হয়।

যেসব ক্ষেত্রে যাকাত দিতে হবে না

১) ঋণস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ।

২) অন্যের কাছ থেকে যে অর্থ এখনও পাওয়া যায়নি (যেমন: কোন দোকানদার তার ক্রেতার কাছে বাকীতে মাল বিক্রয় করলে)

৩) বন্ধক রাখা জিনিস।

৪) সরকারের নিকট আমানত হিসেবে প্রদত্ত টাকা।

৫) বন্ধকের বিনিময়ে দেয়া টাকা।

৬) কারখানা বা ব্যবসায় প্রদত্ত জামানত।

৭) প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত অর্থ।

৮) অপহৃত বা হারানো মাল বা টাকা।

৯) যে বাড়িতে বসবাস করা হয় তা যদি কোটি টাকারও অধিক হয় তার ওপর যাকাত নেই। তবে বাড়ি যদি ভাড়া দিয়ে থাকে তাহলে আয়কৃত অর্থের ওপর যাকাত দিতে হবে।

১০) যে অলংকার দৈনন্দিন পরিধান করা হয় এর উপর যাকাত দিতে হবে না, তা যত বেশি পরিমাণই হোক না কেন।

ঋণী ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয নয় কিন্তু ঋণ যদি অল্প হয় এবং তার কাছে এমন সব মাল থাকে যার ওপর যাকাত দেয়া জরুরী, তাহলে তাকে নিসাব অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। অনেকে মনে করেন, কোন মালের ওপর যাকাত দেয়ার সময় উপস্থিত হলে আগামী বছরের খরচ পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা বা মাল বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশের ওপর যাকাত দিলেই চলে– এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। সব সম্পদ বা মালের ওপর যাকাত দিতে হবে। যে মাল যাকাত বা সদকা হিসেবে কাউকে দেয়া হয় তা পুনরায় কিনে ফেরত নেয়া উচিত নয়।

যে দেশে সরকার অধিকাংশ যাকাতযোগ্য লোকদের আয় এবং সম্পদের ওপর ট্যাক্স আদায় করে, সেখানে যদিও 'যাকাত' শব্দ ব্যবহার করা হয় না, তবুও তাদের মাঝে অধিকাংশ ট্যাক্সই যাকাতের স্থলাভিষিক্ত। যেমন-জমির খাজনা, আয়কর ইত্যাদি। সুতরাং যে মালের ওপর সরকার ট্যাক্স আদায় করে সেগুলোর ওপর যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু যে মালের ওপর ট্যাক্স দিতে হয় না, অথবা যেসব মালের ওপর সরকারী ট্যাক্স যাকাতের নির্ধারিত হার হতে কম, সে অবস্থায় যাকাতের সর্বমোট অংক হতে ট্যাক্স বাবদ প্রদত্ত টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা যাকাতস্বরূপ আদায় করা উচিত।

যাকাতের তত্ত্বকথা

কুরআন করীমে অর্থ ব্যয়ের কয়েক প্রকারের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ–

১) যাকাত: এটা ফরয বা আবশ্যিক প্রদত্ত।

২) সদকা: এটা নফল। এর পরিমাণ মানুষের অভ্যন্তরীণ তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্ণয় করার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দু' প্রকার ব্যক্তি সদকা পাওয়ার যোগ্য : (ক) যারা নিজেদের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করে সাহায্য চায় এবং (খ) যারা নিজেদের প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করে না অথবা যারা প্রকাশ করতে অক্ষম।

৩) সেসব খরচ যা জাতি বা ধর্মের সমষ্টিগত প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করা হয়।

৪) শোকরানা

৫) ফিদিয়া

৬) কাফ্‌ফারা

৭) সহযোগিতামূলক খরচ–যা নাগরিক জীবনের প্রয়োজনের জন্য জরুরী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

৮) হাক্কুল খিদমত বা পারিশ্রমিক।

৯) আদায়ে ইহসান বা উপকারের বিনিময়।

১০) তোহ্‌ফা বা উপহার।

এ দশ প্রকার খরচের কথা কুরআন শরীফ হতে সাব্যস্ত হয়। কেউ এ খরচগুলোর

(যেখানেই এর সুযোগ ঘটে) কোন একটিকে বাদ দিলে নিম্নোক্ত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী সে আমল হতে বঞ্চিত হয়।

وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

(ওয়া মিম্মা রাযাক্‌নাহুম ইউন্‌ফিকুন)

অর্থ: "আর আমরা তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে।"

এর ফলে তাকওয়ায় দুর্বলতা সৃষ্টি হয়। দুনিয়াতে অনেক লোক এ শ্রেণীবিভাগকে বিবেচনা না করার ফলে উত্তম পুণ্য বা সওয়াব হতে বঞ্চিত থাকে। (তফসীরে কবীর, সূরা বাকারার ৪ নং আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)।

দু' প্রকারের যাকাত

কোন-কোন মালের ওপর প্রদেয় যাকাত সরকারের কাছে জমা দিতে হবে এবং কোন-কোন মালের যাকাত গরীবদের মাঝে বন্টন করতে হবে এর বিবরণ হচ্ছে- ১) জমির ফসলের যাকাত, ব্যবসায় বা কারবারে নিয়োজিত টাকার যাকাত, খনিজ দ্রব্যের ওপর প্রদেয় যাকাত (খুমুস) এবং গৃহপালিত পশুর ওপর প্রদেয় যাকাত-এই চার প্রকার যাকাত রাষ্ট্রের কোষাগারে জমা দিতে হবে যাতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অসহায়, দুঃস্থ ও মিসকীনদের প্রতিপালন এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য খরচ করতে পারে।

২) যেসব মাল বা সম্পদ রাষ্ট্রের পক্ষ হতে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যেমন: গহনা ও অলংকার এবং মজুদকৃত অর্থ- এ বিষয়গুলোর যাকাত দেয়া ব্যক্তি-বিশেষের নিজস্ব দায়িত্ব। এসব বিষয়ের যাকাত ইমাম বা খলীফার তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত এবং বন্টন হতে হবে। কাউকে যাকাতের অর্থ দেয়ার যোগ্য মনে করলে তার দরখাস্ত ইমামের সমীপে দেয়া যেতে পারে। খিলাফতের নেযামের মাধ্যমে যাকাত দেয়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে যাকাত গ্রহীতাদের আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। যাকাতদাতার সরাসরি বিতরণে এটা সম্ভব হতো না। দানের হাত ওপরে থাকে আর গ্রহণের হাত নিচে। ফলে দাতার সামনে গ্রহীতা স্বাভাবিকভাবে সবসময় মাথা নীচু করে চলবে। বিশেষ করে ভবিষ্যতে আবার পাওয়ার আশায়। এতে তার ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু নেযামের মাধ্যমে যাকাত বন্টনে এ ত্রুটি ঘটে না। কারণ গ্রহীতা এটা আল্লাহ্ তা'লার ব্যবস্থায় অধিকার হিসেবে লাভ করেন।

চাঁদা ও যাকাত

জামাতী চাঁদা ও যাকাত সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। যাকাত নির্দিষ্ট পরিমাণ হলেই বিত্তশালীর উপর তা দেয়া আবশ্যক। জামাতী চাঁদা জামাতের ব্যয় নির্বাহ ও প্রয়োজনীয় কাজে খরচ

হয়। যদি জামাতী সিলসিলা বা সংগঠনের প্রয়োজন হয় তাহলে চাঁদা নিবে অথবা নিবে না। তাই দু'টি বিষয়কে কখনও এক মনে করা উচিত নয়।

কোন মুসলমানের জন্য মাল (ধন-সম্পদ) কুরবানী শুধু যাকাতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আল্লাহ্ তা'লা আরও অনেক অধিকার পূরণ করতে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেছেন, "তৃতীয় বিষয় হলো (যাকাত ও সদকার পর) জামাতের চাঁদা– যা ধর্মের জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয়। এ জিহাদ তলোয়ারের জিহাদ হোক বা কলম ও কিতাবের মাধ্যমেই হোক, সেটাও প্রয়োজনীয়। কেননা যাকাত এবং সদকা গরীবদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এ দিয়ে বই-পুস্তক ছাপানো সম্ভব নয় বা মুবাল্লিগদেরও দেয়া যায় না।" (মালায়কাতুল্লাহ্, পৃ. ৬২)।

আজকাল তলোয়ারের বা অস্ত্রের জিহাদ নেই। সুতরাং ইসলাম প্রচারের জন্য অথবা জামাতের নেযামের মজবুতির জন্য এবং এ ধরনের অন্যান্য খরচাদির জন্য যে টাকা সংগৃহীত হয় তা-ই চাঁদার অন্তর্ভুক্ত।

جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

(জাহিদু বিআম্ওয়ালিকুম ওয়া আন্ফুসিকুম)

অর্থ: "তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর।" (তওবা : ৪১)।

এ আয়াতের প্রথম অংশের ওপর আমল করা যায় চাঁদা দিয়ে, আর দ্বিতীয় অংশের ওপর আমল করা যায় কোন-কোন সময় নিজের কাজ স্থগিত রেখে কিছু সময় তবলীগের জন্য দিয়ে অথবা ধর্মের উন্নতির জন্য তা'লীম ও তরবিয়তের কাজে অংশ নিয়ে।

সূরা বাকারার চতুর্থ আয়াতও এ কথার সমর্থন করে। অর্থাৎ, ইসলাম প্রচারের জন্য অর্থ, সম্পদ, সময় এবং জ্ঞানের দ্বারা সেবা করতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "লাযেমী (অবশ্য-দেয়) চাঁদা এবং হিস্যায়ে আমদ্ (ওসীয়্যতকারীদের আয়ের অংশ-বিশেষ) যাকাত হতে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। বস্তুত যাকাত একটি আলাদা ফরয কাজ। সব রকম চাঁদা দিলেও যাকাত দেয়া অবশ্য-কর্তব্য। যাকাতের নিয়্যত করে চাঁদা দিলেও যাকাত আলাদাভাবে দিতে হবে।" (মাসায়েলে যাকাত, পৃ. ১০)।

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

যাকাত ফরয হওয়ার পরও যেসব ব্যক্তি যাকাত আদায় করে না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۙ﴿۳۴﴾ يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ ؕ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ ﴿۳۵﴾

(ওয়াল্লাযীনা ইয়াক্নিযুনায্ যাহাবা ওয়াল্ ফিয্যাতা ওয়ালা ইয়ুনফিকুনাহা ফী সাবীলিল্লাহ, ফাবাশ্শির্হুম বি'আযাবিন্ 'আলীম। ইয়াওমা ইউহ্মা আলায়হা ফী নারি জাহান্নামা ফাতুক্ওয়া বিহা জিবাহুহুম ওয়া জুনুবুহুম্ ওয়া যুহূরুহুম হাযা মা কানায্তুম লিআনফুসিকুম ফাযূকু মা কুন্তুম্ তাকনিযুন্)

অর্থ: "এবং যারা সোনা ও রূপা মজুদ করে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে না তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দাও। যেদিন এগুলোকে (এসব সোনা-রূপাকে) জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং এগুলো দিয়ে তাদের কপালে, তাদের পার্শ্বদেশে, এবং তাদের পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে। (তখন তাদেরকে বলা হবে) এটি সেই সম্পদ– যা তোমরা নিজেদের জন্য মজুদ করতে। সুতরাং তোমরা যা মজুদ করতে (এখন) এর স্বাদ গ্রহণ কর।" (সূরা তাওবা : ৩৪-৩৫)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত: হযরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন,"যে ধনী ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ হতে যাকাত আদায় করে না, তার ধন-সম্পদকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং উত্তপ্ত শলাকা দ্বারা তাদের কপালে এবং মুখ-মন্ডলে দাগ দেয়া হবে এবং এ শাস্তির মেয়াদ পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে।"

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে আরও বর্ণিত হয়েছে, "হযরত রসূল করিম (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'লা ধন-সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে এর যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন তার সেই ধন-সম্পদ এক ভয়ংকর সাপের আকারে দৃষ্ট– হবে, উক্ত সাপ কিয়ামতের দিন তার গলায় জড়িয়ে থাকবে এবং চোয়াল দংশন করতে-করতে বলবে- আমি তোমার সেই ধন-সম্পদ যার যাকাত তুমি দাওনি"। (বুখারী ও মিশকাত)।

অন্য হাদীসে আছে, একদা দু'জন স্ত্রীলোক হযরত রসূল করিম (সা.)-এর সাথে দেখা করতে আসে। তাদের হাতে দু'টি করে সোনার বালা ছিল। আঁ-হযরত (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি এ সম্পদের যাকাত দাও? তারা বলল, না। এ কথা শুনে আঁ-হযরত (সা.) বললেন, তোমরা কি পছন্দ কর কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে আগুনের বালা পরিধান করান? তারা বলল- কখনও না। আঁ-হযরত (সা.) বললেন, তাহলে তোমরা এ গহনার যাকাত আদায় কর। (মিশকাত, তিরমিযী)

যাকাত ও সুদের তুলনা

যাকাতের মাধ্যমে ইসলাম গরীবদের অবস্থা ভাল করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সেই সাথে তাদের আত্মমর্যাদা ও সম্মানকে রক্ষা করেছে। কিন্তু সুদ ব্যবস্থা শুধু যে গরীবদের আর্থিক অবস্থাকে অবহেলা করেছে তা-ই নয়, আসলে এ ব্যবস্থার ফলে গরীবরা আরও গরীব হয় এবং ধনীর ধন আরও বৃদ্ধি পায়। মানব সমাজে ধনী-দরিদ্রের মাঝে যে বিরাট বৈষম্য রয়েছে এর ফলে সমাজের বৃহত্তম অংশ দারিদ্রের কবলে নিস্পেষিত এবং মুষ্টিমেয় ধনী শ্রেণী অপরিমিত সম্পদের প্রাচুর্যে নিমগ্ন রয়েছে, এ সবের মূলে রয়েছে সুদব্যবস্থা। সেজন্য কুরআন করিমে যাকাতের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সুদ গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:

وَمَآ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ رِّبًا لِّيَرۡبُوَا۟ فِىۡۤ اَمۡوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرۡبُوۡا عِنۡدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيۡتُمۡ مِّنۡ زَكٰوةٍ تُرِيۡدُوۡنَ وَجۡهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُضۡعِفُوۡنَ

(ওয়ামা আতায়তুম্ মির্ রিবাল্ লি ইয়ারবুওয়া ফী আমওয়ালিন্নাসি ফালা ইয়ারবু ইন্দাল্লাহি। ওয়ামা আতায়্তুম্ মিন্ যাকাতিন্ তুরীদুনা ওয়াজহাল্লাহি ফাউলায়িকা হুমুল মুযয়িফুন)

অর্থ: "এবং তোমরা যা (যে অর্থ) সুদের ওপর দিয়ে থাক তা লোকের ধনসম্পদের সাথে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এটা আল্লাহ্‌র সমীপে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে যাকাত দাও, জেনে রাখ, এই সব লোকই (নিজেদের ধন-সম্পদ) বহুগুণে বৃদ্ধি করছে।" (সূরা রূম : ৪০)।

মূলধন বা পুঁজি বিনিয়োগ সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ঋণগ্রহণ এবং ঋণদান। ইসলাম ঋণদান সম্পর্কিত আদান-প্রদানের ব্যাপারে সুদভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থাকে আদৌ সমর্থন করে না। কুরআন করিমে সূরা বাকারায় বলা হয়েছে:

اَلَّذِيۡنَ يَاۡكُلُوۡنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوۡمُوۡنَ اِلَّا كَمَا يَقُوۡمُ الَّذِىۡ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيۡطٰنُ مِنَ الۡمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّمَا الۡبَيۡعُ مِثۡلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ

(আল্লাযীনা ইয়া'কুলুনার রিবা লা ইয়াকুমুনা ইল্লা কামা ইয়াকুমুল্লাযী- ইয়াতাখাব্বাতুহুশ শায়ত্বানু মিনাল মাস্সি; যালিকা বিআন্নাহুম্ ক্বালু ইন্নামাল বাইয়ু মিসলুর রিবা, ওয়া আহাল্লাল্লাহুল বায়'আ ওয়া হার্‌রামার রিবা)

অর্থ: "যারা সুদ খায় তারা সেভাবে দাঁড়ায় যেভাবে সেই ব্যক্তি দাঁড়ায় যাকে শয়তান সংস্পর্শে এনে জ্ঞান-বুদ্ধিহারা করে ফেলে। এর কারণ হলো, তারা বলে, ব্যবসায়-বাণিজ্য সুদেরই মতো। অথচ আল্লাহ্ ব্যবসায়-বাণিজ্যকে বৈধ করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারা : ২৭৬)।

পবিত্র কুরআন সব ধরনের সুদ নিষিদ্ধ করেছে। আধুনিককালে ব্যবসায়-বাণিজ্য সুদের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছে। সুদ ছাড়া কোন অর্থনৈতিক প্রগতির কথা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু অর্থব্যবস্থা পরিবর্তন করে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা যেতে পারে যার ফলে সুদহীন ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সুদহীন অর্থব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও উল্লেখিত ব্যবসায়-বাণিজ্য অপ্রতিহতভাবেই চলেছিল। উপরোল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে, শয়তান যাকে উন্মত্ত করে তুলেছে সে ছাড়া কেউই সুদ গ্রহণ করে উন্নতি লাভ করতে পারে না। এ কথার অর্থ হলো, কোন বদ্ধ-পাগল যেমন তার কর্মের পরিণাম ভেবে দেখে না, তেমনিভাবে সুদের ওপরে ঋণদাতাগণ সুদের মারাত্মক পরিণতির কথা ভেবে দেখে না। সুদখোর মহাজনেরা শুধু তাদের নিজেদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখে, সমাজ তথা দেশ এবং পৃথিবীর পরিণামের কথা ভাবতে পারে না। সুদের নেশায় কোন-কোন সময় তাদের মানবোচিত গুণাবলী, যেমন- দয়া, মায়া, পরোপকারিতা, সহমর্মিতা প্রভৃতি বিনষ্ট হয়ে যায়।

সুদভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার ফলে কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র সাধ্যাতীত ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এর ফলে এক সুদূরপ্রসারী দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়। সুদখোর মহাজন বা ব্যবসায়ীরা এত সহজে অর্থ উপার্জন করতে পারায় তারা এ ব্যবসার মাঝে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকে। সুদ-ব্যবস্থা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলেছে, যার ফলে জাতিতে-জাতিতে পরস্পরে সহজেই স্বার্থের সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। যখন যুদ্ধ বাধে তখন বিবদমান জাতিগুলোকে বিদেশ হতে অতিরিক্ত সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে হয় এবং সুদের ভিত্তিতে দেশ হতেও বহু অর্থ সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। দেশ এবং বিদেশ হতে এভাবে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে সহজেই মারণাস্ত্র তৈরী অথবা আমদানী করা ব্যাপকতা লাভ করে। ব্যাংকগুলো সুদের অফুরন্ত প্রস্রবণস্বরূপ। এগুলো ছোট-বড় যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের সমরোপকরণ সংগ্রহে সাহায্য করে এবং জাতি-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে মানবতার সর্বনাশ করে এবং বিশ্বকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য, অচিরেই পবিত্র কুরআন, হাদীস ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবী উলট-পালট হয়ে যাবে এবং জগতে মহা ধ্বংস সংঘটিত হবে। তখন "নেযামে ওসীয়্যত" (ওসীয়্যত ব্যবস্থা) কায়েম হবে ও যাকাতের ব্যবস্থা পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং জগতে শান্তিরাজ্য কায়েম হবে।

যারা সুদের ওপর টাকা ধার করে তাদের আত্মমর্যাদা, বিবেচনাবোধ এবং সতর্কতাবোধ প্রবলভাবে হ্রাস পায়। কুরআন করিমে সেজন্য এ অবস্থাকে উন্মত্ততা বা পাগলামী বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতে সুদ-পদ্ধতির সমর্থকদের সাধারণ যুক্তির কথাও আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। সেসব লোক প্রায়ই বলে, লাভের জন্য যেভাবে মানুষ বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে ব্যবসায় করে, একইভাবে অর্থের ব্যবসায় যে মুনাফা পাওয়া যায়

তাকেই সুদ বলে। কিন্তু সুদ-ব্যবসার ফলে যেসব অকল্যাণকর পরিণাম দেখা দেয়, অন্য ব্যবসার ফলে সেরূপ ঘটে না।
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সুদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, **"শরীয়তে সুদের সংজ্ঞা হলো, কোন ব্যক্তি যদি নিজের লাভের জন্য অন্যকে ঋণস্বরূপ টাকা দেয় এবং লাভ নির্দিষ্ট করে নেয়, তাহলে তা সুদ হবে। ... কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি টাকা নেয় এবং অঙ্গীকার না করে, বরং নিজের পক্ষ হতে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিয়ে দেয়, তাহলে এটা সুদ বলে গণ্য হবে না। নবীরা যখনই ঋণ গ্রহণ করতেন তখন অবশ্যই অতিরিক্ত টাকাসহ ঋণ ফেরৎ দিতেন।"** (ফিকাহ আহমদীয়া, ২য় খন্ড)। হযরত নবী করিম (সা.) বলেছেন, **"যে ঋণ কোন মুনাফা টানে তা সুদ।"** (জামেউস সগীর)।
পৃথিবীতে আজ যারা সবচেয়ে বেশি ধনী বলে পরিচিত তাদের প্রায় প্রত্যেকেই সুদ পদ্ধতির সুচতুর প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত মূলধনের পরিমাণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। ফলে সামান্য টাকা দিয়ে ব্যবসায় শুরু করে তারা ব্যাংকের বিশ্বাসভাজন হয় এবং পরে প্রচুর টাকা ধার নিয়ে ব্যবসায় শুরু করে এবং অন্যদিকে উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে প্রচুর মুনাফা লাভের পথ সৃষ্টি করে। বহুক্ষেত্রে বড় ব্যবসায়ীরা সাধারণ স্বল্প মূলধন নিয়োগকারী ব্যবসায়ীদেরকে প্রতিযোগিতায় সহজেই হারিয়ে দিয়ে একচেটিয়া ব্যবসায় (Monopoly) প্রতিষ্ঠিত করে। সুদভিত্তিক এ ঋণ-প্রথার দক্ষ পরিচালনার সাহায্য ছাড়া শিল্প কিংবা ব্যবসায় কেউ আকাশচুম্বী উন্নতি লাভ করেছে এমন দৃষ্টান্ত অল্পই আছে।

সুদহীন ইসলামী অর্থনীতি

সুদ-পদ্ধতি যদি না থাকতো, তাহলে প্রত্যেকেই তার মূলধন কো-অপারেটিভ বা সমবায়ভিত্তিক ব্যবসায় বা শিল্পকাজে নিয়োগ করতো, ফলে ব্যবসায় ও শিল্পের মূলধনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও যেমন বাড়তো, তেমনি ব্যবসায়ের আয় বহু লোকের মাঝে ভাগ হয়ে যেত। দশজন লোকের প্রত্যেকে যদি দশ হাজার টাকা কোন ব্যবসায় নিয়োগ করে, তবে এক লক্ষ টাকা দিয়ে যে ব্যবসায় করা যাবে তার লভ্যাংশে দশজনের সমান অধিকার থাকবে। অথচ সেই এক লক্ষ টাকার মালিক যদি একজন ব্যবসায়ী হয়, তবে গোটা লাভ একমাত্র তারই হাতে যাবে। উভয়ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের পরিমাণ সমান থাকবে, শুধু মুনাফা কোন ব্যক্তিবিশেষ বা পরিবারের একক হাতে না গিয়ে একাধিক হাতে পড়বে।
এখানে একথা বলা আবশ্যক, ইসলাম সুদহীন ঋণ প্রথাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেনি। বরং ঋণগ্রহীতাকে বলা হয়েছে, সে যেন ঋণ গ্রহণের সময় অন্যকে দিয়ে তা লিখিয়ে নেয় এবং শর্তগুলো নির্ধারণ করে দেয়। (সূরা বাকারা : ২৮৩)। আবার বলা হয়েছে, ঋণগ্রহীতা যদি কষ্টকর অবস্থায় থাকে, তাহলে ঋণদাতা যেন তাকে (যতদিন তার সুদিন না আসে) কিছু সময় অবকাশ দেয়। আর যদি ঋণদাতা তাকে অক্ষমতার জন্য মাফ করে

দেয়– অর্থাৎ, ঋণের টাকা গ্রহণ না করে, তা আরও উত্তম বলে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বিবেচিত হবে। (সূরা বাকারা : ২৮১)।

যাকাত ব্যবস্থা ও অর্থ পরিচালনা
(Money Circulation)

যাকাতের উদ্দেশ্য শুধু গরীব-দুঃখীর প্রতি বিশেষ ত্রাণের ব্যবস্থা করা অথবা আর্থিক দিক দিয়ে যারা পেছনে পড়ে আছে সমাজের সে অংশের উন্নয়ন করাই নয়, বরং এর দ্বারা অর্থ-সম্পদ এবং পণ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখার অভ্যাস দূর হয়। ফলে টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য পণ্যদ্রব্য সবসময় এক হাত হতে অন্য হাতে পরিচালিত হতে পারে। এভাবে অতি সহজেই আর্থিক বিষয়সমূহের পারস্পরিক সমন্বয় (Economic Adjustment) সাধিত হতে পারে। অর্থ-সম্পদ সবসময় সার্কুলেশনে সচল থাকার ফলে সহজেই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের কর্মসংস্থান হবে। উপরন্তু যাকাতের টাকা দিয়ে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর মৌলিক চাহিদাগুলোও পূরণ হবে। তাই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ۙ

(ওয়াল্লাযীনা হুম্ লিয্ যাকাতি ফা'য়িলুন)
অর্থ: "এবং যারা (মু'মিনরা) যাকাত প্রদানে তৎপর (তারা সফল হয়)।" অর্থাৎ, মু'মিনরা যাকাত প্রদানে কোন গড়িমসি করে না। (সূরা মু'মিনুন : ৫)।
মোটকথা ব্যক্তিগত, সামাজিক তথা সার্বিক কল্যাণের জন্য যাকাত ব্যবস্থা সত্যিই অতুলনীয়। সূরা লোকমানের প্রথম রুকূতে সেজন্য বলা হয়েছে, "যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং পারলৌকিক জীবনে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তারাই তাদের প্রভুর পক্ষ হতে আগত হেদায়েতের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তারাই (সব ক্ষেত্রে) কৃতকার্য হবে।" (সূরা লোকমান : ৫-৬)।

ইসলামী অর্থনীতির মূলকথা

প্রসঙ্গত: ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কয়েকটি মূল বিষয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে:
১) ইসলাম অসঙ্গতভাবে অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টাকে ধর্মীয় এবং নৈতিক বিধানের মাধ্যমে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে।
২) অর্থনীতির মূল বিষয় 'অভাববোধ' (Want) সম্বন্ধে ইসলাম একটি নতুন মূল্যবোধের সৃষ্টি করেছে। এ মূল্যবোধে পুঁজিপতিদের চরম স্বার্থান্ধতা ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা নেই অথবা কমিউনিজমের অনুপ্রেরণাহীন ও ব্যক্তিস্বাধীনতাহীন জীবনযাত্রার কঠোরতাও নেই। ইসলাম ধনী-গরীব সব মানুষের স্বাধীনতা এবং মৌলিক প্রয়োজনের কথা স্বীকার করেছে

এবং এদের মাঝে এক অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

৩) ইসলাম Consumption বা ভোগের পরিমাণ এবং প্রকারকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতে আদেশ দিয়েছে।

৪) এসব বিষয় সত্ত্বেও যাকাত, সদকা, দান-খয়রাত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামে একটি নিখুঁত ধন-বন্টন-নীতি অনুসৃত হয়েছে। আন্তরিকতার সাথে এ নীতিগুলো অনুসৃত হলে ধনী শ্রেণীর হাতে অবৈধ ও অবাঞ্ছিত পরিমাণে ধন-সম্পত্তি সংগৃহীত হতে পারবে না।

৫) ইসলামী নীতি অনুসারে সব দরিদ্রের মৌলিক খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের অভাব পূরণের জন্য বিশেষ দায়িত্ব থাকবে রাষ্ট্রের ওপর।

৬) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সংযমপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতির অনুসরণ করতে হবে এবং যথাসম্ভব যুদ্ধের সম্ভাবনা হতে দেশকে রক্ষা করতে হবে।

৭) বিশ্বব্যাপী খিলাফতের অধীনে পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয়ক্ষেত্রে সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে নিযামে ওসীয়্যত ও তাহরীকে জাদীদের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

৮) সকল প্রকার ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড, জ্বালাও-পোড়াও এবং দুর্নীতির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়াদি পরিহার করার জন্য ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সকল পর্যায়ে আন্তরিকতার সাথে প্রচেষ্টা করতে হবে। ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক বিচার-ব্যবস্থা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। এই সকল বিষয় অর্থনৈতিক উন্নতির পূর্বশর্ত।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

দোয়া

দোয়া সংক্রান্ত জরুরী কিছু কথা

আল্ কুরআনুল আযীমে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাকে তাঁর কাছে দোয়া করার জন্যে বিশেষভাবে তাগিদ প্রদান করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, **"উদউনী আস্‌তাজীব লাকুম"–** অর্থাৎ, আমার কাছে দোয়া কর আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব। (সূরা আল্ মু'মিন : ৬১)। বরং তিনি উদাসীনদের আরও একটু কঠোরভাবে বলেছেন, **"কুল মা ই'বাউবিকুম রাব্বি লাওলা দুআউকুম"–** অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, তোমরা যদি দোয়া না কর তবে আমার প্রভু তোমাদের কি পরওয়া করেন? (সূরা আল্ ফুরকান : ৭৮)।

হাদীস পাঠেও আমরা জানতে পারি, আঁ-হযরত (সা.) দোয়ার প্রতি বিশেষ জোর দিয়েছেন। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর জিনিসের জন্যও তিনি আল্লাহ্ তা'লার দোয়াপ্রার্থী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন," তোমাদের প্রত্যেক অভাব অভিযোগের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে প্রার্থনা কর। এমনকি জুতার ফিতার জন্যও।" (তিরমিযী)।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, "নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু জীবিত ও দয়ালু। কোন বান্দা তাঁর কাছে হাত তুললে তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" (তিরমিযী, আবু দাউদ)।

বর্তমান যামানার ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, **"দোয়ার মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা অত্যাধিক শক্তি রেখেছেন। খোদা তা'লা ইলহামের মাধ্যমে বারবার আমাকে জানিয়েছেন, যা কিছু হবে দোয়া দ্বারাই হবে। আমাদের হাতিয়ার তো দোয়াই। দোয়া ছাড়া আর কোন অস্ত্র আমাদেরকে দেয়া হয়নি।"** একটি কথা অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, দোয়া করা আমাদের কাজ আর দোয়া কবুল করা খোদা তা'লার কাজ। খোদা তা'লা আমাদের অধীনে নন বরং আমরাই তাঁর অধীনে। তিনি আমাদের প্রভু এবং মালিক। কোন হাকিম বা বাদশাহ্ যদি প্রজার প্রার্থনা মঞ্জুর না করেন তবে প্রজার কিই-বা করার থাকে। তাই কোন দোয়া কবুল না হলে আমাদের হতাশ হবার কিছু নেই। আল্লাহ্ তা'লা রহমান এবং রহীম। তিনি আলেমুল গায়েবও বটে। তিনি জানেন, আমরা যে জন্যে দোয়া করেছি তা কবুল করা হলে আমাদের মঙ্গল হবে, না অমঙ্গল। আমাদের খোদা ত্রিকালদর্শী। আমাদের ভাল-মন্দ তাঁরই নখদর্পণে। তিনি আমাদের স্রষ্টা। আমাদের ভাল-মন্দের খবর তাঁর চেয়ে বেশি আর কে জানে? তাই কোন দোয়া কবুল না

হলে আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। দোয়া করে যাওয়াই শ্রেয়। কথিত আছে, এক বুযূর্গের শিষ্য দোয়ার সময় তাঁর কাছে উপস্থিত ছিল। পরপর তিন দিন ইলহাম মারফত সেই বুযূর্গকে জানান হলো, "তোমার দোয়া কবুল হবে না"। এতে শিষ্যের মনে বুযূর্গ সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি হলো এবং সে তাকে দোয়া কবুল না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে বসলো। এতে বুযূর্গ মনে কোন প্রকার কষ্ট না নিয়ে শান্তভাবে বললেন, "ছত্রিশ বছর ধরে আমি দোয়া করছি আর এভাবে ইলহাম হচ্ছে। দোয়া করা আমার কাজ আর দোয়া কবুল করা খোদা তা'লার কাজ। এ ব্যাপারে আমি তো আর বাড়াবাড়ি করতে পারি না।" এ সময়েই পুনঃইলহাম হলো, " তোমার ছত্রিশ বছরের দোয়া সব আজ কবুল করা হলো।" (সুবহানআল্লাহ্)। কী মহান ধৈর্য! প্রার্থনাকারীকে ধৈর্য ও স্থৈর্যের সাথে ক্রমাগত দোয়া করে যেতেই হবে। তবে এটা সত্য, তার দোয়া বিফলে যাবে না। একদিন না একদিন তার দোয়া কবুল হবেই। কেননা, দোয়া কবুল করার জন্য আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'মুজীব' তথা দোয়া কবুলকারী খোদা কোন না কোন আঙ্গিকে তাঁর বান্দার দোয়া কবুল করে থাকেন। দোয়া যখন করা হয়, তখন তা কবুল না হলে আকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং রহমান খোদা প্রয়োজনানুসারে বান্দার অজ্ঞাতসারে সেই দোয়ার ফল তাকে দিয়ে থাকেন। নিয়তি বা তকদীরের লিখনের প্রতি প্রার্থনাকারীকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

তকদীর দু'প্রকার। যথাঃ **১**। তক্‌দীরে মুয়াল্লেক (টলমান তকদীর) ২। তক্‌দীরে মুব্‌রাম (অটল তক্‌দীর)। দোয়া সদকা এবং খয়রাত ইত্যাদিতে তকদীরে মুয়াল্লাকের পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থায় কোন তকদীর কার্যকরী তা বান্দার বোধগম্য নয়। তবুও আল্লাহ্ তা'লা বান্দার দোয়াকে নিষ্ফল করেন না। কোন না কোনভাবে তা পূরণ করেন। এটাই বুযূর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমত।

প্রত্যেক কাজের এক একটা মৌসুম হয়ে থাকে। সময়মত কাজ করলেই সুফল লাভ হয়। অসময়ে কাজ করলে সুফল লাভ তো হয়ই না বরং তাতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরূপভাবে দোয়ারও একটি মৌসুম বা সময় আছে।

নামাযের মধ্যেই দোয়া অধিক কবুল হওয়ার মোক্ষম সময়, বিশেষ করে যখন আমরা সিজদায় রত থাকি। আঁ-হযরত (সা.) বলেছেন, "যখন কোন বান্দা সিজদায় থাকে, তখন সে আল্লাহ্ তা'লার অতি নিকটে থাকে। সুতরাং তখন বেশি করে দোয়া কর।" (মুসলিম)। এ ছাড়া দোয়া কবুল হয় জুমু'আর দিনে, সুবহে সাদিকের পূর্বে, রমযান মাসে, লায়লাতুল কদরে, আরাফাতের দিনে, ইফতার করার সময়ে, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, বৃষ্টিপাতের সময়ে, অসুস্থ অবস্থায়, সফরকালীন সময়ে, জিহাদের ময়দানে এবং যুলুম ও অত্যাচার বরদাশ্‌তকালীন ধৈর্য ধারণ ইত্যাদি সময়ে।

দোয়ার কবুলিয়তের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর পবিত্র বক্তব্যের আলোকে কয়েকটি পন্থা নিম্নে

বর্ণিত হলো:

১) আল্লাহ্ তা'লাকে সর্বদা হাযির-নাযির খেয়াল করা এবং তাঁর সব হুকুম-আহকাম মোতাবেক নিজের জীবনকে পরিচালিত করা।

২) আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করবেন আর করার ক্ষমতা রাখেন, এ বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করতে হবে। আল্লাহ্‌র রহমত হতে নিরাশ হবার অবকাশ নেই।

৩) দোয়ার কবুলিয়তের আশায় বিপদগ্রস্ত বান্দার দুঃখ-কষ্ট মোচনে সচেষ্ট থাকা উচিত।

৪) দোয়ার শুরুতে আঁ-হযরত (সা.)-এর ওপর অধিক সংখ্যায় দুরূদ পাঠ করলে দোয়া কবুল হওয়ার আশা করা যায়। কেননা, সব কল্যাণ এবং আশিস আমরা তাঁর বদৌলতেই পেয়ে থাকি।

৫) দোয়ার প্রথম ভাগে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা এবং পবিত্রতা বেশি-বেশি করে ঘোষণা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার মহিমা কীর্তনে আত্মা পবিত্র, নির্মল ও জ্যোতির্ময় হয়।

৬) দোয়া করার পূর্বে নিজ শরীর, কাপড়-চোপড় এবং পরিবেশের পবিত্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কেননা, পবিত্রতম আল্লাহ্ তা'লা পবিত্রতাকেই বেশি পছন্দ করেন।

৭) দোয়ার জন্যে এক নীরব নিস্তব্ধ কোলাহলমুক্ত পরিবেশকে বেছে নেয়া দরকার। এতে দোয়ায় পূর্ণ একাগ্রতা সৃষ্টি হয়।

৮) দোয়ার পূর্বে নিজের দুর্বলতা, অক্ষমতা আর নিঃস্ব অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করা দরকার। খুব চিন্তা করা দরকার যেন তার ওপর শিশুসুলভ অসহায়ত্বের অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেরূপ সে মায়ের সাহায্য ছাড়া এক মুহূর্তও চলতে পারে না।

৯) দোয়া করার পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার অযাচিত-অসীম দানসমূহের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লার ওপর গভীর আস্থা জন্মে যে তিনি দোয়া কবুল করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। না চাইতেই যিনি অনেক দিয়েছেন, চাইলে তিনি কি না দিতে পারেন?

১০) আল্লাহ্ তা'লার নেয়ামতসমূহের চিন্তা করার সাথে সাথে তাঁর অভিসম্পাতের বিষয়াবলী সম্বন্ধেও চিন্তা করা দরকার– যাতে প্রার্থনাকারীর কাছে তার নিঃসহায় অবস্থা আরও প্রকটভাবে ধরা দেয়।

১১) দোয়া করার প্রারম্ভে প্রার্থনাকারীকে সব দিক হতে অলসতামুক্ত হতে হবে। কেননা, শারীরিক-মানসিক, অলসতাপূর্ণ আত্মার অধিকারী ব্যক্তির দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ।

১২) কোন বিশেষ ব্যাপারে দোয়া শুরু করার পূর্বে সহজে কবুলিয়তযোগ্য সাধারণ বিষয়াবলীর জন্যে দোয়া করা প্রয়োজন। এতে বিশেষ দোয়ার ব্যাপারে অধিক আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সৃষ্টি হয় আর কবুলকৃত দোয়ার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে ঐশীসন্তুষ্টি অর্জন করত তা কাজে লাগানো যায়।

১৩) দোয়ার জন্য আশিসমন্ডিত স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন। কেননা, দোয়ার কবুলিয়তের সাথে উপযুক্ত স্থানের সম্পর্ক অনস্বীকার্য।

১৪) বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে দোয়া করার সাথে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ-বিশেষ তাগিদ অনুসারে আল্লাহ্ তা'লার সেই গুণবাচক নামকে নিরূপণ করে তাঁকে সেই নামে ডাকা উচিত। তা হলে শীঘ্র-শীঘ্রই দোয়া কবুল হবে।

১৫) আল্লাহ্ তা'লার "আল্লাহ্" নাম সব গুণবাচক নামের সমষ্টি– অর্থাৎ, সব গুণবাচক নামের সমন্বয় 'আল্লাহ্' নামের মাঝে ঘটেছে। তাই শুধু আল্লাহ্ নাম ডাকলেও যেকোন ব্যাপারে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

পরিশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কথায় **"গয়ের মুমকিন কো ইয়ে মুমকিন মে বদল দেতি হ্যায়, এ্যায় মেরে ফালসফিও! যোরে দোয়া দেখো তো"–** অর্থাৎ, অসম্ভবকে এটি (দোয়া) সম্ভব করে দেখায়, হে আমার দার্শনিকবৃন্দ। দোয়ার শক্তি দেখ না!

আরবি শব্দ বড়ই গাম্ভীর্যপূর্ণ ও তাৎপর্যবহুল। বাংলা ভাষায় সবসময় এর প্রতিশব্দ মেলা ভার। ভাই-বোনদের প্রতি লক্ষ্য রেখে যতদূর সম্ভব সরল ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্য হল, হাফেয মুযাফ্‌ফর আহমদ সাহেবের 'আদঈয়াতুল কুরআন' পুস্তক থেকে দোয়ার পটভূমি সহ আরও কিছু-কিছু অংশের অনুবাদ নেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্রত্যেকটি দোয়ার সঠিক বাংলা উচ্চারণ দেয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে।

কুরআন মজীদের দোয়া

(১) সূরা আল্ ফাতিহা -১

(মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ এতে ৭ আয়াত এবং ১ রুকু আছে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

(বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম)

১। আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দাতা, বারবার কৃপাকারী।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢

(আল্হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন)

২। সব প্রশংসা আল্লাহ্রই, যিনি বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক।

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٣

(আর রাহমানির রাহীম)

৩। পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী।

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝٤

(মালিকি ইয়াওমিদ্দীন)

৪। বিচার দিবসের মালিক বা কর্তা।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٥

(ইয়্যাকানা'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতা'ঈন)

৫। আমরা তোমারই ইবাদত (উপাসনা) করি এবং তোমারই কাছে আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝٦

(ইহদিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম)

৬। তুমি আমাদেরকে সরল-সুদৃঢ় পথে চালাও।

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

(সিরাত্বাল্লাযীনা আন'আমতা আলায়হিম গায়রিল মাগদুবি 'আলায়হিম ওয়ালাদদাল্লীন)

৭। তাদের পথে যাদেরকে তুমি পুরস্কার দিয়েছ, যারা (তোমার) ক্রোধগ্রস্ত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও হয়নি। আমীন (তা-ই হোক)।

• সূরাতুল ফাতিহাকে রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শ্রেষ্ঠ দোয়া হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (মুস্তাদরাক হাকিম)।

• নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ওহীর মাধ্যমে এ সংবাদ দেয়া হয়েছে, একটি পরিপূর্ণ দোয়া যা ইতোপূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি তাহলো সূরা আল্ ফাতিহা ও সূরা আল্ বাকারার শেষ আয়াত। যে-ই এসব দোয়ার মাধ্যমে খোদা তা'লার কাছে চাইবে তার দোয়া গ্রহণ করা হবে। (সহীহ্ মুসলিম)।

• হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি নামাযকে আমার ও বান্দার মধ্যে বন্টন করে দিয়েছি। আমার বান্দার অবশ্যই সেসব লাভ হবে যা এ দোয়াতে তার জন্য চাওয়া হয়েছে। (সহীহ্ মুসলিম)।

সূরা আল্ ফাতিহা পরিপূর্ণ দোয়া

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন :

"খোদা তা'লা আল্ ফাতিহার মধ্যে দোয়ার এমন উত্তম পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যার চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আর সৃষ্টি হতে পারে না। দোয়ার মধ্যে আত্মিক আবেগ সৃষ্টি হওয়ার জন্যে যা দরকার এর সব বিষয় এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। বিস্তারিত বিবরণ হল, দোয়ার কবুলিয়তের জন্য এটা আবশ্যক, এর মধ্যে যেন একটি আবেগ থাকে। কেননা, যে দোয়ার মধ্যে আবেগ থাকে না তা কেবল মৌখিক বিড়বিড়ানি, সত্যিকারের দোয়া নয়। কিন্তু এটাও বলা আবশ্যক, দোয়ার মধ্যে আবেগ সৃষ্টি হওয়া প্রত্যেক মানুষের নিয়ন্ত্রণে নয় বরং মানুষের জন্যে অত্যাধিক প্রয়োজনীয় বিষয় তার ধ্যান-ধারণায় বিদ্যমান থাকা দরকার। আর এ কথা প্রত্যেক বিবেকবানের নিকট দীপ্তিমান যে, আত্মিক আবেগ সৃষ্টির জন্য কেবল দু'টি বিষয়ই আছে:
এক-অদ্বিতীয় খোদাকে পরিপূর্ণ, সর্বশক্তিমান সব গুণের আধার মনে করে তাঁর রহমত ও দয়াকে আজীবন নিজের অস্তিত্ব ও জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক জ্ঞান করা। আর তাঁকেই সব কল্যাণের উৎস মনে করা। দ্বিতীয়ত, নিজের অস্তিত্ব ও নিজের সমশ্রেণীগুলোকে অধম, কপর্দকহীন এবং খোদা তা'লার সাহায্যের মুখাপেক্ষী মনে করা... প্রার্থনা করার সময়ে প্রার্থনাকারীর এ দু'টি উপকরণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।" (বারাহীনে আহমদীয়া : পৃ. ৫৫৩-৫৪, টীকা দ্রষ্টব্য)।

(২) হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া

[হযরত ইবরাহীম (আ.) বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সময় মক্কা শহরের পূর্ণ নিরাপত্তা, এর অধিবাসীদের রিযক লাভের ও সন্তান-সন্ততির শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে দোয়া করেছিলেন তা সবই গ্রহণ করা হয়] (তফসীর দূররে মনসুর, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৮৬, তফসীর কুরতুবী, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৭)।

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

(রাব্বিজ'আল হাযা বালাদান আমিনাওঁ ওয়ারযুক্ব আহলাহু মিনাস সামারাতি মান আমানা মিনহুম বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এ (মক্কাকে) এক নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ শহর করে দাও। আর এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখবে তাদেরকে ফল-ফলাদির রিযক (জীবনোপকরণ) দান করো।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না-ইন্নাকা আনতাস্ সামী'উল 'আলীম)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের পক্ষ থেকে (এ সেবা) গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۪ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

(রাব্বানা ওয়াজ আলনা মুসলিমায়নি লাকা ওয়া মিন যুররিয়্যাতিনা উম্মাতাম্ম মুসলিমাতাল্লাকা-ওয়া আরিনা মানাসিকানা ওয়া তুব্'আলায়না-ইন্নাকা আনতাত্ তাওওয়াবুর রাহীম)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী বানাও এবং আমাদের বংশধরদের মাঝেও তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী একটি উম্মত (সৃষ্টি কর)। আর আমাদেরকে আমাদের ইবাদত (ও কুরবানীর) নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দান কর এবং আমাদের তওবা কবুল করে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, কারণ তুমিই সদয় তওবা গ্রহণকারী, বারবার কৃপাকারী।

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(রাব্বানা ওয়াব'আস ফীহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলায়হিম আয়াতিকা ওয়া

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

ইউ'আল্লিমু হুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়া ইউযাক্কীহিম-ইন্নাকা আনতাল আযীযুল হাকীম)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে এক মহান রসূল আবির্ভূত কর, যে তাদের নিকট তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শুনাবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (প্রজ্ঞা) শিক্ষা দিবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা বাকারা : ১২৭-১৩০)।

৩) বিপদের সময় মু'মিনদের দোয়া

[খোদার ধৈর্যশীল মু'মিন বান্দাদের ওপর যখন কোন বিপদ পড়ে বা দুঃখ-কষ্ট আসে তখন তারা এ দোয়া করে থাকে, যার দরুন তাদের ওপর তাদের প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহরাজি ও কল্যাণরাজি অবতীর্ণ হয়ে থাকে। আর এরাই পথপ্রাপ্ত। (সূরা বাকারা : ১৫৬-১৫৭)।
হযরত ইমাম হোসেন বিন আলী (রা.)-এর বর্ণনা, "মু'মিন দুঃখকষ্টের সময় 'ইন্নালিল্লাহ' পড়লে আল্লাহ্ তা'লা এর প্রতিদান হিসেবে সেভাবেই এর প্রতিফল দিয়ে থাকেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ)।
এই জন্যে দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণের প্রতিকারও এ দোয়ার প্রসাদে লাভ হয়]
দোয়াটি হল:

اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ؁

(ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)
নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্রই আর নিশ্চয় তাঁর দিকে আমরা ফিরে যাব। (সূরা বাকারা : ১৫৭)।

(৪) উভয় জগতের কল্যাণ লাভের দোয়া

[হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)-কে কেউ একজন বললেন, আপনি আমার জন্যে দোয়া করুন। হযরত আনাস (রা.) এ দোয়া করলেন। সে আরও দোয়া করতে বললে, তিনি বলেন, তুমি আর কী চাও? তোমার জন্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ চাইলাম। (তফসীর কুরতুবী, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৪৩)।]

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ؁

(রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াক্বিনা আযাবান্নার)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেও এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে আগুনের আযাব থেকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা : ২০২)।

টিকা : হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেছেন, স্বপ্নে একবার হযরত নবী করিম (সা.) তাঁকে অধিক সংখ্যায় উপরোক্ত দোয়া পাঠ করার জন্যে তাকিদ দিয়েছেন। (মিরকাতুল ইয়াকীন, পৃ. ১৮৮)।

(৫) অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সাহায্য লাভের দোয়া

رَبَّنَآ اَفۡرِغۡ عَلَيۡنَا صَبۡرًا وَّ ثَبِّتۡ اَقۡدَامَنَا وَانۡصُرۡنَا عَلَى الۡقَوۡمِ الۡكٰفِرِيۡنَ۝

(রাব্বানা আফরিগ আলায়না সাব্‌রাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর অসাধারণ ধৈর্য বর্ষণ কর ও আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ আর কাফির (অস্বীকারকারী) লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। (সূরা বাকারা : ২৫১)।

(৬) ক্ষমা লাভের দোয়া

سَمِعۡنَا وَاَطَعۡنَا ۫ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيۡكَ الۡمَصِيۡرُ۝

(সামি'না ওয়া আত্বা'না গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলায়কাল মাসীর)

আমরা (আল্লাহ্ তা'লার আদেশ) শুনলাম ও মানলাম, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা তোমারই কাছে ক্ষমা চাই আর তোমারই দিক (সবার) ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা : ২৮৬)।

(৭) ঐশী পাকড়াও থেকে সুরক্ষা এবং ঐশী সাহায্য লাভের দোয়া

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَاۤ اِنۡ نَّسِيۡنَاۤ اَوۡ اَخۡطَاۡنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحۡمِلۡ عَلَيۡنَاۤ اِصۡرًا كَمَا حَمَلۡتَهٗ عَلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلۡنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعۡفُ عَنَّا ۟ وَاغۡفِرۡ لَنَا ۟ وَارۡحَمۡنَا ۟ اَنۡتَ مَوۡلٰٮنَا فَانۡصُرۡنَا عَلَى الۡقَوۡمِ الۡكٰفِرِيۡنَ۝

(রাব্বান লা তুআখিযনা ইননাসীনা আও আখত্বা'না- রাব্বানা ওয়ালা তাহমিল 'আলায়না ইস্রান কামা হামালতাহু 'আলাল্লাযীনা মিন ক্বাবলিনা- রাব্বানা ওয়ালা তুহাম্মিলনা মা-লা ত্বাক্বাতা লানা বিহি-ওয়া'ফু 'আন্না- ওয়াগফিরলানা-ওয়ারহামনা-আন্‌তা মাওলানা-ফান্‌সুরনা 'আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করো না যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ত্রুটি-বিচ্যুতি করি। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর এমন বোঝা চাপিও না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে মার্জনা কর, তুমি

আমাদেরকে রক্ষা কর, আর তুমি আমাদের প্রতি কৃপা কর, (কারণ) তুমিই আমাদের অভিভাবক। অতএব অস্বীকারকারী লোকদের বিরুদ্ধে তুমি আমাদের সাহায্য কর। (সূরা বাকারা : ২৮৭)।

[এ দু'টি দোয়া সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত। হযরত আবু মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, "সূরা বাকারার শেষ দু'টি আয়াত রাতের বেলায় ঘুমোবার সময় পাঠ করা খুবই কল্যাণজনক। তদুপরি এগুলো আরশের সেই ভান্ডার– যা নবী করিম (সা.) ছাড়া কাউকে দেয়া হয়নি। (তফসীরে তাবারী, ৩য় খন্ড, পৃ. ৪৩৪)।

সূরা বাকারার শেষ দু'টি দোয়ার আয়াত সম্বন্ধে রসূল করিম (সা.) বলেছেন, এ দু'টি মুখস্ত কর ও পরিবারের সবাইকে মুখস্থ করাও। কেননা, এগুলো নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়াতে ব্যবহার করা হয়। (হযরত ইমাম সুয়ুতি (রহ.) প্রণীত আদ্ দূররুল মনসুর, ১ম খন্ড, পৃ. ২৭৮)।

(৮) সঠিক পথ লাভের পর পথভ্রষ্ট না হওয়ার দোয়া

[হযরত উম্মে সালামাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন," রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময় এ দোয়া করতেন, হে হৃদয় পরিবর্তনকারী খোদা! আমার হৃদয়কে তোমার ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। তিনি (রা.) বলেন, আমি বলাম, হে আল্লাহ্র রসূল! হৃদয় আবার পরিবর্তন হয় নাকি? হুযূর (সা.) এ কুরআনী দোয়া পড়ে শুনান আর বলেন, প্রত্যেক মানুষের পদস্খলনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্যে বেশি-বেশি এ দোয়া করা আবশ্যক। (হযরত ইমাম সুয়ুতি (রহ.) প্রণীত আদ্ দুররুল মনসুর, ২য় খন্ড, পৃ. ০৮)।

رَبَّنَا لَا تُزِغۡ قُلُوۡبَنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدَيۡتَنَا وَهَبۡ لَنَا مِنۡ لَّدُنۡكَ رَحۡمَةً ۚ اِنَّكَ اَنۡتَ الۡوَهَّابُ۝

(রাব্বানা লা তুযিগ্ কুলূবানা বা'দা ইয্ হাদায়তানা ওয়া হাব লানা মিল্লাদুনকা রাহ্‌মাতান-ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্‌হাব)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ দানের পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না। আর তোমার সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর। নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা। (সূরা আলে ইমরান : ৯)।

(৯) ঈমানের স্বীকারোক্তি, পাপ ও ঐশী শাস্তি থেকে রক্ষার দোয়া

[নবী করিম (সা.) বলেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'লা কোন জাতিকে শাস্তি দিতে চান তখন তাদের মধ্যকার তাহাজ্জুদগুযার ও ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাদের কারণে সেই জাতির শাস্তি টলিয়ে দেন। (তফসীর কুরতুবী, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৯)।]

رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝١٦

(রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগলির লানা যুনূবানা ওয়াক্বিনা 'আযাবান্নার)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর এবং আগুনের শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (সূরা আলে ইমরান : ১৭)।

(১০) ঐশী মাহাত্ম্য কীর্তন ও উন্নতি লাভের দোয়া

[নবী করিম (সা.) হযরত মুআয (রা.)-কে ঋণ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে এ দু'টো আয়াত পড়তে বলেছেন। দুঃখ-কষ্টে পীড়িত যে মুসলমান এ আয়াত পাঠ করে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ঋণ ও দুঃখকষ্ট দূর করে দিবেন। মুকাত্তিল বলেন, রসূল করিম (সা.) পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের ওপর যখন বিজয় লাভ করেন তখন তাঁকে এ দোয়া শিখান হয়। (তফসীর কুরতুবী, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৫৪)।]

اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۖ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢٧

(আল্লাহুম্মা মালিকাল মুলকি তু'তিল মুলকা মান তাশাউ ওয়া তানযি'উল মুলকা মিম্মান তাশাউ ওয়া তু'ইয্যু মান তাশাউ ওয়া তুযিল্লু মান তাশাউ বিইয়াদিকাল খায়র-ইন্নাকা 'আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর)
হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্! যাকে চাও তাকেই তুমি ক্ষমতা দান কর আর যার নিকট থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও। আর যাকে চাও সম্মান দান কর এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত কর। সব কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ে (যা তুমি চাও) সর্বশক্তিমান।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۖ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۖ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝٢٨

(তু'লিজুল্ লায়লা ফিন্নাহারি ওয়া তু'লিজুন্নাহারা ফিল্লায়ল-ওয়া তুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মায়্যিতি ওয়া তুখরিজুল মায়্যিতা মিনাল হায়্যি-ওয়া তারযুকু মান তাশাউ বিগায়রি হিসাব)
তুমি রাতকে দিনে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করাও। আর তুমি মৃত থেকে জীবিতকে বের কর এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের কর। আর যাকে চাও তুমি বেহিসাব রিয্ক (জীবনোপকরণ) দান কর। (সূরা আলে ইমরান : ২৭-২৮)।

(১১) সন্তান উৎসর্গ করার মানত ও নযর মানার দোয়া

[হযরত মরিয়মের মা হান্না তাঁর নিজের ভাবী সন্তানকে জন্মের পূর্বে উৎসর্গ করার জন্যে এ দোয়া করেছিলেন। এ দোয়া কবুল হয়েছিল। আর মরিয়মের মত মহান পুণ্যবতী কন্যা তাঁকে দেয়া হয়েছিল।]

رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝٣٦

(রাব্বি ইন্নী নাযারতু লাকা মা ফী বাত্বনী মুহার্‌রারান ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাস্ সামী'উল 'আলীম)।
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক। আমার গর্ভে যা আছে তা আমি (সংসার) মুক্ত করে তোমার (ধর্মের সেবার) জন্যে উৎসর্গ করলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে এটা গ্রহণ কর। নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (সূরা আলে ইমরান : ৩৬)।

(১২) রসূলের স্বীকারোক্তি ও ঐশী নৈকট্য লাভের দোয়া

[হযরত মসীহ্ নাসেরী (আ.)-এর হাওয়ারীরা চারদিক থেকে মসীহ্কে অস্বীকার করা হচ্ছে দেখে সাহায্যের ধ্বনি উচ্চারণ করেন-মসীহ্র ওপর ঈমান আনুন আর দোয়া করুন।

رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝٥٤

(রাব্বানা আমান্না বিমা আনযালতা ওয়াত্তাবা'নার রাসূলা ফাকতুবনা মাআশ্ শাহিদীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি আর এ রসূলের অনুসরণ করেছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে লিখে রাখ। (সূরা আলে ইমরান : ৫৪)।

(১৩) ধৈর্য্য ও স্থৈর্যের জন্যে দোয়া

[নবীদের ওপর ঈমান আনয়নকারী সেসব আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের আল্লাহ্ তা'লা প্রশংসা করেন– যারা নিজেদের নবীদের সাথে থেকে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছে, মোটেও দুর্বলতা দেখায়নি। কুরআন শরীফে তাদের এ দোয়ার উল্লেখ এসেছে। যার ফলে আল্লাহ্ তাঁদেরকে ইহ ও পরকালের প্রতিদান দিয়েছেন।]

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِىْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝١٤٨

(রাব্বানাগ্ ফিরলানা যুনূবানা ওয়া ইসরাফানা ফী আমরিনা ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। আমাদেরকে আমাদের পাপ ও আমাদের কাজের মধ্যকার

বাড়াবাড়ি ক্ষমা কর। আর আমাদের পদক্ষেপকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত কর (আমাদেরকে বিশ্বাসে অটল-অনড় রাখ)। আর অস্বীকারকারী জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৮)।

(১৪) আল্লাহ্ তা'লা যথেষ্ট হওয়ার দোয়া

[হযরত ইবরাহীম (আ.)- কে যখন আগুনে ফেলা হলো তখন তিনি এ দোয়া করেছিলেন- বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর]

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝١٧٤

(হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল)

আল্লাহ্ আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আর তিনি কত উত্তম কার্যনির্বাহক! (সূরা আলে ইমরান : ১৭৪)।

(১৫) দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝١٩٢

(রাব্বানা মা খালাক্বতা হাযা বাত্বিলান- সুবহানাকা ফাক্বিনা আযাবান্নার)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এ (বিশ্বজগতকে) বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। সুতরাং তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ ۭ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ۝١٩٣

(রাব্বানা ইন্নাকা মান তুদখিলিন্নারা ফাক্বাদ আখযাইতাহু- ওয়ামা লিয্যালিমীনা মিন আনসার)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করিয়েছ, অবশ্যই তাকে তুমি লাঞ্ছিত করেছ। প্রকৃতপক্ষে অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা আলে ইমরান : ১৯২-১৯৩)।

(১৬) সত্য গ্রহণের স্বীকারোক্তি ও উত্তম পরিণতি লাভের দোয়া

[হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যখন এ দোয়া সম্বলিত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলো তখন হুযূর (সা.) কাঁদতে-কাঁদতে নামায শুরু করেন। হযরত বেলাল (রা.) আঁ-হযরত (সা.)-কে নামাযের খবর দিতে এসে তাঁর এ রকম কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। তিনি (সা.) বললেন, আজ রাতে আমার ওপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় আর বলা হয়, খুব হতভাগ্য সেই লোক, যে এ আয়াত পড়ে অথচ এ সম্বন্ধে চিন্তা করে না। (তফসীর কুরতুবী, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩১)।]

رَبَّنَآ اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِيْ لِلْاِيْمَانِ اَنْ اٰمِنُوْا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا ۖ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْاَبْرَارِ ۝١٩٤ رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ۝١٩٥

(রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিয়াইঁয়্যুনাদী লিলঈমানি আন আমিনু বিরাব্বিকুম ফা আমান্না, রাব্বানা ফাগফিরলানা যুনুবানা ওয়া কাফ্ফির 'আন্না সায়্যিআতিনা ওয়া তাওয়াফ্ফানা মা'আল আব্‌রার- রাব্বানা ওয়া আতিনা মা ওয়া'আত্তানা 'আলা রাসূলিকা ওয়ালা তুখযিনা ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ্- ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ)

হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের দিকে (এই বলে) আহ্বান জানাতে শুনেছি-'তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' অতএব আমরা ঈমান এনেছি। অতএব হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের দোষ-ত্রুটি আমাদের কাছ থেকে দূরীভূত কর এবং আমাদেরকে পুণ্যবাণদের অন্তর্ভুক্ত করে মৃত্যু দাও।

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তোমার রসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, তা তুমি আমাদেরকে দাও এবং কিয়ামতের দিনে তুমি আমাদেরকে লাঞ্ছিত করো না। নিশ্চয় তুমি তোমার প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম কর না। (সূরা আলে ইমরান : ১৯৪-১৯৫)।

(১৭) অত্যাচারী জনপদবাসী থেকে রক্ষার দোয়া

[হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.)-এর মা প্রাথমিক যুগে ঈমান এনেছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, রসূল করিম (সা.)-এর মক্কা থেকে হিজরত করে যাওয়ার পরে আমি ও আমার মা মক্কার সেসব অসহায় শিশু ও নারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম যাদের কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ এসেছে। এরা হিজরতের জন্যে খোদার কাছে দোয়া করতেন। (বুখারী, কিতাবুত্ তফসীর)।]

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا ۝٧٦

(রাব্বানা আখরিজনা মিন হাযিহিল ক্বারইয়াতিয্ যালিমি আহলুহা-ওয়াজ 'আল্‌লানা মিল্লাদুন্‌কা ওয়ালিয়্যাওঁ ওয়াজআল্ লানা মিল্লাদুন্‌কা নাসীরা)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে এ শহর থেকে বের করে নাও, এর অধিবাসীরা বড়ই অত্যাচারী। আর তুমি নিজের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে কোন অভিভাবক নিযুক্ত কর এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নিযুক্ত কর। (সূরা নিসা : ৭৬)।

(১৮) নিজের অক্ষমতা ও অস্বীকারকারীদের বিষয়ে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার দোয়া

[হযরত মূসা (আ.) তাঁর জাতিকে পবিত্র ভূমির বিজয়ের সংবাদ দিয়ে এতে প্রবেশ করার আদেশ দেন। তখন তারা এটা অস্বীকার করে। তখন হযরত মূসা (আ.) এ দোয়া করেন। এর ফলে ৪০ বছরের জন্যে সেই পবিত্র ভূমি মূসা (আ.)-এর জাতির নিকট নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।]

رَبِّ اِنِّيْ لَاۤ اَمْلِكُ اِلَّا نَفْسِيْ وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ۝

(রাব্বি ইন্নী লা আমলিকু ইল্লা নাফসী ওয়া আখি ফাফরুক্ব বায়নানা ওয়া বায়নাল ক্বাওমিল ফাসিক্বীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমি আমার নিজের ও আমার ভাই ছাড়া কারও ওপর কোন কর্তৃত্ব রাখি না। সুতরাং তুমি আমাদের ও দুষ্কর্মপরায়ণ লোকদের মাঝে পার্থক্য করে দাও। (সূরা মায়েদা : ২৬)।

(১৯) ঈমানের স্বীকৃতি ও যোগ্যতা লাভের দোয়া

[কুরআন শরীফে এ দোয়া সেসব নিষ্ঠাবান ও পবিত্র দলের প্রতি আরোপিত হয়– যারা অন্য ধর্মের, বিশেষ করে খ্রিস্টানদের মাঝ থেকে সত্যকে চিনতে পেরে ঈমান আনে আর এ দোয়া করে।]

رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۝ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ اَنْ يُّدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(রাব্বানা আমান্না ফাকতুবনা মা'আশ্ শাহিদীন- ওয়ামা লানা লা নু'মিনু বিল্লাহি ওয়ামা জা-আনা মিনাল হাক্কি- ওয়া নাত্‌মা'উ আইঁয়ুদখিলানা রাব্বুনা মা'আল ক্বাওমিস্ সালিহীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি, সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীগণের অন্তর্ভুক্ত কর। আর আমাদের এমন কী কারণ রয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্‌র ওপর এবং যে সত্য আমাদের নিকট এসেছে এতে ঈমান আনব না? অথচ আমরা আন্তরিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করি, আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আমাদেরকে পুণ্যবান জাতির অন্তর্ভুক্ত করবেন। (সূরা মায়েদা : ৮৪-৮৫)।

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

(২০) রিয্‌ক বৃদ্ধি ও ঈদের আনন্দ লাভের দোয়া

[হযরত ঈসা (আ.)-এর হাওয়ারীদের চাপে তিনি খোদার কাছে দোয়া করলে আকাশ থেকে খাবার খাঞ্চা অবতীর্ণ হয় আর রিয্‌কে প্রবৃদ্ধি লাভ ঘটে। হযরত মসীহ্ (আ.)-এর দোয়ার জবাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, খাবার খাঞ্চা দিলাম কিন্তু এর অকৃতজ্ঞতা করলে কঠিন শাস্তি দেব।]

اللّٰهُمَّ رَبَّنَاۤ اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ ۚ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۝

(আল্লাহুম্মা রাব্বানা আনযিল 'আলায়না মাইদাতাম মিনাস্ সামাই তাকুনু লানা 'ঈদাল্লি আওওয়ালিনা ওয়া আখিরিনা ওয়া আয়াতাম মিন্‌কা ওয়ার্‌যুক্বনা ওয়া আন্‌তা খায়রুর রাযিক্বীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্! তুমি আকাশ থেকে আমাদের জন্যে খাবার ভরতি খাঞ্চা অবতীর্ণ কর যেন তা আমাদের প্রথম অংশের জন্য আর আমাদের শেষ অংশের জন্যে ঈদের কারণ হয় এবং (যেন তা) তোমার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হয়। (হে প্রভু!) তুমি আমাদেরকে রিযিক দান কর। প্রকৃতপক্ষে তুমিই উত্তম রিযিকদাতা। (সূরা মায়েদা : ১১৫)।

(২১) পথভ্রষ্ট জাতির জন্যে ক্ষমার দোয়া

[হযরত আবু যার (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একবার সম্পূর্ণ নামাযে এ দোয়া করেন। আমি আবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার তো সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ। আপনি কেন কেবল একটি আয়াতই পড়ছেন? রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আমার উম্মতের জন্যে দোয়া করছিলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী জবাব পেলেন? তিনি (সা.) বললেন, সে জবাব সম্বন্ধে যদি বলি তাহলে অধিকাংশ লোক নামায ছেড়ে দেবে।" (হযরত ইমাম সুয়ুতী প্রণীত আদ্ দুররুল মনসূর, ৩য় খন্ড, পৃ. ৭৫)। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও তাঁর অনুসারীদের জন্য এ দোয়া করেছিলেন।]

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

(ইনতু'আযযিবহুম ফা ইন্নাহুম 'ইবাদুকা-ওয়াইন তাগফিরলাহুম ফা ইন্নাকা আনতাল আযীযুল হাকীম)
অর্থঃ (হে আল্লাহ্) তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দিতে চাও তাহলে তারা তোমারই বান্দা। আর তুমি যদি তাদেরকে ক্ষমা করতে চাও তাহলে নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদা : ১১৯)।

(২২) পাপ থেকে মুক্তির দোয়া

[হযরত আদম (আ.) ঐশী আদেশ ভুলে গিয়ে 'নিষিদ্ধ গাছের স্বাদ নেন– যার সর্ম্পকে তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এ দোয়া শিখান। এর ফলে তিনি আল্লাহ্ তা'লার ক্ষমা লাভ করেন। (আদ দুররুল মনসূর, ৩য় খন্ড পৃ. ৭৫)।]

رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

(রাব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকূনান্না মিনাল খাসিরীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রাণের ওপর অত্যাচার করেছি। আর তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর ও আমাদের প্রতি কৃপা না কর তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা আ'রাফ : ২৪)।

(২৩) অত্যাচারী জাতির অন্তর্ভুক্ত বা সহযোগী না হওয়ার দোয়া

[পরিপূর্ণ মু'মিন যখন জান্নাতের পরে জাহান্নামের দৃশ্য দেখবে তখন এ দোয়া করবে]

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

(রাব্বানা লা তাজ'আলনা মা'আল ক্বাওমিয্ যালিমীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতির অন্তর্ভুক্ত করো না। (সূরা আ'রাফ : ৪৮)।

(২৪) সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করণের দোয়া

[হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, "হযরত শুআইব (আ.) জাতির হেদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে দোয়া করার সিদ্ধান্ত নেন। এর ফলে তাঁর জাতি ভূমিকম্পের কবলে পতিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। (তফসীর কুরতুবী, ৭ম খন্ড, পৃ. ২৫১)।]

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفٰتِحِيْنَ

(রাব্বানাফ্তাহ্ বায়নানা ওয়া বায়না ক্বাওমিনা বিল হাক্কি ওয়া আন্তা খায়রুল ফাতিহীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ও আমাদের জাতির মাঝে যথাযথভাবে মীমাংসা করে দাও। কেননা, তুমিই উত্তম মীমাংসাকারী। (সূরা আ'রাফ : ৯০)।

(২৫) ধৈর্য ও উত্তম পরিণাম লাভের দোয়া

[হযরত মূসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী যাদুকররা এ দোয়া করেছিলেন যখন ফেরাউন তাদেরকে দুঃখকষ্ট দিয়েছিল।]

رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ

(রাব্বানা আফরিগ্ আলায়না সাব্রাওঁ ওয়া তাওয়াফ্ফানা মুসলিমীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের প্রতি ধৈর্য অবতীর্ণ কর আর আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও। (সূরা আরাফ : ১২৭)।

(২৬) আল্লাহ্র দরবারে ফিরে যাওয়া ও পূর্ণ ঈমান প্রকাশের দোয়া

[হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্র জ্যোতির্বিকাশ সহ্য করতে না পেরে অচেতন হয়ে যান। চেতনা লাভ করে তিনি এ দোয়া করেন।]

سُبْحٰنَكَ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

(সুব্হানাকা তুবতু ইলায়কা ওয়া আনা আওওয়ালুল মু'মিনীন)
তুমি (সব ত্রুটি থেকে) পবিত্র। আমি তোমার দিকে ফিরে আসছি। আর আমি মু'মিনদের মাঝে প্রথম। (সূরা আরাফ : ১৪৪)।

(২৭) কৃপা ও ক্ষমতাপ্রাপ্তির দোয়া
[বনী ইসরাঈলের তওবার দোয়া]

لَئِنْ لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

(লা-ইল্লাম ইয়ারহামনা রাব্বুনা ওয়া ইয়াগফির লানা লানাকুনান্না মিনাল্ খাসিরীন)
আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের ওপর যদি কৃপা না করেন এবং আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবো। (সূরা আরাফ : ১৫০)।

(২৮) নিজের জন্য ও নিজ ভাইয়ের জন্য পরম কৃপাময়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা
[হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়া]

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِاَخِيْ وَاَدْخِلْنَا فِيْ رَحْمَتِكَ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

(রাব্বিগফিরলী ওয়ালিআখী ওয়া আদখিলনা ফী রাহ্মাতিকা ওয়া আন্তা আরহামুর রাহিমীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা কর। আর আমাদের উভয়কে তোমার কৃপার মাঝে প্রবিষ্ট কর। কেননা, তুমিই কৃপাময়দের মাঝে সর্বোত্তম। (সূরা আরাফ : ১৫২)।

(২৯) করুণা ও ক্ষমা বর্ষণের দোয়া
[হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়া]

اَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الْغٰفِرِيْنَ ﴿١٥٥﴾

(আন্‌তা ওয়ালীয়্যুনা ফাগফির লানা ওয়ারহামনা ওয়া আন্‌তা খায়রুল গাফিরীন)
তুমি আমাদের অভিভাবক, সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের ওপর কৃপা বর্ষণ কর। কেননা, তুমি ক্ষমাকারীদের মাঝে সর্বোত্তম। (সূরা আরাফ : ১৫৬)।

(৩০) ইহকাল ও পরকালের জন্য দোয়া
[নিজের জাতির জন্যে হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়া]

وَاكْتُبْ لَنَا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَآ اِلَيْكَ

(ওয়াকতুব্‌লানা ফী হাযিহিদ্দুন্‌য়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি ইন্না হুদনা ইলায়কা)
আর তুমি আমাদের জন্য এ দুনিয়াতে কল্যাণ নির্ধারিত কর এবং পরকালেও। নিশ্চয় আমরা তোমার দিকে (অনুতাপের সাথে) ফিরে এসেছি। (সূরা আরাফ : ১৫৭)

(৩১) পূর্ণ ভরসা ও ঐশী সন্তুষ্টির জন্য দোয়া

[হযরত আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন, "যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা ৭ বার এ দোয়া পড়বে আল্লাহ্ তা'লা দুনিয়া ও আখিরাতের তার সব দুঃখকষ্ট দূর করে দিবেন।"]

حَسْبِيَ اللّٰهُ ۖ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۗ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿١٢٩﴾

(হাসবিয়াল্লাহু-লা ইলাহা ইল্লাহু-আলায়হি তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আরশিল আযীম)
আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তাঁর প্রতিই আমি ভরসা করি। আর মহান আরশের অধিপতি তিনিই। (সূরা তওবা : ১২৯)।

(৩২) শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

[হযরত মূসা (আ.) তাঁর ওপর ঈমান আনয়নকারী যুবকদের এ দোয়া শিখান]

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

(রাব্বানা লা তাজ'আলনা ফিতনাতাল্লিল ক্বাওমিয্ যালিমীন-ওয়া নাজজিনা বিরাহমাতিকা মিনাল ক্বাওমিল কাফিরীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি অত্যাচারী জাতির জন্যে আমাদেরকে পরীক্ষার কারণ বানিও না; বরং তুমি নিজ কৃপায় আমাদেরকে অস্বীকারকারী জাতির (অত্যাচারী) হাত থেকে উদ্ধার কর। (সূরা ইউনূস : ৮৬-৮৭)।

(৩৩) অত্যাচারীদের ধ্বংসের জন্যে দোয়া

[হযরত মূসা (আ.)-এর এ দোয়া সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মূসা (আ.)-কে তাঁর দোয়ার কবুলিয়তের সংবাদ দেয়া হয়েছিল। দৃঢ় পদক্ষেপের জন্যও তাকে মূর্খদের অনুসরণ না করতে আদেশ দেয়া হয়েছিল।।

رَبَّنَآ اِنَّكَ اٰتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَاَهٗ زِيْنَةً وَّاَمْوَالًا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۙ رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِكَ ۚ
رَبَّنَا اطْمِسْ عَلٰٓى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٨٨﴾

(রাব্বানা ইন্নাকা আতায়তা ফির'আউনা ওয়া মালাআহু যীনাতাওঁ ওয়া আমওয়ালান ফিল হায়াতিদ্দুন্‌য়া-রাব্বানা লি ইউযিল্লু আন সাবীলিকা-রাব্বানাত্বমিস্ আলা আমওয়ালিহিম ওয়াশদুদ্ আ'লা কুলূবিহিম ফালা ইউমিনু হাত্তা ইয়ারাউল আযাবাল আলীম)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি ফেরাউন ও তার (জাতির) প্রধানগণকে এ পার্থিব জীবনের চাকচিক্য ও ধন-সম্পদ দিয়েছ, (ফলে) হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তারা (লোকদেরকে) তোমার পথ থেকে ভ্রষ্ট করেছে। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট কর আর তাদের অন্তরকে কঠিন করে দাও যাতে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে। (সূরা ইউনুস : ৮৯)।

(৩৪) নৌকায় চড়ার দোয়া

[হযরত নূহ (আ.) প্লাবনের সময় নৌকায় চড়তে গিয়ে ঐশী আদেশের মাধ্যমে এ দোয়া পড়েন। আর তাঁর নৌকা জুদী পাহাড়ের শীর্ষে নোঙ্গর করে। নবী করিম (সা.) বলেছেন, এ দোয়া আমার উম্মতকে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে নিরাপদ করবে। (তফসীর কুরতুবী, ৯ম খন্ড, পৃ. ৩৭)।

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَمُرْسٰىهَا ۗ اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٤١﴾

(বিসমিল্লাহি মাজরিহা ওয়া মুরসাহা-ইন্না রাব্বি লা গাফুরুর রাহীম)
আল্লাহ্‌র নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিশ্চয়ই আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, বারবার কৃপাকারী। (সূরা হূদ : ৪২)।

(৩৫) অনর্থক প্রশ্নাবলী থেকে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

[নূহ (আ.)-এর প্লাবনের সময় যখন হযরত নূহ (আ.)-এর পুত্র ধ্বংস হচ্ছিল তখন তিনি কাফির পুত্রের রক্ষার জন্য এ দোয়া করেন। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। কেননা নিজের অপকর্মের ফলে সে-ই (পুত্র) নূহ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল না বলে সাব্যস্ত হয়। এমতাবস্থায় হযরত নূহ (আ.) এ আকুতিপূর্ণ দোয়া করেন। এর ওপর আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তা ও কল্যাণমন্ডিত পথ-নির্দেশ শুনানো হয়।]

رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْـَٔلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِۦ عِلْمٌ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ الْخَٰسِرِينَ ﴿٤٨﴾

(রাব্বি ইন্নী আ'উযুবিকা আন আসআলাকা মা লায়সা লী বিহী ইলম- ওয়া ইল্লা তাগফিরলী ওয়া তারহামনী আকুম মিনাল খাসিরীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে এমন কিছু চাওয়া থেকে তোমার আশ্রয় চাই যে বিষয়ের (ভালমন্দ সম্বন্ধে) আমার কোন জ্ঞান নেই। আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি করুণা না কর তাহলে নিশ্চয় আমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা হূদ : ৪৮)।

(৩৬) মন্দের মোকাবেলায় শক্তি লাভ করার দোয়া

[মিশরের কর্মকর্তার স্ত্রী এবং অন্যান্য মহিলারা যখন হযরত ইউসুফ (আ.)-কে মন্দ কাজের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে চেষ্টা করছিল তখন হযরত ইউসুফ (আ.) এ আকুতিপূর্ণ দোয়া করেন। এ প্রসঙ্গে কুরআন শরীফে এসেছে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দোয়া কবুল করেন আর সেই মহিলাদের অপচেষ্টা থেকে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে নিরাপদে রাখেন।]

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَٰهِلِينَ ﴿٣٤﴾

(রাব্বিস্ সিজ্নু আহাব্বু ইলায়্যা মিম্মা ইয়াদ'উনানী ইলায়হি-ওয়া ইল্লা তাসরিফ'আন্নী কায়দাহুন্না আসবু ইলায়হিন্না ওয়া আকুম্ মিনাল্ জাহিলীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তারা আমাকে যে বিষয়ের দিকে ডাকছে এর তুলনায় আমার জন্যে জেলখানা অধিক পছন্দনীয়। আর তাদের চক্রান্তকে যদি তুমি আমার কাছ থেকে না দূর কর তাহলে আমি তাদের প্রতি ঝুঁকে যাব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (সূরা ইউসুফ : ৩৪)।

(৩৭) শাসন ক্ষমতা ও জ্ঞান লাভের পর কৃতজ্ঞতা স্বীকার

[হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কারাগার জীবনের পরে যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে শাসন ক্ষমতা দিলেন এবং তাঁর ভাই ও পিতা-মাতাকে পেয়ে তিনি তাদের সেবায় উপস্থিত হলেন তখন তিনি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এ দোয়া করেন।]

رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّۦ فِي الدُّنْيَا وَالْءَاخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّٰلِحِينَ ﴿١٠٢﴾

(রাব্বি ক্বাদ আতায়তানী মিনাল মুলকি ওয়া আল্লামতানী মিন তা'ভীলিল আহাদীস-ফাত্বিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি-আনতা ওয়ালিয়্যি ফিদ্দুন্য়া ওয়াল আখিরাহ্-তাওয়াফ্ফানী মুসলিমমাওঁ ওয়া আলহিকনী বিস্সালিহীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে অবশ্যই শাসনক্ষমতার কিছু দান করেছ আর আমাকে স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যাও শিখিয়েছ। হে আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! তুমিই আমার ইহকাল ও পরকালের অভিভাবক। তুমি আমাকে পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করো। (সূরা ইউসুফ : ১০২)।

(৩৮) রিযকের প্রাচুর্য ও পুণ্যবান সন্তান-সন্ততির জন্যে দোয়া

[হযরত ইবনে জারজ বলতেন, "ইব্রাহিমী উম্মত যেন সর্বদা ইবাদতে কায়েম থাকে। আল্লামা শা'বী বলতেন, হযরত নূহ ও ইবরাহীম (আ.) সাধারণ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের ক্ষমার জন্যে দোয়া করেন। এতে আমার যে আনন্দ লাগে তা সারা বিশ্বের ধন-সম্পদ লাভেও হতো না। (হযরত ইমাম সুয়ুতী (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ্ দুররুল মনসুর, ৪র্থ খন্ড, পৃ.৪৬)।]

رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٦﴾

(রাব্বিজ'আল হাযাল বালাদা আমিনাওঁ ওয়াজনুবনী ওয়া বানিয়্যা আনন্না'বুদাল আসনাম)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এ শহরকে (মক্কাকে) তুমি শান্তিধাম করো আর আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে প্রতিমার উপাসনা থেকে দূরে রেখো।

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٧﴾

(রাব্বি ইন্নাহুন্না আয্লালনা কাসীরাম মিনান্নাস-ফামান তাবি'আনী ফাইন্নাহু মিন্নী ওয়া মান আসানী ফাইন্নাকা গাফুরুর রাহীম)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তারা বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করে সে নিশ্চয় আমারই সাথী। আর যে আমার অবাধ্যতা করে সেক্ষেত্রে নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, বারবার কৃপাকারী।

رَبَّنَآ اِنِّيْٓ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْـِٕدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ۝٣٧

(রাব্বানা ইন্নী আসকানতু মিন যুররিয়্যাতি বিওয়াদিন গায়রি যী যার'ইন ইনদা বায়তিকাল মুহার্‌রাম-রাব্বানা লিইউকীমুস্ সালাতা ফাজ'আল আফইদাতাম মিনান্নাসি তাহভী ইলায়হিম ওয়ারযুক্‌হুম মিনাস সামারাতি লা'আল্লাহুম ইয়াশ্‌কুরূন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার সন্তানদের কয়েকজনকে তোমার সম্মানিত গৃহের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করালাম। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তারা যেন নামায প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং তুমি লোকদের হৃদয়কে এমন করে দাও যেন তারা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদেরকে ফল-ফলাদির খাদ্য-সামগ্রী দান কর যেন তারা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۗءِ ۝٣٨

(রাব্বানা ইন্নাকা তা'লামু মা নুখ্‌ফী ওয়া মা নু'লিন-ওয়ামা ইয়াখ্‌ফা আলাল্লাহি মিন শায়ইন ফিল আরযি ওয়ালা ফিস্ সামায়ি)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা যা গোপন করি ও আমরা যা প্রকাশ করি নিশ্চয় তুমি সবই অবগত। আর আল্লাহ্‌র নিকট থেকে কোন কিছু পৃথিবীতে ও আকাশসমূহে গোপন থাকতে পারে না।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۗءِ ۝٣٩

(আল্‌হামদুলিল্লাহিল্লাযী ওয়াহাবালী আলাল কিবারি ইসমা'ঈলা ওয়া ইসহাক্বা-ইন্না রাব্বি লাসামী'উদ্ দুআ)
সব প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে (আমার) বার্ধক্যে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন । নিশ্চয়ই আমার প্রভু-প্রতিপালক সদা দোয়া শুনে থাকেন।

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ڰ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۗءِ ۝٤٠

(রাব্বিজ'আলনী মুক্বীমাস্ সালাতি ওয়া মিন যুর্‌রিয়্যাতী-রাব্বানা ওয়া তাক্বাব্বাল দু'আ)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে ও আমার বংশধরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী করো। হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার দোয়া কবুল করো।

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝٤١

(রাব্বানাগ্ ফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকুমুল হিসাব)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! যে দিন হিসাব-নিকাশ অনুষ্ঠিত হবে সেদিন আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং মু'মিনগণকে ক্ষমা করো। (সূরা ইব্‌রাহীম : ৩৬-৪২)।

(৩৯) পিতা-মাতার জন্যে দোয়া

[নবী করিম (সা.) তাঁর নিজের ও উম্মতের জন্যে পিতামাতার উদ্দেশ্যে এ দোয়া নির্ধারণ করেছেন। হুযূর (সা.) বলতেন, সন্তান পিতামাতার অনুগ্রহের মূল্য দিতে পারে না– যতক্ষণ না পিতাকে গোলামী থেকে মুক্তি না করায়। (তফসীর কুরতুবী, ২০তম খন্ড, পৃ. ২৪৪)।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ۝٢٤

(রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদের উভয়ের প্রতি সেভাবে করুণা কর যেভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছিলেন। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৫)

(৪০) নতুন স্থানে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোয়া

[হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, "মদীনায় হিজরত করার কাছাকাছি সময় এ দোয়া সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মুত্তাফাকুন আলায়হি)। প্রত্যেক কাজের শুভ উদ্বোধন ও শুভ পরিসমাপ্তির ব্যাপারে এ দোয়া কার্যকরী।]

رَّبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝٨٠

(রাব্বি আদখিলনী মুদখালা সিদক্বীওঁ ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদক্বীওঁ-ওয়াজ'আল্‌নী মিল্লাদুন্‌কা সুলত্বানান্নাসীরা)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে উত্তমভাবে প্রবেশ করাও এবং আমাকে উত্তমভাবে বের করো। তোমার সন্নিধান থেকে আমার জন্যে পরম সাহায্যকারী ক্ষমতা দান কর। (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮১)।

(৪১) আল্লাহ্‌র বাণী শুনে ঐশী প্রতিশ্রুতির ওপর ঈমান আনয়ন

[জ্ঞানী মু'মিনদেরকে যখন আল্লাহ্‌র কালাম পড়ে শুনানো হয় তখন তারা আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় পড়ে এ দোয়া করতে থাকে]

سُبۡحٰنَ رَبِّنَاۤ اِنۡ کَانَ وَعۡدُ رَبِّنَا لَمَفۡعُوۡلًا ۝

(সুবহানা রাব্বিনা ইন কানা ওয়া'দু রাব্বিনা লামাফ'উলা)
আমাদের প্রভু-প্রতিপালক পবিত্র। নিশ্চয় আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে। (সূরা বনী ইসরাঈল : ১০৯)।

(৪২) সফলতা লাভের দোয়া

[হযরত ঈসা (আ.)-এর মান্যকারী আসহাবে কাহ্‌ফ– অর্থাৎ, গুহার অধিবাসী বলে কথিত যুবসম্প্রদায়ের দোয়া। তারা তৌহীদের হেফাযতের জন্য পর্বত গুহায় লুকিয়ে ছিলেন]

رَبَّنَاۤ اٰتِنَا مِنۡ لَّدُنۡکَ رَحۡمَۃً وَّ هَیِّئۡ لَنَا مِنۡ اَمۡرِنَا رَشَدًا ۝

(রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুন্‌কা রাহমাতাওঁ ওয়া হায়্যি'লানা মিন আমরিনা রাশাদা)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ দান কর আর আমাদেরকে আমাদের কাজকর্ম সম্পাদনে সঠিক পথের ব্যবস্থা করে দাও। (সূরা কাহ্‌ফ : ১১)।

(৪৩) পুণ্যবান সন্তান লাভের দোয়া

[হযরত যাকারিয়্যা (আ.) শেষ বয়সে পুণ্যবান সন্তান লাভের জন্যে এ দোয়া করেন।]

رَبِّ اِنِّیۡ وَهَنَ الۡعَظۡمُ مِنِّیۡ وَ اشۡتَعَلَ الرَّاۡسُ شَیۡبًا وَّ لَمۡ اَکُنۡۢ بِدُعَآئِکَ رَبِّ شَقِیًّا ۝

(রাব্বি ইন্নী ওয়াহানাল 'আযমু মিন্নী ওয়াশ্‌তা'আলার রা'সু শায়বাওঁ ওয়া লাম আকুম্ বিদুআ'ইকা রাব্বি শাক্বিয়্যা)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার অবস্থা এরূপ যে, আমার অস্থিগুলো দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং বার্ধক্যের দরুন আমার মাথার চুল উজ্জ্বল-শুভ্র হয়ে গেছে। কিন্তু হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তোমার কাছে দোয়া করে আমি কখনও ব্যর্থ হইনি।

وَ اِنِّیۡ خِفۡتُ الۡمَوَالِیَ مِنۡ وَّرَآءِیۡ وَ کَانَتِ امۡرَاَتِیۡ عَاقِرًا فَهَبۡ لِیۡ مِنۡ لَّدُنۡکَ وَلِیًّا ۝

(ওয়া ইন্নী খিফতুল মাওয়ালিয়া মিউঁ ওয়ারাঈ ওয়া কানাতিমরায়াতী আক্বিরান ফাহাবলী

মিল্লাদুন্‌কা ওয়ালিয়্যা)
আর নিশ্চয় আমি আমার (মৃত্যুর) পরে আমার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে ভয় করি এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকারী দান কর।

یَّرِثُنِیۡ وَ یَرِثُ مِنۡ اٰلِ یَعۡقُوۡبَ ٭ۖ وَ اجۡعَلۡهُ رَبِّ رَضِیًّا ۝

(ইয়ারিসুনী ওয়া ইয়ারিসু মিন আলি ইয়া'কুবা ওয়াজ'আলহু রাব্বি রাযিয়্যা)
যে আমার উত্তরাধিকারী হবে ও ইয়াকুবের বংশধরগণেরও সব কল্যাণের উত্তরাধিকারী হবে। আর হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তাকে তুমি (তোমার) সদা সন্তোষভাজন বানিও। (সূরা মরিয়ম : ৫-৭)।

(৪৪) তবলীগে সফলতার জন্যে দোয়া

[হযরত মূসা (আ.)-কে যখন ফেরাউনের দরবারে গিয়ে ঐশী ফরমান পৌঁছানোর আদেশ দেয়া হলো তখন তিনি এ দোয়া করেন। হযরত আসমা বিনতে উমায়েস বর্ণনা করেন, " আমি রসূল করিম (সা.)-কে সামরীর পাহাড়ের পাদদেশে এ দোয়া করতে শুনেছি। তিনি (সা.) খোদার কাছে এ আবেদন করছিলেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সেই দোয়া করছি যা আমার ভাই মূসা করেছিলেন। (হযরত ইমাম সুয়ূতী (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ্ দুররুল মনসূর, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৯৫)।]

رَبِّ اشۡرَحۡ لِیۡ صَدۡرِیۡ ۝ وَ یَسِّرۡ لِیۡۤ اَمۡرِیۡ ۝ وَ احۡلُلۡ عُقۡدَۃً مِّنۡ لِّسَانِیۡ ۝ یَفۡقَهُوۡا قَوۡلِیۡ ۝

(রাব্বিশ্‌রাহলী সাদরী-ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী-ওয়াহ্‌লুল উক্বদাতাম মিল লিসানি ইয়াফক্বাহূ ক্বাওলী)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও। আর আমার দায়িত্বকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও যেন তারা আমার কথা সহজে বুঝতে পারে। (সূরা ত্বা-হা : ২৬-২৯)।

(৪৫) জ্ঞান বৃদ্ধির দোয়া

[নিজ সিদ্ধান্তগুলোতে ঐশী জ্যোতি দেয়ার জন্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এ দোয়া শিখানো হয়েছে।]

رَّبِّ زِدۡنِیۡ عِلۡمًا ۝

(রাব্বি যিদ্‌নী ইলমান)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও। (সূরা ত্বা-হা : ১১৫)।

(৪৬) রোগ থেকে মুক্তি লাভের দোয়া

[হযরত আইউব (আ.)-এ দোয়ার মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেন।]

اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

(আন্নী মাস্‌সানিয়ায্ যুর্‌রু ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমীন)
(হে আল্লাহ্) ভয়ানক যন্ত্রণা আমাকে জর্জরিত করেছে। আর তুমি কৃপাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপাকারী। (সূরা আম্বিয়া : ৮৪)।

(৪৭) ইসমে আযম (মহান নাম)

[হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বর্ণনা করেন,"নবী করিম (সা.) বলেছেন, হযরত ইউনুস (আ.) মাছের পেটে যে দোয়া করেছিলেন কোন মুসলমান যদি এ দোয়া করে তখন তা কবুল হবে। (তফসীরে কুরতুবী, ১১তম খন্ড, পৃ. ৩৩৪)।]

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

(লা ইলাহা ইল্লা আন্‌তা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায্ যালিমিন)
তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। নিশ্চয় আমি (নিজের প্রাণের ওপর) অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। (সূরা আম্বিয়া : ৮৮)।
[টীকা: আঁ-হযরত (সা.) হযরত ইউনুস (আ.)-এর এ দোয়াকে ইসমে আযম আখ্যায়িত করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয়।]

(৪৮) একাকীত্ব থেকে মুক্তি ও উত্তম প্রজন্ম লাভের জন্যে দোয়া

[আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যাকারিয়্যা যখন এ দোয়া করল তখন আমরা তা কবুল করি এবং তার স্ত্রীকে সুস্থ করে ইয়াহিয়াকে দান করি।]

رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْوٰرِثِيْنَ

(রাব্বি লা তাযারনী ফারদাওঁ ওয়া আন্‌তা খায়রুল ওয়ারিসীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে একা ছেড়ে দিও না। আর তুমিই উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে সর্বোত্তম। (সূরা আম্বিয়া : ৯০)।

(৪৯) সহায়তা ও সঠিক মীমাংসা লাভের দোয়া

[হযরত কাতাদাহ্ (রা.) বলেন, আঁ-হযরত (সা.)-কে যখন যুদ্ধে যেতে হতো তখন তিনি বিশেষভাবে এ দোয়া করতেন। (তফসীর আদ্ দুররুল মনসূর, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৪২।]

رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ ؕ وَ رَبُّنَا الرَّحْمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

(রাব্বিহ্‌কুম বিল হাক্কি-ওয়া রাব্বুনার রাহ্‌মানুল্ মুসতা'আনু আলা মা তাসিফুন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি সত্য-সঠিক মীমাংসা কর। আর পরম করুণাময় অযাচিত-অসীম দানকারী হলেন আমাদের প্রভু-প্রতিপালক, তোমাদের (মিথ্যা) বর্ণনার বিরুদ্ধে যাঁর সাহায্য চাওয়া হয়। (সূরা আম্বিয়া : ১১৩)

(৫০) সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ওপর বিজয় লাভ করার দোয়া

[হযরত নূহ (আ.)-এর এ দোয়ার ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নৌকার মাধ্যমে প্লাবন থেকে উদ্ধার করেন।]

رَبِّ انْصُرْنِىْ بِمَا كَذَّبُوْنِ

(রাব্বিন্‌সুরনী বিমা কায্‌যাবুন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সাহায্য কর, কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছে। (সূরা মু'মিনূন : ২৭)।

(৫১) কল্যাণ অবতরণের দোয়া

[হযরত নূহ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা এ নির্দেশ দিলেন, যখন নৌকায় চড়ে বসবে তখন প্রথমে পড়, **"আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী নাজ্জায়না মিনাল্ ক্বাওমিয্ যালিমীন"–** অর্থাৎ, সব প্রশংসা সেই সত্তার যিনি আমাদেরকে অত্যাচারী জাতি থেকে উদ্ধার করেছেন– পরে এ দোয়া পড়। হযরত আলী (রা.) মসজিদে প্রবেশ করার সময়েও এ দোয়া সম্বলিত আয়াত পড়তেন। (তফসীর কুরতুবী, ১২তম খন্ড, পৃ. ১২০)।]

رَّبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبٰرَكًا وَّ اَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

(রাব্বি আনযিল্‌নী মুনযালাম মুবারাকাওঁ ওয়া আন্‌তা খায়রুল মুনযিলীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে এমন অবস্থায় অবতরণ করাও যেন আমার ওপর প্রচুর কল্যাণ বর্ষিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তুমিই হচ্ছো অবতরণকারীগণের মাঝে সর্বোত্তম। (সূরা মু'মিনূন : ৩০)।

(৫২) যালিমের শাস্তি থেকে সুরক্ষার দোয়া

[নবী করিম (সা.)-কে বিজয়ের ওয়াদা দেয়ার সাথে-সাথে এ দোয়াও শিখানো হয়েছে যেন তাঁর (সা.) জাতির সাথে মার্জনার আচরণ করা হয়।]

رَّبِّ اِمَّا تُرِيَنِّيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ فِي الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

(রাব্বি ইম্মা তুরিয়ান্নী মা ইউ'আদুন- রাব্বি ফালা তাজ'আলনী ফিল ক্বাওমিয্ যালিমীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি (আমার জীবদ্দশায়) আমাকে যদি তা দেখিয়ে দিতে যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে, হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তখন তুমি আমাকে অত্যাচারী জাতির অন্তর্ভুক্ত করো না। (সূরা মু'মিনূন : ৯৪-৯৫)।

(৫৩) শয়তানের কু-প্ররোচনা থেকে দূরে থাকার দোয়া

[হযরত আমর বিন সাঈদ (রা.) বর্ণনা করেন," নবী করিম (সা.) ঘুমাবার সময় পড়ার জন্য কিছু দোয়া আমাদের শিখিয়েছিলেন। শয়তানী প্ররোচনা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য এ দোয়া পড়তে হয়। (হযরত ইমাম সুয়ূতী (রহ.) প্রণীত আদ্ দুররুল মনসুর, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৪)।]

رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۙ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ

(রাব্বি আ'উযুবিকা মিন হামাযাতিশ্ শায়াত্বীন-ওয়া আ'উযুবিকা রাব্বি আইঁয়াহ্যুরূন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি শয়তানের সব কু-প্ররোচনা থেকে তোমার আশ্রয় চাচ্ছি।
আর হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার কাছে তাদের উপস্থিত হওয়া থেকেও তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। (সূরা মু'মেনূন : ৯৮-৯৯)।

(৫৪) মিথ্যাবাদীদের মিথ্যারোপের মোকাবেলায় মু'মিনদের ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

[কাফির ও আল্লাহ্ তা'লার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীরা যখন কিয়ামতের দিনে অপরাধ স্বীকার করবে তখন আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, দূর হয়ে যাও! আর আমার সাথে কোন কথা বলবে না। কেননা, তোমরা আমার সেই মু'মিন বান্দাদেরকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেছিলে যারা এ দোয়া পড়তো। তাদের ধৈর্যের কারণে আজ আমি তাদেরকে অনেক প্রতিদান দিব।]

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

رَبَّنَاۤ اٰمَنَّا فَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

(রাব্বানা আমান্না ফাগফির্লানা ওয়ারহামনা ওয়া আন্তা খায়রুর রাহিমীন)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি। অতএব তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর আর আমাদের প্রতি কৃপা কর। প্রকৃতপক্ষে কৃপাকারীদের মাঝে তুমি সর্বোত্তম। (সূরা আল্ মুমিনূন : ১১০)।

(৫৫) ক্ষমা ও করুণা লাভের জন্য দোয়া

[হযরত আবু বকর (রা.) নামায পড়ার জন্য আঁ-হযরত (সা.)-এর কাছে কোন দোয়া শিক্ষা দেয়ার জন্য আবেদন করেন। তখন হুযূর (সা.) এ দোয়া শিখান। এতে বিশেষভাবে খোদার কৃপা ও ক্ষমা চাওয়া হয়েছে। আর সেই দোয়া এটাই। (তফসীর আদ্ দুররুল মনসূর, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৮)।]

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ

(রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আন্তা খায়রুর্ রাহিমীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! ক্ষমা কর ও কৃপা কর। প্রকৃতপক্ষে তুমি কৃপাকারীদের মাঝে সর্বোত্তম। (সূরা আল্ মু'মিনূন : ১১৯)।

(৫৬) দোযখের শাস্তি থেকে সুরক্ষার দোয়া

[ইবাদুর রহমান তথা আল্লাহ্র বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এরা রহমান খোদার বান্দা যারা রাতে নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের সকাশে দাঁড়িয়ে ইবাদতে রাত কাটায় এবং ঐশী ক্রোধ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্যে দোয়া করে।]

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا

(রাব্বানা আসরিফ আন্না আযাবা জাহান্নামা-ইন্না আযাবাহা কানা গারামা)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপর থেকে দোযখের আযাব (শাস্তি) অপসারিত করো। নিশ্চয় সেটির আযাব সর্বনাশা। (সূরা ফুরকান : ৬৬)।

(৫৭) পবিত্র জীবন সঙ্গী ও সন্তান-সন্ততি লাভ ও তাদের সংশোধনের জন্যে দোয়া

[কুরআন শরীফে আল্লাহ্র বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ এসেছে, তারা সর্বদা এ দোয়া করে থাকে।]

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

(রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়্যাতিনা কুর্‌রাতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ'আলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্নিগ্ধতা দান কর। এবং আমাদেরকে মুত্তাকীগণের (খোদা-ভীরুগণের) ইমাম (নেতা) বানাও। (সূরা ফুরকান : ৭৫)।

(৫৮) পুণ্যবানদের মাঝে অন্তর্ভুক্তি, সত্য কথা বলা ও পিতার জন্য দোয়া

[নবী করিম (সা.) বলতেন, মানুষ ওযূ করে আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ইবরাহীম (আ.)-এর এ দোয়া করলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় দান করবেন, তার রোগকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বানিয়ে দেবেন আর তাকে সৌভাগ্যের জীবন ও শহীদের মৃত্যু দান করবেন। সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান পাপ হলেও মাফ করে দেবেন। তাকে মীমাংসার শক্তি ও সাহস দিবেন। আর দুনিয়াতে তার স্মরণ অবশিষ্ট রাখা হবে। (হযরত ইমাম সুয়ুতী (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ্ দুররুল মনসূর, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৮৯)।]

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ

وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ

(রাব্বি হাবলী হুকমাওঁ ওয়া আলহিক্বনি বিস্‌সালিহীন- ওয়াজ'আল্ লী লিসানা সিদক্বীন ফিল আখিরীন- ওয়াজ'আলনী মিওঁ ওরাসাতি জান্নাতিন্না'ঈম- ওয়াগফিরলি আবী ইন্নাহু কানা মিনায্‌যাল্লীন- ওয়ালা তুখযিনী ইয়াওমা ইউব'আসূন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে হিকমত (প্রজ্ঞা) দান কর ও পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত কর। আর পরবর্তীদের মাঝে আমার জন্যে প্রকৃত (স্থায়ী) খ্যাতি প্রতিষ্ঠা কর। আর তুমি আমাকে কল্যাণপূর্ণ জান্নাতের উত্তরাধিকারীগণের অন্তর্ভুক্ত কর। আমার পিতাকে ক্ষমা কর। কারণ সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত। আর যেদিন পুনরায় (জীবিত করে) উঠানো হবে সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করো না। (সূরা শোআরা : ৮৪-৮৮)।

(৫৯) সত্যের বিজয়ের জন্য দোয়া

[হযরত নূহ (আ.) জাতির বিরোধিতায় ক্লান্ত হয়ে সিদ্ধান্তকারী নিদর্শন চান। এতে তিনি নিজের ও তাঁর জামাতের মুক্তির দোয়া করেন। আল্লাহ তা'লা বলেন, আমরা এ দোয়া কবুল করেছি এবং তার জাতিকে প্লাবন দিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছি আর তাকে ও তার

অনুসারীদের নৌকায় উদ্ধার করেছি।]

رَبِّ اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّ نَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

(রাব্বি ইন্না ক্বাওমী কায্‌যাবূন-ফাফতাহ্ বায়নী ওয়া বায়নাহুম ফাতহাওঁ ওয়া নাজ্‌জিনী ওয়ামাম মা'ইয়া মিনাল মু'মিনীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় আমার জাতি আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং তুমি আমার ও তাদের মাঝে সুস্পষ্ট মীমাংসা কর। আর আমাকে ও আমার সাথী মু'মিনদের (শত্রুর অনিষ্ট থেকে) উদ্ধার কর। (সূরা শোআরা : ১১৮-১১৯)।

(৬০) বিরুদ্ধবাদীদের দুষ্কর্ম থেকে রক্ষার দোয়া

[হযরত লূত (আ.)-এর জাতি নসীহতের উত্তরে যখন তাঁকে এ বলে ধমক দিল, হে লূত! তুমি যদি বিরত না হও তাহলে তোমাকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে, তখন তিনি এ দোয়া করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা এ দোয়া কবুল করে লূত ও তার পরিবারকে (তাঁর স্ত্রী ছাড়া) মুক্তি দেই। আর সেই জাতিকে ধ্বংস করে দিই।]

رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ

(রাব্বি নাজজিনী ওয়া আহ্‌লী মিম্মা ইয়া'মালূন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে সে-সব কার্যকলাপ থেকে রক্ষা কর– যা তারা করছে। (সূরা শোআরা : ১৭০)

(৬১) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ও সৌভাগ্য লাভের দোয়া

[হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সেনাবাহিনী যখন 'নামল' উপত্যকায় পৌঁছেন তখন সে জাতি ভয়ে তাদের ঘরে ঢুকে যায়। এ ঘটনা দেখে হযরত সুলায়মান (আ.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ দোয়া করেন।]

رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ

صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

(রাব্বি আওযি'নী আন্ আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আন'আমতা আলাইয়্যা ওয়া আলা ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারযাহু ওয়া আদখিলনী বিরাহ্‌মাতিকা ফী

ইবাদিকাস্ সালিহীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৌভাগ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই কল্যাণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার মাতা-পিতাকে দিয়েছ। আর আমি এমন পুণ্য কাজ করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। (হে প্রভু-প্রতিপালক!) আর তুমি তোমার নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার পুণ্যবান দাসগণের অন্তর্ভুক্ত কর। (সূরা নামল : ২০)।

(৬২) আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণের প্রতি শান্তির দোয়া

[আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাগণের জন্যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এ দোয়া শিখানো হয়েছে]

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

(আল্‌হামদুলিল্লাহি ওয়া সালামুন আলা 'ইবাদিহিল্লাযীনাস্‌ত্বাফা)
সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র আর সদা শান্তি বর্ষিত হয় তাঁর সেসব বান্দাদের ওপর যাদেরকে তিনি মনোনীত করেন। (সূরা নামল : ৬০)।

(৬৩) অন্যায় স্বীকার এবং ক্ষমার জন্য আবেগ

[হযরত মূসা (আ.) অনিচ্ছাসত্ত্বেও এক ফেরাউনীর হাত থেকে এক বনী ইসরাঈলকে বাঁচাতে গিয়ে এক ঘুষি মারেন। এতে সে মারা যায়। পরে তিনি এ দোয়া করেন। আর আল্লাহ্ তাঁকে মাফ করে দেন।]

رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْ لِيْ

(রাব্বি ইন্নী যালামতু নাফ্‌সী ফাগফিরলী)
হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি আমার আত্মার ওপর অত্যাচার করেছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। (সূরা কাসাস : ১৭)

(৬৪) হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়া

[হযরত মূসা (আ.)-এর অনিচ্ছা সত্ত্বেও এক ব্যক্তি তার হাতে মারা যায়। এর ওপর তিনি ক্ষমার জন্যে দোয়া করেন। আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমার সংবাদ দেন। এরপরে হযরত মূসা (আ.) এ দোয়া করেন।]

رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ

(রাব্বি বিমা আন'আমতা আলাইয়্যা ফালান্ আকুনা যাহীরাল লিল মুজরিমীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! যেহেতু তুমি আমাকে অনুগ্রহ করেছ তাই আমিও অপরাধীদের কাউকে ভবিষ্যতে সাহায্য করব না। (সূরা কাসাস : ১৮)।

(৬৫) অত্যাচারী জাতি থেকে রক্ষার দোয়া [হযরত মূসা (আ.)-এর দোয়া]

رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

(রাব্বি নাজ্‌জিনী মিনাল ক্বাওমিয যালিমীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে অত্যাচারী জাতি থেকে উদ্ধার কর। (সূরা কাসাস : ২২)।

(৬৬) কল্যাণ ভিক্ষার বিনীত দোয়া

[হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন, এ দোয়ার সময় হযরত মূসা (আ.)-এর অবস্থা অভাবে এমন হয়েছিল যে, খেজুরের টুকরারও মুখাপেক্ষী ছিলেন। (হযরত ইমাম সুয়ুতি (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ্ দুররুল মনসূর)। পরে খোদা কেবল তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাই করলেন না বরং ঘরবাড়ি ও বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করে দেন।]

رَبِّ اِنِّيْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

(রাব্বি ইন্নী লিমা আনযাল্‌তা ইলায়্যা মিন খায়রীন ফাক্বীর)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি যে কোন কল্যাণই আমাকে ভূষিত কর, আমি অবশ্যই এর ভিখারী। (সূরা কাসাস : ২৫)।

(৬৭) শত্রুর ওপর বিজয় লাভের দোয়া

[হযরত লূত (আ.) নিজের জাতিকে যখন কুকর্ম থেকে ফিরে যাবার জন্য তাগিদ করছিলেন তারা উত্তরে বলল, তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে আযাব নিয়ে এস। এর প্রেক্ষিতে হযরত লূত (আ.) এ দোয়া করেন।]

رَبِّ انْصُرْنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ

(রাব্বিনসূরনী আলাল্ ক্বাওমিল মুফসিদীন)
হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী জাতির বিরুদ্ধে সাহায্য কর। (সূরা আনকাবূত : ৩১)।

(৬৮) শিথিলতা দূর করণার্থে সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করার দোয়া

[হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন ব্যক্তি সকালে এ আয়াত পাঠ করলে আল্লাহ্ তা'লা সে দিন তার শিথিলতা দূর করে দেন এবং সন্ধ্যায় এ দোয়া করলে রাতের শিথিলতা দূর করে দেন। (আবু দাউদ)।

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝

(ফা সুব্হানাল্লাহি হীনা তুমসূনা ওয়াহীনা তুসবিহুন)

আর তোমরা যখন সন্ধ্যায় প্রবেশ কর এবং ভোরে প্রবেশ কর তখন তোমরা আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝

(ওয়া লাহুল হাম্‌দু ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি ওয়া 'আশিয়্যাওঁ ওয়া হীনা তুযহিরূন)

আর আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে সব প্রশংসা তাঁরই, আর রাতেও এবং তোমরা যখন দুপুরে প্রবেশ কর তখনও (প্রশংসা তাঁরই)।

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

(ইউখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মায়্যিতি ওয়া ইউখরিজুল মায়্যিতা মিনাল হায়্যি ওয়া ইউহিল্ আর্‌যা বা'দা মাওতিহা-ওয়া কাযালিকা তুখরাজুন)

তিনি জীবিতকে মৃত হতে বের করেন এবং মৃতকে জীবিত হতে বের করেন। আর পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আর এভাবেই তোমাদেরকে (জীবিত করে) বের করা হবে। (সূরা রূম : ১৮-২০)।

(৬৯) পুণ্যবান সন্তান লাভের জন্য দোয়া

[হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দোয়া। তাঁর মিশনকে জারী রাখার জন্যে তিনি পুণ্যবান সন্তান লাভের জন্য দোয়া করেন। ফলে তিনি সন্তান লাভের শুভ সংবাদ লাভ করেন।]

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝

(রাব্বি হাব্‌লী মিনাস্ সালিহীন)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে পুণ্যবান সন্তান দান কর। (সূরা সাফ্‌ফাত: ১০১)

(৭০) সৎকর্মের মূল্যায়নের জন্য দোয়া

[আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তিই নামাযের পরে বা মজলিস থেকে উঠতে গিয়ে এ আয়াত পড়ে আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন তার আমলের ওজন ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে ঝুলি ভরে দান করবেন। (হযরত ইমাম সুয়ুতি {রহ.} প্রণীত তফসীর আদ্ দুররুল মনসূর, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৯৯)]

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۝
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

(সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইয্‌যাতি আম্মা ইয়াসিফুন-ওয়া সালামুন আলাল্ মুরসালীন-ওয়াল্‌হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন)

তারা যা বর্ণনা করছে সম্মান ও শক্তির অধিকারী তোমার প্রভু-প্রতিপালক এ থেকে পবিত্র।

আর সব রসূলদের ওপর সদা শান্তি বর্ষিত হোক। আর সব প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহ্রই। (সূরা সাফ্‌ফাত : ১৮১-১৮৩)।

(৭১) হযরত সুলায়মান (আ.)-এর একটি দোয়া

[হযরত সুলায়মান (আ.)-এর এ দোয়া কবুল হয়েছে। আর বিরাট-বিরাট বিদ্রোহী বাহিনী তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। হযরত সালমাহ্ বিন আলকা (রা.) বলেন, "নবী করিম (সা.) যখন কোন দোয়া করতেন তখন এতে আল্লাহ্ তা'লার 'ওয়াহ্হাব' সিফতের উল্লেখ করতেন ও বিশেষভাবে এ কথা বলতেন, **'সুবহানা রাব্বিয়াল ওয়াহ্হাব'–** অর্থাৎ, পবিত্র আমার প্রভু-প্রতিপালক পরম দাতা। (হযরত ইমাম সুয়ুতি (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ্ দুররুল মনসূর, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২১৩)।]

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

(রাব্বিগফিরলী ওয়াহাব্‌লী মুলকাল্ লা ইয়াম্‌বাগী লিআহাদিম মিম বা'দি-ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর। আর আমাকে এমন একটি সাম্রাজ্য দান কর যেন আমার পরে অযোগ্য কেউ এর মালিক না হয়। নিশ্চয় তুমিই পরম দাতা। (সূরা সাদ : ৩৬)।

(৭২) আল্লাহ্‌র দরবারে মীমাংসা প্রার্থনা

[হযরত সাঈদ বিন হাসনা এ দোয়া প্রসঙ্গে বলতেন, আমি এমন একটি আয়াত সম্বন্ধে জানি– যা পড়ে খোদার কাছে যা চাওয়া যায় তা-ই দেয়া হয়। রসূল করিম (সা.) এ দোয়া দ্বারা তাহাজ্জুদ আরম্ভ করতেন। আর এর আগে পড়তেন **'আল্লাহুম্মা রাব্বি জিবরীলা ওয়া মিকালা ওয়া ইসরাফিলা'–** অর্থাৎ, আল্লাহ্ আমার এবং জিব্রাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফিলের প্রভু-প্রতিপালক। (তফসীর কুরতুবী, ১৫ খন্ড, পৃ. ২৬৫)।

اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

(আল্লাহুম্মা ফাতিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরযি আলিমাল গায়বি ওয়াশ্ শাহাদাতি আন্‌তা তাহকুমু বায়না ইবাদিকা ফী মা কানু ফীহি ইয়াখতালিফুন)
হে আল্লাহ্! আকাশসমূহ ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞাতা, তুমিই তোমার বান্দাদের মাঝে সেসব বিষয়ে মীমাংসা করবে যে সম্বন্ধে তারা মতভেদ করছে। (সূরা যুমার : ৪৭)।

(৭৩) দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া এবং জান্নাতী হওয়ার জন্যে দোয়া এবং মু'মিনদের পক্ষে আরশের ফিরিশ্‌তাদের আকুতিপূর্ণ দোয়া

[রসূল করিম (সা.)-এর সাহাবারা (রা.) বর্ণনা করেন,"আমরা একত্র হয়ে আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন আমাদের মাঝে এলেন আর বললেন, আমিও তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্যের একটি কথা বলছি। এরপরে তিনি আরশের বহনকারী ফিরিশ্‌তাদের সম্বন্ধে বললেন, এরা খোদা তা'লার মহান সৃষ্টি। (হযরত ইমাম সুয়ুতি (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ্ দুররুল মনসূর, ৫ খন্ড, পৃ. ৩৪৭)।

رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ

(রাব্বানা ওয়াসি'তা কুল্লা শায়ইর রাহমাতাওঁ ওয়া ইলমান ফাগফির লিল্লাযীনা তাবু ওয়াত্তাবা'উ সাবিলাকা ওয়াকিহিম আযাবাল জাহীম)

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি প্রত্যেক বস্তুকে নিজ করুণা ও জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছ। সুতরাং যারা তওবা করে এবং তোমার পথ অনুসরণ করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও দোযখের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।

رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(রাব্বানা ওয়া আদখিলহুম জান্নাতি আদনিনিল্লাতি ওয়া'আদতাহুম ওয়া মান সালাহা মিন আবায়িহিম ওয়া আযওয়াজিহিম ওয়া যুররিয়্যাতিহিম- ইন্নাকা আনতাল আযীযুল হাকীম)
হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবিষ্ট কর, যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাদেরকে দান করেছ। আর তাদের পূর্বপুরুষ, তাদের সহধর্মিণী, তাদের সন্তান-সন্ততিগণের মাঝে যারা পুণ্যবান তাদেরকেও (জান্নাতে প্রবিষ্ট কর)। নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

(ওয়াকিহিমুস্ সাইয়্যিআতি ওয়া মান তাক্বিস সাইয়্যিআতি ইয়াওমায়িযিন ফাক্বাদ রাহিমতাহু- ওয়া যালিকা হুয়াল ফাওযুল আযীম)
আর তুমি তাদেরকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে রক্ষা কর। প্রকৃতপক্ষে তুমি সেদিনের অনিষ্টসমূহ থেকে যাকে রক্ষা করবে তার প্রতি অবশ্যই কৃপা করবে। আর এটাই তো প্রকৃতপক্ষে মহা সফলতা। (সূরা আল্ মু'মিন : ৮-১০)।

(৭৪) প্রত্যেক কাজকে আল্লাহ্‌র ওপর সোপর্দ করার স্বীকৃতি

[হযরত মূসা (আ.)-এর সময়ের এক মু'মিন ব্যক্তির দোয়া]

وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ

(ওয়া উফাওভিযু আম্‌রি ইলাল্লাহ্-ইন্নাল্লাহা বাসীরুম বিল 'ইবাদ)
আর আমি আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে উত্তমভাবে দেখছেন। (সূরা মু'মিন : ৪৫)।
পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর জীবিত করেন। আর এভাবেই তোমাদেরকে (জীবিত করে) বের করা হবে। (সূরা রূম : ১৮-২০)।

(৭৫) যান-বাহনে চড়ার দোয়া

[নবী করিম (সা.) যানবাহনে চড়ার সময় এ দোয়া পড়তেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, আবু দাউদ)]

سُبْحٰنَ الَّذِیْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِیْنَ ۝ وَاِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝

(সুবহানাল্লাযী সাখ্খারা লানা হাযা ওয়ামা কুন্না লাহু মুক্বরিনীন-ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন)

তিনি পবিত্র যিনি একে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন, অথচ আমরা একে আয়ত্তাধীন করতে সক্ষম ছিলাম না।

আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পানে ফিরে যাব। (সূরা যুখরুফ : ১৪-১৫)।

(৭৬) ঐশী কল্যাণ লাভে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

[এক বর্ণনায় উল্লেখ আছে, এ দোয়া প্রার্থনাকারীদের মাঝে প্রথম ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। তাঁর দোয়া এভাবে কবুল হয়েছে যে, তাঁর পিতামাতা, ভাই ও সব সন্তান ইসলাম কবুল করেছিলেন। (হযরত ইমাম সুয়তি (রহ.) প্রণীত তফসীর আদ্ দুররুল মনসূর, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪১)।]

رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلٰی وَالِدَیَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ۚ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝

(রাব্বি আওযি'নী আন্ আশকুরা নি'মাতাকাল্লাতী আন'আমতা আলায়্যা ওয়া 'আলা ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া আন আ'মালা সালিহান তারযাহু ওয়া আসলিহ্ লী ফী যুররিয়্যাতি ইন্নী তুব্তু ইলায়কা ওয়া ইন্নী মিনাল্ মুসলিমীন)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৌভাগ্য দান কর, যাতে আমি তোমার সেই কল্যাণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি– যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দিয়েছ। আর আমি যেন এমন পুণ্যকাজ করতে পারি যাতে তুমি সন্তুষ্ট হও। আর আমার জন্য আমার বংশধরগণকে সংশোধন কর। নিশ্চয় আমি তোমার সমীপে বিনত হয়েছি এবং নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা আহ্কাফ : ১৬)।

(৭৭) ঐশী সাহায্যের দোয়া

[হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি যখন তাঁকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং তারা সীমালংঘন করে তাঁর কঠোর বিরোধিতা করতে শুরু করেছিল তখন তিনি এ

দোয়া করেন।]

اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۝

(আন্নী মাগলূবুন ফানতাসির)

(হে আমার প্রভু-প্রতিপালক!) নিশ্চয় আমি পরাভূত। অতএব তুমি (আমার পক্ষ থেকে) প্রতিশোধ নাও। (সূরা ক্বামার : ১১)।

(৭৮) বিদ্বেষ থেকে রক্ষা পাওয়া ও পুণ্যবানদের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির দোয়া

[এক সাহাবী রসূল করিম (সা.)-এর সাথে নামায পড়লেন। হুযূর (সা.) বললেন, এ ব্যক্তি জান্নাতী। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-এর মনে প্রশ্ন জাগল, কী করে সে জান্নাতী হলো! তাই তিনি গিয়ে সেই লোকের বাড়িতে মেহমান হলেন। সেই লোক তাঁকে খুব আদর যত্ন করলেন। ইবনে উমর (রা.) বললেন, আমি রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়েছি অথচ সে ঘুমিয়ে কাটিয়েছে। সকালে আমি নফল রোযা রেখেছি, কিন্তু সে রাখেনি। আমি তাকে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম, তাহলে তুমি এমন কি কাজ করেছ যাতে তোমার জান্নাতের সৌভাগ্য হয়েছে? সেই লোকটি বললেন, তুমি রসূল করিম (সা.)-কে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই তো পার। ইবনে উমর (রা.) রসূল করিম (সা.)-কে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে তখন তিনি (সা.) বললেন, লোকটিকে আমার কথা বলে জিজ্ঞেস কর। তখন সেই লোকটি বললেন, প্রথম কথাতো হল, আমার কাছে এ দুনিয়া কোন মূল্য রাখে না। কী পেলাম আর কী গেল এর কোন পরওয়া নেই। দ্বিতীয়ত আমার মনে কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ নেই। হযরত ইবনে উমর (রা.) বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। এ দোয়াই আল্লাহ্ মু'মিনকে শিখিয়েছেন। (হযরত ইমাম সুয়তি (রহ.) প্রণীত আদ্ দুররুল মনসূর, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৯৯)।]

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِیْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِیْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَاۤ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ۝

(রাব্বানাগফিরলানা ওয়ালি ইখওয়ানিনাল্লাযীনা সাবাকুনা বিল ঈমানি ওয়ালা তাজ'আল ফী কুলূবিনা গিল্লাল লিল্লাযীনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহীম)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে ও আমাদের সেসব ভাইকে ক্ষমা কর যারা ঈমানে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়েছে। আর যারা ঈমান এনেছে আমাদের অন্তরে তাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না। হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমি অতি স্নেহশীল, বারবার কৃপাকারী। (সূরা হাশ্‌র : ১১)।

(৭৯) সবকিছু নিজের প্রভুর সমীপে উপস্থাপন করার ইব্রাহীমি দোয়া

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ۝ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(রাব্বানা আ'লায়কা তাওয়াক্কালনা ওয়া ইলায়কা আনাবনা ওয়া ইলায়কাল মাসীর-রাব্বানা লা তাজ'আলনা ফিতনাতাল লিল্লাযীনা কাফারূ ওয়াগফির লানা রাব্বানা ইন্নাকা আনতাল আযীযুল হাকীম)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তোমার ওপর আমরা ভরসা করেছি ও তোমারই সমীপে আমরা ঝুঁকেছি এবং তোমার দিকে আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন হবে।

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! যারা অস্বীকার করেছে তুমি আমাদেরকে তাদের জন্য পরীক্ষার কারণ করো না এবং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর; হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! নিশ্চয় তুমিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুমতাহানা : ৫-৬)।

(৮০) ঐশী কল্যাণের পূর্ণতা লাভের জন্যে দোয়া

[আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনকে তওবাতুন্ নসূহ্র শিক্ষা দেন। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাদের পাপ দূর করেন ও তাঁর সন্তুষ্টির জান্নাতে স্থান দেন। এসব মু'মিনদের সামনে ও পেছনে নূর থাকবে আর তারা এজন্য দোয়া করবে।]

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

(রাব্বানা আতমিম্ লানা নূরানা ওয়াগফির লানা-ইন্নাকা আ'লা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর)

হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণ কর আর আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (সূরা তাহ্রীম : ৯)।

(৮১) ঐশী নৈকট্য লাভের আকাঙ্ক্ষা ও অত্যাচারীদের কবল থেকে উদ্ধারের দোয়া

[এটি ফেরাউনের স্ত্রীর দোয়া। ঈমান আনার পরে যখন ফেরাউন তাঁর ওপর যুলুম-নির্যাতন চালায় তখন তিনি তা থেকে রক্ষার জন্যে এ দোয়া করেন]

رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

[রাব্বিবনি লী ই'নদাকা বায়তান ফিল জান্নাতি ওয়া নাজজিনী মিন ফিরআউনা ওয়া 'আমালিহী ওয়া নাজ্জিনী মিনাল ক্বাওমিয্ যালিমীন]

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমার জন্য তোমার সন্নিধানে জান্নাতে একটি গৃহ

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

নির্মাণ কর এবং ফেরাউন ও তার কার্যকলাপ থেকে আমাকে উদ্ধার কর আর আমাকে এ অত্যাচারী জাতি থেকে মুক্তি দাও। (সূরা তাহ্রীম : ১২)।

(৮২) অস্বীকারকারী ও মিথ্যা আখ্যায়িতকারীদের বিরুদ্ধে দোয়া

[হযরত কাতাদাহ্ (রা.) বলেন, হযরত নূহ (আ.) নিজের জাতির বিরুদ্ধে সে সময় এ দোয়া করেন যখন তাঁর নিকট এ ওহী অবতীর্ণ হয়–

"এখন তোমার জাতি থেকে আর কেউ ঈমান আনবে না।" (তফসীর আদ্ দুররুল মনসূর, ৫ম খন্ড, পৃ. ২৭০)।

رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۝ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝

(রাব্বি লা তাযার আ'লাল আরযি মিনাল কাফিরীনা দাইয়্যারা। ইন্নাকা ইন তাযারহুম ইউযিল্লু ই'বাদাকা ওয়া লা ইয়ালিদু ইল্লা ফাজিরান কাফ্ফারা)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি ভূপৃষ্ঠে অস্বীকারকারীদের কারও গৃহকে (গৃহবাসীকে) ছেড়ে দিও না।

কেননা, তুমি যদি তাদেরকে ছেড়ে দাও তাহলে তারা আমার বান্দাদের ভ্রষ্ট করবে এবং কেবল পাপাচারী ও অতি অকৃতজ্ঞদের জন্ম দেবে। (সূরা নূহ : ২৭-২৮)*।

[* টীকা: নবীরা বড়ই দয়ালু হন। তাঁরা সাধারণত বদদোয়া করেন না। এখানে কোন গৃহকে ছেড়ে দিও না, অর্থ গৃহের কোন অবিশ্বাসী ও অস্বীকারকারী যেন ঈমান আনা হতে বঞ্চিত না থাকে]

(৮৩) পিতা-মাতা ও মু'মিনদের ক্ষমা করার দোয়া

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

(রাব্বিগফিরলী ওয়ালি ওয়ালিদাইয়্যা ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মু'মিনাওঁ ওয়া লিল মু'মিনীনা ওয়াল মু'মিনাতি-ওয়া লা তাযিদিয্ যালিমীনা ইল্লা তাবারা)

হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আর যে ব্যক্তি বিশ্বাসী হয়ে আমার গৃহে (শিক্ষায়) প্রবেশ করে তাকে এবং বিশ্বাসী পুরুষ ও সব মু'মিন নারীদের ক্ষমা কর এবং তুমি কেবল যালেমদের জন্য ধ্বংসই বাড়িয়ে দিও। (সূরা নূহ : ২৯)।

সূরা ইখলাস ও আশ্রয় চাওয়ার দু'টি পরিপূর্ণ দোয়া

[হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, "রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কুরআনের শেষ ৩টি সূরা রাতে শোবার সময় যে পড়ে শোবে তার জন্যে আশ্রয় চাওয়ার এর চেয়ে অধিক আর কিছু নেই" (সুনানে নিসাঈ)।
হযরত আয়েশা (রা.) আরও বর্ণনা করেন, সৈয়্যদনা আঁ-হযরত (সা.) যখন রাতে বিছানায় ঘুমাতে যেতেন তখন হাত দু'টো একত্র করে সূরা ইখলাস ও আশ্রয় চাওয়ার (সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস) দু'টি দোয়া পাঠ করতেন আর হাতে ফুঁক দিতেন এবং মাথা থেকে নিয়ে পা পর্যন্ত সারা শরীর মুছে ফেলতেন। (বুখারী ও মুসলিম)। তিনি (সা.) তিনবার এ রকম করতেন। এভাবে নবী (সা.)-এর হাদীসে এ-ও আছে, উক্ত তিনটি সূরা সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করলে যাবতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে এবং দুঃখকষ্ট থেকেও নিরাপদ থাকবে।]

সূরা আল্ ইখলাস

(এটি মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ এ সূরায় ৫ আয়াত এবং ১ রুকু আছে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝٢ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٣ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٤ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٥

(বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। কুল্ হুয়াল্লাহু আহাদ। আল্লাহুস্ সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম্ ইউলাদ। ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওওয়ান আহাদ)
অর্থ: "(১) আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী। (২) তুমি বল, 'তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়। (৩) আল্লাহ্ স্বয়ংসম্পূর্ণ সর্বনির্ভরস্থল। (৪) তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। (৫) আর তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই'।"

সূরা আল্ ফালাক

(এটি মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ এ সূরায় ৬ আয়াত এবং ১ রুকু আছে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝٢ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝٣ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝٤ وَ

مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۝٥ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝٦

(বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম। কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক। মিন শার্রি মা খালাক।

ওয়া মিন শার্রি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব। ওয়া মিন শাররিন্ নাফ্ফাসাতি ফিলউকাদ। ওয়া মিন্ শার্রি হাসিদিন ইযা হাসাদ)
অর্থ: "আল্লাহ্র নামে যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী। (২) তুমি বল, 'আমি আশ্রয় চাই এক সৃষ্টিকে বিদীর্ণ করে আরেক সৃষ্টির উন্মেষকারী প্রভুর কাছে। (৩) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন এর অনিষ্ট থেকে, (৪) এবং অন্ধকার বিস্তারকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা ছেয়ে যায় (৫) এবং সম্পর্ক-বন্ধনে (বিচ্ছেদ সৃষ্টির জন্য) ফুৎকারকারিণীদের অনিষ্ট থেকে, (৬) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে'।"

সূরা আন্ নাস

(এটি মাদানী সূরা, বিসমিল্লাহ্সহ এ সূরায় ৭ আয়াত এবং ১ রুকু আছে)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝١

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝٢ مَلِكِ النَّاسِ ۝٣ اِلٰهِ النَّاسِ ۝٤ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ

الْخَنَّاسِ ۝٥ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۝٦ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝٧

(বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস। মালিকিন্নাস। ইলাহিন্নাস। মিন্ শার্রিল ওয়াস ওয়াসিল খান্নাসি। আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদুরিন্নাস। মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস)
অর্থ: "(১) আল্লাহ্র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বারবার কৃপাকারী, (২) তুমি বল, 'আমি মানুষের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই, (৩) যিনি মানুষের অধিপতি, (৪) মানুষের উপাস্য, (৫) কুপ্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে, যে কুপ্ররোচনা দিয়ে সটকে পড়ে, (৬) যে মানুষের অন্তরে কুপ্ররোচনা দেয়, (৭) সে জিনের (উঁচু শ্রেণীর মানুষের) অন্তর্ভুক্তই হোক আর সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্তই হোক'।"

আদিয়াতুর রসূল (সা.)
[হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দোয়া]

ঘুম থেকে উঠার পর দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলায়হিন নুশূর)

অর্থ: সব প্রশংসা তাঁরই যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

পায়খানায় যাবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ -

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবায়িসি)

অর্থ: হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমি সব ধরনের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক অপবিত্রতা থেকে তোমার আশ্রয় যাচনা করছি ।

পায়খানা হতে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ غُفْرَانَكَ -

(বিসমিল্লাহি গুফরানাকা)

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে! (হে আল্লাহ্! আমি) তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(।) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَ عَافَانِيْ

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আযহাবা আন্নিল আযা ওয়া আ'ফানি)

অর্থ: সব প্রশংসা তাঁরই যিনি আমার কষ্ট দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করেছেন।

ঘর হতে বের হওয়ার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ - اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ -

(বিসমিল্লাহি তাওয়াককালতু আলাল্লাহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও ইউজহালা আলাইয়্যা)

অর্থ: আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে (বের হচ্ছি)। আমি আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করছি আসলে আল্লাহ্ তা'লার দেয়া তৌফিক ছাড়া পাপ হতে বাঁচার এবং পুণ্য কাজ সম্পাদন করার শক্তি নেই। হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন আমি পথভ্রষ্ট না হই অথবা আমাকে পথভ্রষ্ট করা না হয়, আমি অত্যাচার না করি অথবা আমার ওপর অত্যাচার করা না হয় এবং আমি মূর্খতা না করি অথবা আমার ওপর মূর্খতা না করা হয়।

ঘরে প্রবেশ করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا -

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা খায়রাল মাওলিজি ওয়া খায়রাল মাখরাজি বিসমিল্লাহি ওয়া লাজনা ওয়া আলাল্লাহি রাব্বানা তাওয়াককালনা)

অর্থ: হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি তোমার নিকট ঘরে প্রবেশকালীন এবং ঘর হতে নির্গমনকালীন মঙ্গল কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'লার নাম নিয়ে আমরা (গৃহে) প্রবেশ করছি এবং আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহর ওপর ভরসা করছি।

খাবার শুরু করার দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ -

(বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ্)

অর্থ: আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে এবং আল্লাহ্‌র কাছে বরকত কামনা করে (খাচ্ছি)।

খাবার শেষের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আত্‌'আমানা ওয়া সাকানা ওয়া জা'আলানা মিনাল মুসলিমীন)

অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার– যিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলমান বানিয়েছেন।

দাওয়াত খাবার পর দোয়া

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْهَا مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ۔

(আল্লাহুম্মা বারিক লাহুম ফিহা মা রাযাকতাহুম ওয়া আগফির লাহুম ওয়ার হামহুম)
অর্থ: হে আল্লাহ্! তাদেরকে তুমি যে রিযক দান করেছ তাতে বরকত দান কর এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের প্রতি কৃপা কর।

নতুন কাপড় পরিধান করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كَسَوْتَنِيْهِ اَسْئَلُكَ خَيْرَهٗ وَ خَيْرَ مَا صُنِعَ لَهٗ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهٖ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهٗ۔

(আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু কামা কাসাওতানিহি। আসআলুকা খায়রাহু ওয়া খায়রা মা সুনি'আ লাহু ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহী ওয়া শাররি মা সুনিআ লাহু)
অর্থ: হে আল্লাহ্! সব প্রশংসা তোমারই যেভাবে তুমি এটি আমাকে পরিধান করিয়েছ। আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এর মঙ্গলের নিমিত্তে এবং তার জন্যও যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে এবং আমি আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে, এটির অমঙ্গল হতে যার জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে।

ভোরবেলা মসজিদে যাবার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ فِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ خَلْفِىْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ اَمَامِىْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا وَّ اجْعَلْ مِنْ تَحْتِىْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِىْ نُوْرًا

(আল্লাহুম্মাজআল ফি কালবি নুরাওঁ ওয়াজআল ফি লিসানি নুরাওঁ ওয়াজআল ফি সাময়ি নুরাওঁ ওয়াজআল ফি বাসারি নুরাওঁ ওয়াজআল মিন খালফি নুরাওঁ ওয়াজআল মিন আমামি নুরাওঁ ওয়াজআল মিন ফাওকি নুরাওঁ ওয়াজআল মিন তাহতি নুরা। আল্লাহুম্মা আ'অতিনি নুরা।)
অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার অন্তর জ্যোতিতে ভরে দাও। আমার জিহ্বায় আলো দান কর। এবং আমার কানে জ্যোতি দান কর, এবং আমার চক্ষুদ্বয়ে আলো দান কর। আমার সামনেও আলো দান কর আমার পিছনেও আলো দান কর, আমার ওপরে আলো দান কর

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

এবং আমার নিচে আলো দান কর। হে আল্লাহ্ আমাকে নূর দান কর।

রোগীর জন্য দোয়া

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا۔

(আযহিবিল বা'সা রাব্বান নাসি। ওয়াশফি আনতাশ শাফি। লা শেফাআ ইল্লা শেফাউকা শিফাআন লা ইউগাদিরু সাকামা)
অর্থ: হে মানুষের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি এ রোগকে দূর করে দাও এবং আরোগ্য দান কর। তুমিই তো আরোগ্যদাতা। তোমার কাছে ছাড়া (অন্য কারও কাছে) কোন আরোগ্য নেই। তুমি এ রকম আরোগ্য দান কর যেন রোগের অণুপরিমাণও না থাকে।

কবর যিয়ারতের দোয়া

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ اَنْتُمْ سَلْفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ۔

(১) আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ দিয়ারি মিনাল মুমিনিনা ওয়াল মুসলিমিনা ওয়া ইন্না ইন শা-আল্লাহ বিকুমুল্লাহিকুনা। নাসআলুল্লাহু লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াতা)
(২) আস্সালামু আলাইকুম ইয়া আহালাল কুবুরি। ইয়াগফিরুল্লাহা লানা ওয়ালাকুম আনতুম সালফুনা ওয়া নাহনু বিল আসরি।)
অর্থ: (১) তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। এ অঞ্চলের মু'মিনগণ ও মুসলমানগণ! আল্লাহ্ চাইলে আমারও অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আল্লাহ্র কাছে তোমাদের জন্যে এবং আমাদের জন্যে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।
(২) হে কবরের অধিবাসীবৃন্দ! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তোমরা আগে-আগে যাও, আমরা তোমাদের অনুসরণ করছি।

বিয়ে-শাদীতে মোবারকবাদ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى الْخَيْرِ ـ

(বারাকাল্লাহু লাকা, বারাকাল্লাহু লাকা, ওয়া বারাকা আলাইকুমা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফিল খায়রি)
অর্থ: তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা বরকত দান করুন। তোমাদেরকে আল্লাহ্ বরকত দান করুন এবং তোমাদের উভয়ের ওপর বরকত হোক! নেক কাজে তোমাদের উভয়ের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি হোক!

নব বধূর জন্য দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ـ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন খায়রিহা ওয়া খায়রি মা জাবালতাহা আলায়হি। ওয়া আউযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা আলায়হি)
অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে তার মাঝে নিহিত সেই মঙ্গল কামনা করি যে মঙ্গলের মাঝে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ এবং তোমার আশ্রয় চাচ্ছি তার মাঝে নিহিত সেই অমঙ্গল হতে যে অমঙ্গলের মাঝে তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ।

স্বামী-স্ত্রী মিলনের সময় দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ـ

(বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়তানা ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বানা মা রাযাকতানা)
অর্থ: আল্লাহ্ তা'লার নামে। হে আল্লাহ! শয়তান হতে আমাদেরকে দূরে রাখ এবং এ জিনিস হতে শয়তানকে দূরে রাখ যা তুমি আমাদেরকে দান করতে যাচ্ছো।

আশা পূরণের দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصّٰلِحٰتُ ـ

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি বিনি'মাতিহি তাতিম্মুস সালিহাতু)
অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যার অনুগ্রহে সব উত্তম কার্য সম্পন্ন হয়।

বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِىْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আ'ফানি মিম্মা ইবতালাকা বিহি ওয়া ফায্যালানি আলা কাসিরিম মিম্মান খালাকা তাফযিলা)
অর্থ: সব প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন সেই বিপদ হতে যাতে তুমি ক্লিষ্ট হয়েছ। আর তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে অনেকের চেয়ে আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

নিয়তির বিধানের ওপর সন্তুষ্ট থাকার দোয়া

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ اَهْلِ النَّارِ ـ

(আলহামদু লিল্লাহি আ'লা কুল্লি হালিন ওয়া আউযু বিল্লাহি মিন হালি আহলিন নার)
অর্থ : সব অবস্থায় সব প্রশংসা আল্লাহ্ তা'লার এবং আগুনের অধিবাসীদের অবস্থা হতে আমি আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

অপছন্দনীয় কাজ দেখে দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَا يَاْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّاٰتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ـ

(আল্লাহুম্মা লা ইয়াতি বিল হাসানাতি ইল্লা আনতা ওয়া লা ইয়াদফাঊস সাইয়্যাতি ইল্লা আনতা ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি)
অর্থ: হে আমার আল্লাহ! তুমি ছাড়া কেউ সুখ আনয়ন করতে পারে না এবং তুমি ছাড়া কেউ দুঃখ দূর করতে পারে না। (পাপ হতে মুক্তি লাভের) সামর্থ্য এবং (পুণ্য কর্ম করার) শক্তি কেবল আল্লাহরই (আয়ত্তে রয়েছে)।

সফলতার উপকরণ সৃষ্টি হওয়ার দোয়া

رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا ـ رَبِّ اشْرَحْ لِىْ صَدْرِىْ وَيَسِّرْ لِىْ اَمْرِىْ ـ

(রাব্বানা আতিনা মিল্লাদুনকা রাহমাতাওঁ ওয়া হায়্যি লানা মিন আমরিনা রাশাদা। রাব্বিশ রাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি)
অর্থ: হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তোমার পক্ষ হতে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান কর

এবং আমাদের কাজে আমাদের জন্য সফলতার পথ বের করে দাও। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার বক্ষ খুলে দাও এবং আমার কাজকে আমার জন্যে সহজসাধ্য করে দাও।

ক্রোধ এবং আবেগের প্রভাব হতে রক্ষার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَاَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِىْ وَاَجِرْنِىْ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ-

(আল্লাহুম্মাগ ফিরলি যামবি ওয়া আযহিব গাইযা কালবি ওয়া আজিরনি মিনাশ শায়ত্বানির রাজিম)
অর্থ: হে আল্লাহ্! আমার পাপকে ক্ষমা করে দাও এবং আমার অন্তর হতে ক্রোধকে দূর করে দাও এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আমাকে আশ্রয় দান কর।

সফরে যাবার দোয়া

যখন যানবাহনে আরোহণ করা হয় তখন তিন বার **'আল্লাহু আকবর'**– অর্থাৎ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, বলা দরকার।

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

اَللّٰهُمَّ اِنَّ نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَ الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَالْعَمَلِ مَاتَرْضٰى-

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هٰذَا وَاطْوِلَنَا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ

(সুবহানাল্লাযি সাখখারা লানা হাযা ওমা কুন্না লাহু মুকরিনীনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন। আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফি সাফারিনা হাযাল বিররা ওয়াত তাকওয়া ওয়া মিনাল আমালি মা তারদ্বা। আল্লাহুম্মা হাওয়্যিন আলায়না সাফারিনা হাযা ওয়া আতওয়ে লানা বু'অদাহু আল্লাহুম্মা)
অর্থ: তিনি পবিত্র যিনি একে আমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন অথচ আমরা একে আয়ত্তাধীন করতে সক্ষম ছিলাম না। আর নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভু-প্রতিপালকের পানে ফিরে যাব। হে আল্লাহ্! আমরা এ সফরে তোমার কাছে পুণ্য, খোদাভীতি এবং এমন কাজ করার (সামর্থ্য) প্রার্থনা করছি– যা তুমি পছন্দ কর। হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য আমাদের এ সফরকে সহজ করে দাও এবং দূরত্ব দূর করে দাও। হে আল্লাহ্ এ সফরে তুমিই বন্ধু এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের মধ্যে আমাদের প্রতিনিধি।

শত্রু জাতি হতে সুরক্ষার দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরুরিহিম)
অর্থ: হে আল্লাহ্! আমরা (তাদের– অর্থাৎ, শত্রুদের মোকাবেলায়) নিশ্চয় তোমাকে তাদের অন্তরে (ঢাল স্বরূপ) রাখছি এবং তোমার কাছে তাদের সব অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাচ্ছি।

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে দোয়া

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى

(আসতাওদিয়ুল্লাহা দ্বিনাকা ওয়া আমানাতাকা ওয়া আখিরা আ'মালিকা যাওয়্যাদাকাল্লাহুত তাক্ওয়া)
অর্থ: আমি তোমার ধর্ম, নিরাপত্তা এবং শেষ পরিণতির জন্য তোমাকে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সমর্পন করছি। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন।

উঁচু স্থানে আরোহণ করার দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلٰى كُلِّ شَرَفٍ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلٰى كُلِّ حَالٍ-

(আল্লাহুম্মা লাকাশ শারফু আ'লা কুল্লি শারফিন ওয়া লাকাল হামদু আ'লা কুল্লি হালিন)
অর্থ: হে আল্লাহ্! সব মর্যাদার ওপর তোমার জন্যই সমস্ত মর্যাদা এবং সর্বাবস্থায় তোমারই প্রশংসা।

উঁচু স্থান হতে নিচু স্থানে অবতরণকালীন দোয়া

اٰئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ-

(আয়িবুনা তায়িবুনা আ'বিদুনা লি রাব্বিনা হামিদুন)
অর্থ: (১) আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, তাঁরই প্রশংসাকারী।

মজলিস হতে উঠার দোয়া

سُبْحَانَکَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَيْکَ ـ

(সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগ-ফিরুকা ওয়া আতুবু ইলায়কা)

অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! তুমি পবিত্র এবং প্রশংসাসহ বিদ্যমান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হচ্ছি।

নতুন চাঁদ দেখে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهٗ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ رَبِّيْ وَرَبُّکَ اللّٰهُ ـ

(আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলায়না বিল আমানি ওয়াল ঈমানি ওয়াস্ সালামাতি ওয়াল ইসলামি রাব্বি ওয়া রাব্বুকাল্লাহ্)

অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! আমাদেরকে নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি এবং ইসলামের চাঁদ দেখাও। (হে চাঁদ) তোমার এবং আমার প্রভু আল্লাহ্ তা'লাই।

লাইলাতুল কদরের দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ ـ

(আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি)

অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল। ক্ষমা করাকে তুমি ভালোবাস। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

বিদ্যুৎ চমকালে দোয়া

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِکَ وَلَا تُهْلِکْنَا بِعَذَابِکَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِکَ ـ

(আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বিগাযাবিকা ওয়ালা তুহলিকনা বিআ'যাবিকা ওয়া আফিনা কাবলা যালিকা)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার ক্রোধ দ্বারা হত্যা করো না। আর তোমার আযাব দিয়ে ধ্বংস করো না বরং এর পূর্বে তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর।

শয়তানী প্রভাব হতে সুরক্ষার দোয়া

اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّآمَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ ـ

(আউযু বিকালিমাতিল্লাহিত তাম্মাতি মিন গাযাবিহি ওয়া ইকাবিহি ওয়া শাররি ইবাদিহি ওয়া মিন হামাযাতিশ শায়াতিনি আইঁ ইয়াহযুরুন)

অর্থ: আমি আল্লাহ্ তা'লার পরিপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও আযাব হতে, তাঁর বান্দার শত্রুতা হতে এবং শয়তানদের প্ররোচনা হতে সুরক্ষার জন্যে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন তারা আমার কাছেই না আসতে পারে।

অসুবিধাসমূহ দূর করণার্থে দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْٓ اَعُوْذُبِکَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاۤءِ وَدَرْکِ الشِّقَآءِ وَسُوْءِ الْقَضَآءِ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَآءِ ـ

(আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন জাহদিল বালায়ি ওয়া দারকিশ শিকায়ি ওয়া সুয়িল কাযায়ি ওয়া শামাতাতিল আ'দায়ি)

অর্থ: হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করছি, বিপদ আপদের দুর্বিষহ অসুবিধা হতে, দুর্ভাগ্যের করাল গ্রাস হতে, ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত হতে এবং শত্রুর আনন্দ হতে।

আদিয়াতুল মসীহ্ মাওউদ (আ.)
[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দোয়া]

(হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিম্নলিখিত ইলহামী দোয়াসমূহ এজন্য পেশ করা হচ্ছে, কেননা আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীগণকে এবং বিশেষ বান্দাদের ইলহাম মারফত যেসব দোয়া শিক্ষা দিয়ে থাকেন তা অবশ্যই এবং নিশ্চয় কবুলিয়তের মর্যাদা রাখে। আমাদের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাইকে এ দোয়াগুলো মুখস্থ করা ও স্মরণ রাখা উচিত।)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর ইলহাম মারফত দোয়া করার তাগিদ।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন:

اِنِّيْ اَنَا اللّٰهُ فَاعْبُدُوْنِيْ وَلَا تَنْسَنِيْ وَاجْتَهِدْ اَنْ تَصِلَنِيْ وَاسْئَلْ رَبَّکَ وَکُنْ سَئُوْلًا ـ

(ইন্নি আনাল্লাহু ফা'বুদুনি ওয়ালা তানসানি ওয়াজতাহিদ আন তাসিলানি ওয়াসআল রাব্বাকা ওয়া কুন সাউলান।)
অর্থ: (আল্লাহ্ বলছেন) আমিই আল্লাহ্, আমার ইবাদত কর, আমাকে ভুলো না এবং সেই বিষয়ের জন্য চেষ্টা কর, যেন তুমি আমার সাথে মিলিত হতে পার এবং নৈকট্য লাভ করতে পার। এটির পদ্ধতি হল, তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে দোয়া কর এবং পুনঃপুন কর। (তাযকেরা, পৃ. ৪০২)।

ادْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

(উদউনি আসতাজিব লাকুম)
অর্থ: আমার কাছে দোয়া কর, আমি তোমার দোয়া কবুল করবো। (তাযকেরা, পৃ. ২১৮)

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

(উজিবু দাওয়াতাদ্দায়ি ইযা দাআনি)
অর্থ: আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করে থাকি যখন সে আমাকে ডাকতে থাকে। (তাযকেরা, পৃ. ৮৩)।

اِنَّهٗ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ

(ইন্নাহু সামিউদ দোয়া)
অর্থ: নিশ্চয় তিনি শ্রবণ করে থাকেন। (তাযকেরা, পৃ. ১০০)।

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّيْ لَوْ لَا دُعَآؤُكُمْ

(কুল মা ইয়া'বাউবিকুম রাব্বি লাও লা দুআ'উকুম)
অর্থ: তাদেরকে বলে দাও, আমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের কি পরওয়া করেন যদি তোমরা দোয়া না কর। (তাযকেরা, পৃ. ১৯)।

قَدْ جَرَتْ عَادَةُ اللّٰهِ اَنَّهٗ لَا يَنْفَعُ الْاَمْوَاتَ اِلَّا الدُّعَاءُ

(কাদ জারাত আদাতুল্লাহি আন্নাহু লা ইয়ানফায়ুল আমওয়াতা ইল্লাদ দু'আ)
অর্থ: আল্লাহ্ তা'লার চিরাচরিত রীতি এটিই, দোয়া ছাড়া মৃতদের আর কোন মঙ্গল পৌঁছানো যায় না। (তাযকেরা, পৃ. ৪২৮)।

اَفَمَنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ۔

(আফামাইঁ ইউজিবুল মুযতাররা ইযা দাআহু কুলিল্লাহু সুম্মা যারহুম ফি খাওযিহিম ইয়ালআ'বুন)

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

অর্থ: যখন কোন উদ্বিগ্ন ব্যক্তি তাঁকে ডাকে তখন আর কে আছে, যে তার ডাক শ্রবণ করে? তুমি বলে দাও, সেই সত্তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই। লোকেরা সেই কথা না শুনলে তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও যেন তারা অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত থাকে। (তাযকেরা, পৃ. ৭৬৭)

دست تو۔ دعائے تو۔ ترحّم زِ خدا۔

(দাস্তে তু- দোয়ায়ে তু- তারাহহুম যে খোদা।)
অর্থ: তোমার হাত উঠানোর জন্য এবং তোমার দোয়ার ফলে খোদা তা'লার রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়। (তাযকেরা, পৃ. ৫৬৯)।

تو در منزل ما چو بار بار آئی۔ خدا ابر رحمت ببارید یانے۔

(তু দার মানযিল মা চু বার বার আই- খোদা আবরে রাহ্মাত বা বারিদ ইয়ানে)
অর্থ: হে আমার বান্দা। যেহেতু তুমি বারবার আমার দরগাহে ধর্না দাও, এজন্য তুমি নিজে প্রত্যক্ষ কর, তোমার প্রতি রহমতের বারিধারা বর্ষিত হলো কিনা? (তাযকেরা, পৃ. ৬৫৬)।

আল্লাহ্ তা'লার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহামী দোয়া]

لَا تَايْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ۔

(লা তাইয়াসু মির রাওহিল্লাহ্।)
অর্থ: খোদা তা'লার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। (তাযকেরা, পৃ. ৫২৭)।

وَلَا تَيْئَسْ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ۔ اَلَاۤ اِنَّ رَوْحَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ۔

(লা তাইয়াস মির রাওহিল্লাহ্। আলা ইন্না রাওহাল্লাহি কারিব)
অর্থ: আল্লাহ্ তা'লার রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। জেনে নাও! আল্লাহ্ তা'লার রহমত অতি নিকটবর্তী। (তাযকেরা, পৃ. ৫০)।

اَتَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ الَّذِيْ يُرَبِّيْكُمْ فِي الْاَرْحَامِ۔

(আতাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহিল্লাযি ইউরাব্বিকুম ফিল আরহাম।)
অর্থ: তুমি কি সেই খোদার রহমত হতে নিরাশ হয়ে পড়েছ, যে খোদা তোমাদের মাতৃগর্ভে প্রতিপালন করে থাকেন। (তাযকেরা, পৃ. ৬৫৭)।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ ـ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ ـ

(সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া আলি মুহাম্মাদ।)
অর্থ: আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রশংসাসহ পবিত্র। মহান আল্লাহ্ পবিত্র। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর বংশধরগণের ওপর আশিস বর্ষণ কর। (তাযকেরা, পৃ. ৩২)।

رَبِّ اَذْهِبْ عَنِّیْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْنِیْ تَطْهِیْرًا ـ

(রাব্বি আযহিব আন্নির রিজসা ওয়া তাহ্হিরনি তাতহিরা।)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার কাছ থেকে অপবিত্রতাকে দূরে রাখ এবং আমাকে ততটুকু পবিত্র কর যতটুকু পবিত্র করা যায়। (তাযকেরা, পৃ. ২৯)।

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُبَارَكًا حَيْثُ مَا كُنْتُ

(রাব্বিজআলনি মুবারাকান হায়সু মা কুনতু)
অর্থ: হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে এভাবে কল্যাণমন্ডিত কর যেখানেই আমি বসবাস করি কল্যাণ যেন আমার সাথী হয়। (তাযকেরা, পৃ. ১৩২)।

ঐশী সাহায্যের দোয়া

رَبِّ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

(রাব্বি ইন্নি মাগলুবুন ফানতাসির)
অর্থ: হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি অসহায়, তুমি (আমার শত্রু হতে) প্রতিশোধ গ্রহণ কর। (তাযকেরা, পৃ. ৭১৪)

رَبِّ اِنِّیْ مَظْلُوْمٌ فَانْتَصِرْ

(রাব্বি ইন্নি মাযলুমুন ফানতাসির)
অর্থ: হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি অত্যাচারিত, তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ কর। (তাযকেরা, পৃ. ৪৮৩)

رَبِّ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ فَسَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

(রাব্বি ইন্নি মাগলুবুন ফানতাসির ফাসাহ্হিকহুম তাসহিকা)
অর্থ: হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি অসহায়। তুমি (আমার শত্রু হতে) প্রতিশোধ গ্রহণ

কর এবং সম্পূর্ণরূপে তাদের চূর্ণ-বিচূর্ণ কর। (তাযকেরা, পৃ. ৬৫৫)।

يَا اَللّٰهُ فَتْحٌ

(ইয়া আল্লাহু ফাত্হুন)
অর্থ: হে আল্লাহ্! বিজয় দান কর। (তাযকেরা, পৃ. ৮৪০)।

الٰہی میرے سلسلے کو ترقی ہو اور تیری نصرت اور تائید اسکے شامل حال ہو۔

(এলাহি মেরে সিলসিলে কো তারাক্কি হো অওর তেরি নুসরাৎ অওর তাইদ উসকে শামিলে হাল হো)
অর্থ: হে খোদা! আমার সিলসিলাকে উন্নতি দান কর। তোমার সাহায্য এবং সহযোগীতা যেন সর্বদা এর সাথে থাকে। (তাযকেরা, পৃ. ৫০৭)।

رَبِّ اجْعَلْنِیْ غَالِبًا عَلٰى غَيْرِیْ

(রাব্বিজআলনি গালিবান আলা গাইরি)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে অন্যদের ওপর বিজয় দান কর। (তাযকেরা, পৃ. ৭১৩)

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِرِيْنَ دَيَّارًا

(রাব্বি লা তাযার আলাল আরযি মিনাল কাফিরিনা দাইয়ারা।)
অর্থ: হে আমার প্রভু! ভূপৃষ্ঠে বসবাসকারী কাফিরদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তিকে ছেড়ো না। (তাযকেরা, পৃ. ৬৭৬)।

বায়তুত্দোয়ায় (দোয়ার গৃহ) পঠনীয় দোয়া

يَا رَبِّ فَاسْمَعْ دُعَائِیْ وَمَزِّقْ اَعْدَائَكَ وَاَعْدَائِیْ وَاَنْجِزْ وَعْدَكَ وَانْصُرْ عَبْدَكَ وَاَرِنَا اَيَّامَكَ وَشَهِّرْ لَنَا حُسَامَكَ وَلَا تَذَرْ مِنَ الْكَافِرِيْنَ شَرِيْرًا ـ

(ইয়া রাব্বি ফাসমা' দু'আয়ি ওয়া মায্যিক আ'দায়িকা ওয়া আ'দায়ি ওয়া আনজিয ওয়াদাকা ওয়ানসুর আ'বদাকা ওয়া আরিনা আইয়্যামাকা ওয়া শাহ্হির লানা হুসামাকা ওয়ালা তাযার মিনাল কাফিরিনা শারিরা)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার দোয়া শ্রবণ কর। তোমার শত্রু ও আমার শত্রুকে খন্ড-বিখন্ড কর আর তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর। আর তোমার বান্দাকে সাহায্য কর। আমাকে তোমার (আযাবের) দিবস প্রত্যক্ষ করাও এবং তোমার তরবারীকে আমাদের জন্য প্রবল করে দেখাও এবং দুষ্ট কাফিরদের কাউকেও ছেড়ে দিও না। (তাযকেরা, পৃ. ৫১২)।

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করণার্থে দোয়া

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ـ

(রাব্বানাফতাহ্ বাইনানা ওয়া বাইনা কাওমিনা বিল হাক্কি ওয়া আনতা খায়রুল ফাতিহিন)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে মীমাংসা করে দাও এবং তুমি সব মীমাংসাকারীদের মাঝে উত্তম। (তাযকেরা, পৃ. ৪৭)।

رَبِّ فَرِّقْ بَيْنَ صَادِقٍ وَكَاذِبٍ اَنْتَ تَرٰى كُلَّ مُصْلِحٍ وَصَادِقٍ-

(রাব্বি ফাররিক বায়না সাদিকিন ওয়া কাযিবিন আনতা তারা কুল্লা মুসলিহিন ওয়া সাদিকিন)

অর্থ: হে আমার প্রভু! সত্যবাদী এবং মিথ্যাবাদীদের মাঝে পার্থক্য করে দেখাও। তুমি প্রত্যেক সংশোধনকারী এবং সত্যবাদীকে ভালরূপে জান। (তাযকেরা, পৃ. ৬১৩)।

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ

(রাব্বানাফতাহ্ বাইনানা ওয়া বাইনাহুম)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাদের এবং তাদের (আমাদের শত্রুদের) মধ্যে মীমাংসা করে দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৬৯৬)।

يَا حَفِيْظُ يَا عَزِيْزُ يَا رَفِيْقُ

(ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু)

অর্থ: হে নিরাপত্তা দানকারী! হে পরাক্রমশালী! হে বন্ধু! (তাযকেরা, পৃ. ৪৯৩)।

শত্রুর অনিষ্ট হতে নিরাপদে থাকার দোয়া

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ-

(রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহফাযনি ওয়ানসুরনি ওয়ারহামনি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! সব কিছুই তোমার সেবক। হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে নিরাপদে রাখ, তুমি আমাকে সাহায্য কর এবং তুমি আমার প্রতি কৃপা কর। (তাযকেরা, পৃ. ৪৫৮)

رَبِّ احْفَظْنِيْ فَاِنَّ الْقَوْمَ يَتَّخِذُوْنَنِيْ سُخْرَةً ـ

(রাব্বিহ্‌ফাযনি ফাইন্নাল কাওমা ইয়াত্তাখিযুনানি সুখরাতান)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে নিরাপদে রাখ। কেননা, জাতি আমাকে হাসি তামাশার পাত্র বানিয়ে নিয়েছে। (তাযকেরা, পৃ. ৬৭৮)।

رَبِّ لَا تُضَيِّعْ عُمْرِيْ وَعُمُرَهَا وَاحْفَظْنِيْ مِنْ كُلِّ اٰفَةٍ تُرْسَلُ اِلَيَّ-

(রাব্বি লা তুযায়য়ি' উমরি ওয়া উমুরাহা ওয়াহফাযনি মিন কুল্লি আফাতিন তুরসালু ইলায়্যা)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার এবং তার বয়সকে নিরর্থক করে দিও না এবং সব ধরনের বিপদ– যা আমার প্রতি প্রেরিত হয় তা হতে নিরাপদে রাখ। (তাযকেরা, পৃ. ৬০৩)।

ক্ষমা এবং দয়ার জন্য দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ-

(রাব্বানাগ ফিরলানা যুনুবানা ইন্না কুন্না খাতিইন)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও। কেননা, আমরা অন্যায় করেছি। (তাযকেরা, পৃ. ৬৩৯)।

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ مِنَ السَّمَاءِ

(রাব্বিগফির ওয়ারহাম মিনাস সামায়ি।)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আকাশ থেকে কৃপা বর্ষণ কর। (তাযকেরা, পৃ. ৪৭)।

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ-

(রাব্বানাগফির লানা ইন্না কুন্না খাতিইন)

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। কেননা, আমরা অন্যায় করেছি। (তাযকেরা, পৃ. ২০২)।

رَبِّ اَرِنِيْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ مِّنَ السَّمَآءِ

(রাব্বি আরিনি কাইফা তুহয়িল মাওতা। রাব্বিগফির ওয়ারহাম মিনাস সামায়ি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! তুমি মৃতকে কীভাবে জীবিত কর তা আমাকে দেখাও। হে আমার প্রভু! আকাশ হতে তুমি ক্ষমা এবং কৃপা অবতীর্ণ কর। (তাযকেরা, পৃ. ২৮)।

یا اللہ رحم کر۔

(ইয়া আল্লাহ! রহম কার)

অর্থ: হে আল্লাহ! দয়া কর। (তাযকেরা, পৃ. ৭০৮)।

رَبِّ ارْحَمْنِىْ اِنَّ فَضْلَكَ وَرَحْمَتَكَ يُنْجِىْ مِنَ الْعَذَابِ

(রাব্বিরহামনি ইন্না ফাযলাকা ওয়া রাহমাতাকা ইউনজি মিনাল আযাব)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয় তোমার অনুগ্রহ এবং কৃপা আযাব হতে মুক্তি দেয়। (তাযকেরা, পৃ. ৭৩১)।

ক্ষমা ও মুক্তির জন্য দোয়া

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَا وَادْفَعْ بلايَانَا وَكُرُوْبَنَا وَنَجِّ مِنْ كُلِّ هَمٍّ قُلُوْبَنَا وَكَفِّلْ خُطُوْبَنَا وَكُنْ مَعَنَا حَيْثُمَا كُنَّا يَا مَحْبُوْبَنَا وَاسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَاٰمِنْ رَوْعَاتِنَا اِنَّا تَوَكَّلْنَا عَلَيْكَ وَفَوَّضْنَا الْاَمْرَ اِلَيْكَ اَنْتَ مَوْلٰنَا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ - اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ -

(রাব্বানাগফির লানা যুনুবানা ওয়াদফা' বালায়ানা ওয়া কুরুবানা ওয়া নাজ্জি মিন কুল্লি হাম্মি কুলুবিনা ওয়া কাফ্‌ফিল খুতুবানা ওয়া কুম্ মা'আনা হাইসুমা কুন্না ইয়া মাহবুবানা- ওয়াসতুর 'আওরাতিনা ওয়া আমিন রাওআ'তিনা- ইন্না তাওয়াক্কালনা আলাইকা ওয়া ফাওওয়াযনাল আমরা ইলাইকা- আনতা মাওলানা ফিদ্দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি ওয়া আনতা আরহামুর রাহিমিন- আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

অর্থ: হে আমাদের প্রভু! আমাদের পাপ ক্ষমা করে দাও। আমাদের বিপদ-আপদ এবং কষ্ট দূর করে দাও। আর আমাদের হৃদয়কে সব চিন্তা হতে মুক্তি দান কর। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের জন্যে প্রতিভূ হও। আর আমরা যেখানেই থাকি তুমি আমাদের সাথী হও। হে আমাদের প্রেমাস্পদ! আমাদের নগ্নতাকে ঢেকে দাও এবং আমাদেরকে আমাদের আশংকাসমূহ হতে নিরাপদে রাখ । তোমার ওপরই আমরা ভরসা করেছি। দুনিয়া এবং আখিরাতে যাবতীয় বিষয়াবলীকে তোমার প্রতিই আমরা সমর্পিত করছি। তুমিই আমাদের অভিভাবক। তুমিই সর্বোত্তম করুণাময়। হে সারা জগতের প্রভু-প্রতিপালক! কবুল কর। (তোহফা গুলড়াবিয়া, পৃ. ৯১)।

নামাযের সিজদার দোয়া

يَا مَنْ هُوَ اَحَبُّ مِنْ كُلِّ مَحْبُوْبٍ اِغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ وَادْخِلْنِىْ فِىْ عِبَادِكَ الْمُخْلِصِيْنَ -

(ইয়া মান হুয়া আহাব্বু মিন কুল্লি মাহবুবিন ইগফিরলি ওয়াতুব আলাইয়্যা ওয়া আদখিলনি ফি ইবাদিকাল মুখলিসিন।)

অর্থ: হে! যিনি সব প্রেমাস্পদ হতে অধিক ভালোবাসা পাবার যোগ্য! আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি কৃপা বর্ষণ কর এবং আমাকে তোমার ন্যায়নিষ্ঠ বান্দাগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে নাও।

(ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮ সনে চৌধুরী রুস্তম আলী সাহেবের কাছে লিখিত পত্র হতে উদ্ধৃত)।

পূর্ণ রোগ মুক্তির জন্য দোয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَافِىْ - بِسْمِ اللّٰهِ الشَّافِىْ بِسْمِ اللّٰهِ الْغَفُوْرِ الرَّحِيْمِ -
بِسْمِ اللّٰهِ الْبَرِّ الْكَرِيْمِ - يَا حَفِيْظُ يَا عَزِيْزُ يَا رَفِيْقُ يَا وَلِىُّ اشْفِنِىْ -

(বিসমিল্লাহিল কাফি। বিসমিল্লাহিশ শাফি। বিসমিল্লাহিল গাফুরুর রাহিম। বিসমিল্লাহিল বাররিল কারিম। ইয়া হাফিযু ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু ইয়া ওয়ালিয়্যু ইশফিনি)

অর্থ: আমি সেই আল্লাহ্ তা'লার নামে সাহায্য চাচ্ছি, যিনি যথেষ্ট। আমি সেই আল্লাহ্‌র নামে সাহায্য চাচ্ছি, যিনি ক্ষমাশীল এবং কর্মের প্রতিফলদাতা। আমি সেই আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছি, যিনি মহানুভব এবং অনুগ্রহশীল। হে নিরাপত্তা দাতা! হে পরাক্রমশালী! হে বন্ধু! হে অভিভাবক! আমাকে আরোগ্য দান কর। (তাযকেরা, পৃ. ৫২৪)।

رَبِّ اشْفِ زَوْجَتِىْ هٰذِهٖ وَاجْعَلْ لَهَا بَرَكَاتٍ فِى السَّمَاءِ وَبَرَكَاتٍ فِى الْاَرْضِ -

(রাব্বিশফি যাওজাতি হাযিহি ওয়াজআল লাহা বারাকাতিন ফিস্‌সামায়ি ওয়া বারাকাতিন ফিল আরযি।)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার এ স্ত্রীকে আরোগ্য দান কর এবং তাকে ঐশী এবং পার্থিব কল্যাণ দান কর। (তাযকেরা, পৃ. ৫৯০)।

رَبِّ زِدْ فِىْ عُمُرِىْ وَفِىْ عُمُرِ زَوْجِىْ زِيَادَةً خَارِقَ الْعَادَةِ -

(রাব্বি যিদ ফি উমুরি ওয়া ফি উমুরি যাওজি যিয়াদাতান খারিকাল আদাতি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার বয়সে এবং আমার সঙ্গীণির বয়সে অলৌকিকভাবে আধিক্য দান কর। (তাযকেরা, পৃ. ৪১৯)।

رَبِّ اَصِحَّ زَوْجَتِىْ هٰذِهٖ

(রাব্বি আসিহ্‌হা যাওজাতি হাযিহি)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার স্ত্রীকে ব্যাধি হতে রক্ষা কর এবং আরোগ্য করে দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৩৪০)।

اِشْفِنِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَارْحَمْنِىْ

(ইশফিনি মিল্লাদুনকা ওয়ারহামনি।)
অর্থ: (হে আমার আল্লাহ্) আমাকে তোমার সন্নিধান থেকে আরোগ্য দান কর এবং আমার প্রতি করুণা কর। (তাযকেরা, পৃ. ৬০৩)।

বিষন্নতা দূর হওয়ার দোয়া

رَبِّ نَجِّنِىْ مِنْ غَمِّىْ

(রাব্বি নাজ্জিনি মিন গাম্মি)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে বিষণ্নতা হতে মুক্তি দাও। (তাযকেরা, পৃ. ১০৫)।

يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اِنَّ رَبِّىْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুমু বিরাহমাতিকা আসতাগিসু ইন্না রাব্বি রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়াল আরয)
অর্থ: হে চিরঞ্জীবী ও চিরস্থায়ী (খোদা তা'লা) আমি তোমার কৃপার সাহায্য প্রার্থনা করি। নিশ্চয় তুমি আমার প্রভু, যিনি আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর প্রভু! (তাযকেরা, পৃ. ৩৪৩)।

رَبِّ اِنِّىْ اَخْتَرْتُكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ

(রাব্বি ইন্নি আখতারতুকা আলা কুল্লি শাইয়িন।)
অর্থ: হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি তোমাকে সব কিছুর মোকাবেলায় বেছে নিয়েছি। (তাযকেরা, পৃ. ৪০২)।

رَبِّ اَخْرِجْنِىْ مِنَ النَّارِ

(রাব্বি আখরিজনি মিনান্নার)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে আগুন হতে বের করে দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৭০২)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّىْ الْحَزَنَ وَاٰتَانِىْ مَا لَمْ يُؤْتَ اَحَدٌ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ۔

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আযহাবা আন্নিল হাযানা ওয়া আতানি মা লাম ইউতা আহাদুম মিনাল আলামিন)
অর্থ: সব প্রশংসা সেই আল্লাহ্ তা'লার, যিনি আমার সব বিষন্নতা দূর করেছেন এবং আমাকে সেই জিনিস দান করেছেন, যা এ জগতে অন্য কাউকেও দান করেনি। (তাযকেরা, পৃ. ৭১৭)।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَخْرَجَنِىْ مِنَ النَّارِ۔

(আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আখরাজানি মিনান্নার।)
অর্থ: সব প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে আগুন হতে বের করেছেন। (তাযকেরা, পৃ. ৭২০)।

ঈমান আনার দোয়া

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا۔

(রাব্বানা ইন্নানা সামি'অনা মুনাদিইঁ য়াঁই ইউনাদি লিলঈমানি ওয়া দাইয়ান ইলাল্লাহি ওয়া সিরাজাম মুনিরা।)
অর্থ: হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌র দিকে ডাকছেন এবং তিনি এক উজ্জ্বল প্রদীপ। (তাযকেরা, পৃ. ৫৩)।

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِىْ لِلْاِيْمَانِ ۔ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ۔

(রাব্বানা ইন্নানা সামি'না মুনাদিইঁ য়াঁই ইউনাদি লিল ঈমান-রাব্বানা আমান্না ফাকতুবনা মাআশ শাহিদিন।
অর্থ: হে আমাদের প্রভু! নিশ্চয় আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন। হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং তুমি আমাদেরকে সাক্ষীগণের মাঝে গণ্য করে নাও। (তাযকেরা, পৃ. ২৪৬)।

মানুষের সংশোধনের জন্য দোয়া

رَبِّ اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ

(রাব্বি আসলিহ উম্মাতা মুহাম্মাদিন)
অর্থ: হে আমার প্রভু! উম্মতে মুহাম্মদীয়ার সংশোধন করে দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৪৭)।

رَبِّ اَصْلِحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ

(রাব্বি আসলিহ বাইনি ওয়া বাইনা ইখওয়াতি)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার মধ্যে এবং আমার ভাইদের মাঝে সংশোধন এনে দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৭১৩)।

اَللّٰهُمَّ اِنْ اَهْلَكْتَ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِى الْاَرْضِ اَبَدًا ـ

(আল্লাহুম্মা ইন আহলাকতা হাযিহিল ইসাবাতা ফালান তুবাদা ফিল আরযি আবাদা)
অর্থ: হে আমাদের আল্লাহ! তুমি এই জামাতকে যদি ধ্বংস করে দাও, তবে এ পৃথিবীতে তোমার উপাসনা কখনও হবে না। (তাযকেরা, পৃ. ৪৫৫)।

জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ার দোয়া

رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

(রাব্বি যিদনি ইলমান)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৩৮৯)।

رَبِّ عَلِّمْنِيْ مَا هُوَ خَيْرٌ عِنْدَكَ

(রাব্বি আল্লিমনি মাহুয়া খায়রুন ইনদাকা)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে সেসব বিষয় শিক্ষা দাও, যা তোমার কাছে উত্তম। (তাযকেরা, পৃ. ৬৫৩)।

رَبِّ اَرِنِيْ اَنْوَارَكَ الْكُلِّيَّةَ

(রাব্বি আরিনি আনওয়ারাকাল কুল্লিয়্যাতা)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে সেসব জ্যোতি দেখাও– যা সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে। (তাযকেরা, পৃ. ৬১৬)।

رَبِّ اَرِنِيْ حَقَائِقَ الْاَشْيَاءِ

(রাব্বি আরিনি হাকায়িকাল আশিয়া)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে প্রত্যেক বস্তুর মূল তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৭২১)।

اے ازل ابدی خدا! مجھے زندگی کا شربت پلا۔

(আয়ে আযল আবদি খোদা! মুঝে যিন্দেগী কা শরবত পিলা)
অর্থ: হে আদি এবং অন্তের খোদা! আমাকে জীবন সূধা পান করাও। (তাযকেরা, পৃ. ৭০৭)।

সন্তান-সন্ততির জন্য দোয়া

رَبِّ هَبْ لِيْ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

(রাব্বি হাব লি যুররিয়্যাতান তাইয়্যেবাতান)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে পবিত্র সন্তান-সন্ততি দান কর। (তাযকেরা, পৃ. ৭৩৮)।

رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ـ

(রাব্বি লা তাযারনি ফারদাওঁ ওয়া আনতা খায়রুল ওয়ারিসিন)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে একাকী ছেড়ে দিও না এবং তুমি উত্তরাধীকারীগণের মধ্যে উত্তম। (তাযকেরা, পৃ. ৪৭)।

নিদর্শন দেখার দোয়া

رَبِّ اَرِنِيْ اٰيَةً مِّنَ السَّمَاءِ

(রাব্বি আরিনি আয়াতাম মিনাস সামায়ি)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে আকাশ হতে একটি নিদর্শন দেখাও। (তাযকেরা, পৃ. ৫৯৪)।

رَبِّ اَرِنِيْ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ

(রাব্বি আরিনি যালযালাতা সা-আতি)

অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে ভূমিকম্প দেখাও, যা প্রচন্ডতায় কিয়ামতের নমুনাস্বরূপ হয়। (তাযকেরা, পৃ.৬০০)।

খারাপ কথা হতে রক্ষা পাওয়ার দোয়া

رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ اِلَيْهِ -

(রাব্বিস সিজনু আহাব্বু ইলায়্যা মিম্মা ইয়াদউনানি ইলায়হি)
অর্থ: হে আমার প্রভু! কারাগার আমার কাছে সেই কথার চেয়েও প্রিয় যার দিকে লোক আমাকে আহ্বান করে। (তাযকেরা, পৃ. ১০৫)।

প্রতিদান চেয়ে দোয়া

رَبِّ اجْزِهِ جَزَآءً اَوْفٰى

(রাব্বি আজযিহি জাযা-আন আওফা)
অর্থ: হে আমার প্রভু! তাকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিদান দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৫১৫)।

আগুনের ওপর বিজয়ী হবার দোয়া

رَبِّ سَلِّطْنِيْ عَلَى النَّارِ

(রাব্বি সাল্লিতনি আলান নার)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আগুনের ওপর আমাকে বিজয়ী করে দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৫৯১)

পুণ্যাত্মাগণের সাথে সাক্ষাৎ করার দোয়া

رَبِّ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ -

(রাব্বি তাওয়াফ্ফানি মুসলিমাওঁ ওয়ালহিকনি বিস সালিহিন)
অর্থ: হে আমার প্রভু! ইসলামের ওপর আমাকে মৃত্যু দান কর এবং পুণ্যাত্মাগণের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৬৬০)।

অসম্মান হতে সুরক্ষার দোয়া

رَبِّ لَا تُبْقِ لِيْ مِنَ الْمُخْزِيَاتِ ذِكْرًا -

(রাব্বি লা তুবকি লি মিনাল মুখযিয়াতি যিকরান)
অর্থ: হে আমার প্রভু! অসম্মান হওয়ার কোন কথাই আমার জন্য বাকী রেখো না। (তাযকেরা, পৃ. ৬৬৬)।

ভূমিকম্প এবং মৃত্যু না দেখার দোয়া

رَبِّ لَا تُرِنِيْ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ - رَبِّ لَا تُرِنِيْ مَوْتَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ

(রাব্বি লা তুরিনি যালযালাতাস্ সাআতি। রাব্বি লা তুরিনি মাওতা আহাদিম মিনহুম)
অর্থ: হে আমার প্রভু! আমাকে কিয়ামতের ভূমিকম্প দেখিও না। হে আমার প্রভু! তাদের মধ্য হতে কারও মৃত্যু আমাকে দেখিও না। (তাযকেরা, পৃ. ৫৯৩)।

বিবিধ দোয়া

اِيْلِيْ اِيْلِيْ لِمَا سَبَقْتَنِيْ

(ইলি ইলি লামা সাবাকতানি)
অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! হে আমার আল্লাহ্! তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে? (হিব্রু ভাষায় দোয়া) (তাযকেরা, পৃ. ১০৫)।

اِيْلِيْ اِيْلِيْ لِمَا سَبَقْتَنِيْ اِيْلِيْ اٰوس

(ইলি ইলি লামা সাবাকতানি ইলি আওস)
অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! হে আমার আল্লাহ্! তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করলে। হে আমার আল্লাহ্! আমাকে পুরস্কৃত কর। (তাযকেরা, পৃ. ৯৪)।

رَبِّ اَخِّرْ وَقْتَ هٰذَا

(রাব্বি আখ্খির ওয়াকতা হাযা)
অর্থ: হে আমার আল্লাহ! (যে ভূমিকম্প সামনে দেখা যাচ্ছে তা) কিছু সময়ের জন্য পিছনে সরিয়ে দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৫৯৯)।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْ هٰذِهِ الرُّؤْيَا

(আল্লাহুম্মা বারিক লি ফি হাযিহির রুইয়া)

অর্থ: হে আল্লাহ্! এ স্বপ্নকে আমার জন্য কল্যাণমন্ডিত করে দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৮৩৫)।

یا اللہ! اب شہر کی بلائیں بھی ٹال دے۔

(ইয়া আল্লাহ! আব শেহের কি বালায়েঁ ভি টাল দে)

অর্থ: হে আল্লাহ্! এখন শহরের দূরাবস্থাও দূরীভূত করে দাও। (তাযকেরা, পৃ. ৭০২)।

দ্বীনি মা'লুমাত
(ধর্মীয় জ্ঞান)

ইসলামের মৌলিক ধারণা ও প্রাথমিক কাল

- ★ আল্লাহ্ তা'লা
- ★ ইসলাম
- ★ কুরআন মজীদ
- ★ বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)
- ★ এক নজরে মুস্তফা (সা.) চরিত
- ★ হাদীস
- ★ খোলাফায়ে রাশেদীন
- ★ আসহাবে রসূল (সা.) (রসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ)
- ★ বুযুর্গানে ইসলাম (ইসলামের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ)
- ★ ইসলামের ইতিহাস
- ★ বিবিধ (১)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্ তা'লা

প্র. আল্লাহ্ তা'লার মৌলিক নাম কী? এর অর্থ কী?

উ. আল্লাহ্ তা'লার মৌলিক নাম 'আল্লাহ'। এর অর্থ এর মাঝে সব সৌন্দর্য একীভূত হয়েছে এবং এ নাম যাবতীয় দোষমুক্ত। আল্লাহ্ তা'লার এই মৌলিক নাম কেবলমাত্র তাঁর জন্যই প্রযোজ্য।

প্র. আল্লাহ তা'লার প্রধান চারটি গুণবাচক নাম কী কী?

উ. রাব (প্রভু-প্রতিপালক), রাহ্মান (পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী), রাহীম (বার-বার দয়াকারী), মালিক (সর্বাধিপতি)।

প্র. কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'লার কতটি গুণবাচক নাম বর্ণিত হয়েছে? নামগুলো কী কী?

উ. আল্লাহ তা'লা যেমন অনন্ত-অসীম, তাঁর নাম এবং গুণাবলীও অনন্ত-অসীম। কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তা'লার ১০৪ টি গুণবাচক নাম বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- আল্ কুদ্দুস (অতি পবিত্র), আস্ সালাম (পরম শান্তিময়), আল্ মু'মিন (পূর্ণ নিরাপত্তাদাতা), আল্ জাব্বার (প্রবল প্রতিবিধায়ক), আল্ মুতাকাব্বির (অতিব গরীয়ান/উচ্চমর্যাদাবান), আল্ খালিক্ (একমাত্র সৃষ্টিকর্তা), আল্ বারী (আদি সুনিপুণ স্রষ্টা), আর্ রায্যাক (সর্বোত্তম রিযিকদাতা), আল্ আলীম (সর্বজ্ঞ), আর্ রাফী (মর্যাদায় উন্নতি দানকারী), আস্ সামী (সর্বশ্রোতা), আল্ বাসীর (সর্বদ্রষ্টা), আল্ হাকীম (পরম প্রজ্ঞাময় বিচারক), আল্ আদীল (পূর্ণ ন্যায়বিচারক), আল্ লতীফ (সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম), আল্ খাবীর (সর্ববিদিত), আল হাইয়্যুন (চিরঞ্জীব-জীবনদাতা), আল্ কাইয়্যুম (চিরস্থায়ী-স্থিতিদাতা), আল্ আলিয়্যুন (অতি উচ্চ), আল্ আ'যীম (অতি মহান) ইত্যাদি।

প্র. আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের একটি প্রমাণ কুরআন মজীদ হতে পেশ করুন।

উ. আল্লাহ্ তা'লার রসূলগণ সবসময় পরিণামে সফলতা লাভ করবেন। যেমন : কুরআন মজীদে বলা হয়েছে-

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغۡلِبَنَّ اَنَا وَ رُسُلِیۡ ؕ

(কাতাবাল্লাহু লাআগ্‌লিবান্না আনা ওয়া রুসূলী)

অর্থ: আল্লাহ্ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন (আল্লাহ এটি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন) "নিশ্চয় আমি এবং আমার রসূলগণই বিজয়ী হব।" (সূরা মুজাদিলা : ২২)।

প্র. আল্লাহ্ তা'লার কী কোন সদৃশ আছে?

উ. না, আল্লাহ তা'লার কোন সদৃশ নেই। কেননা তিনি বলেছেন-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

(লাইসা কামিসলিহি শাইয়্যুন)

অর্থ: তাঁর মত আর কেউই নেই। (সূরা আশ্ শূরা : ১২)।

প্র. আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী?

উ. আল্লাহ্র ইবাদত করা। আল্লাহ্ তা'লা এ সর্ম্পকে বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

(ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়া'বুদুনি)

অর্থ: আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যে। (সূরা আয্-যারিয়াত : ৫৭)।

ইসলাম

প্র. ইসলাম মানে কী ?

উ. পরিপূর্ণ আনুগত্য এবং পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ।

প্র. ইসলাম কী ?

উ. খোদার জন্য ফানা বা বিলীন হয়ে যাওয়া, খোদার ইচ্ছায় নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করে দেয়ার নামই ইসলাম।

প্র. ইসলামের স্তম্ভ কয়টি ও কী কী?

উ. পাঁচটি। যথা: ১) কলেমা, ২) নামায, ৩) রোযা, ৪) হজ্জ, ৫) যাকাত

প্র. ঈমানের বিষয় কয়টি ও কী কী?

উ. ছয়টি। আল্লাহ্র ওপর, তাঁর ফিরিশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের ওপর, তাঁর নবীগণের ওপর ও পরকালের ওপর ঈমান আনা এবং ভাল ও মন্দের নিয়তির ওপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা।

প্র. আল্লাহ্ তা'লার একমাত্র মনোনীত ধর্ম কোনটি?

উ. ইসলাম। এ সর্ম্পকে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা হচ্ছে,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

(ইন্নাদ্ দ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম)

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তা'লার নিকট ইসলামই মনোনীত ধর্ম। (সূরা আলে ইমরান : ২০)।

প্র. ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে ইসলামের মহান শিক্ষা কী?

لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

(লা ইকরাহা ফিদ্দ্বীন)

অর্থ: ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। (সূরা বাকারা : ২৫৭)।

প্র. যে তোমাকে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে তার ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

উ. وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا

(ওয়ালা তাকুলু লিমান আলকা ইলাইকুমুস্ সালামা লাসতা মু'মিনান)

অর্থ: যে তোমাদের সালাম দেয় তাকে 'তুমি মুমিন নও' একথা বলো না। (সূরা নিসা : ৯৫)।

প্র. মুসলমানদের প্রথম কিবলা কোনটি ছিল?

উ. বায়তুল মাকদাস (পবিত্র ঘর), যেরুযালেম, ফিলিস্তিন।

প্র. কয়েকজন প্রধান ফিরিশ্তার নাম লিখুন।

উ. জীব্রাঈল, মীকাঈল, ইস্রাফীল এবং আযরাঈল।

কুরআন মজীদ

প্র. কুরআন মজীদে কতটি সূরা, কতটি আয়াত, কতটি রুকু, কতটি শব্দ এবং কতটি মঞ্জিল আছে?

উ. ১১৪টি সূরা, ৬৩৪৮টি আয়াত, ৫৫৮টি রুকু, ৮৬৪৩০টি শব্দ এবং ৭টি মঞ্জিল আছে। (দ্বীনি মালুমাত, ম.খো.আ. পাকিস্তান, পৃ. ০৪)।

নোট: আয়াত এবং শব্দের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। কারণ কেউ-কেউ বিসমিল্লাহ্কে আয়াতের সাথে গণনা করে থাকেন আবার অন্য অনেকে আছেন যারা আয়াত গণনা করেন না। সর্বসম্মত মত হল, পবিত্র কুরআন অবিকল তা-ই রয়েছে যা আঁ-হযরত (সা.)-এর ওপর নাযিল হয়েছিল। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সর্বান্তকরণে বিসমিল্লাহ্কে পবিত্র কুরআনের আয়াত হিসেবে গণনা করে থাকে। কেননা বিসমিল্লাহ্কে আয়াত না ধরলে সূরা ফাতিহায় ৭টি আয়াত পাওয়া যায় না। অতএব, বিসমিল্লাহ্সহ পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা হল ৬৩৪৮টি।

প্র. কুরআন করীম একত্র ও বিন্যস্ত করা সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উ. নবী আকরাম (সা.) স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার ওহীর মাধ্যমে কুরআন করীম একত্র ও সুবিন্যস্ত করেছেন এবং এটিকে লিখে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর খিলাফতের সময়ে হযরত যায়েদ বিন হারিস (রা.)-এর মাধ্যমে

(যিনি একজন কাতেবে ওহী ছিলেন) সেই লিখিত কুরআন করীমকে বাঁধিয়ে একটি গ্রন্থের আকারে হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)-এর কাছে সংরক্ষণ করেন। শেষে হযরত উসমান (রা.) তাঁর খিলাফতের সময় উক্ত কুরআনের কতগুলো কপি তৈরি করিয়ে এক একটি কপি বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে প্রেরণ করেন। আজ আমাদের মাঝে হুবহু সেই কুরআনই বিদ্যমান আছে।

(দিবাচাহ্ তাফসীরুল কুরআন, লেখক : হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.), পৃ. ২৫৭)

প্র. পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম কখন, কোথায় অবতীর্ণ হয়?

উ. পবিত্র কুরআন ৬১০ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরি পূর্ব ১২ সনের রমযান মাসের শেষ দশ দিনের সোমবার লাইলাতুল কদরের রাত্রিতে হেরা পর্বতের গুহায় অবতীর্ণ হয়।

প্র. ওহী হবার পর হযরত খাদিজা (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কার কাছে নিয়ে যান?

উ. হযরত খাদিজা (রা.)-এর চাচাতো ভাই খ্রিস্টান পন্ডিত হযরত ওরাকা বিন নাওফালের কাছে।

প্র. প্রথম ওহী অবতীর্ণ হবার পর কত দিন পর্যন্ত ওহী নাযিল বন্ধ ছিল? এ সময়কে কী নামে ডাকা হয়?

উ. ৪০ দিনের জন্য। এ সময়কে 'ফাতরাত' (দুই ওহীর মাঝখানের বিরতি)-এর সময় বলা হয়।

প্র. ফাতরাতের সময় অতিক্রান্ত হবার পর কোন সূরা সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়?

উ. 'ইয়া আইয়্যুহাল মুদ্দাস্‌সির' হে পোষাকাবৃত ব্যক্তি। (সূরা আল মুদ্দাস্‌সির, ৭৪ নং সূরা)।

প্র. কুরআন করীমের হিফাযতের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লা কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন?

উ.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

(ইন্না নাহনু নায্‌যালনায্ যিক্‌রা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন)

অর্থ : নিশ্চয় আমরাই এ যিক্‌র (কুরআন) নাযিল করেছি এবং নিশ্চয় আমরা এর হেফাযতকারী। (সূরা হিজর: ১০)।

প্র. কুরআন করীমের প্রথম দু'টি সূরা এবং শেষ দু'টি সূরার নাম কী?

উ. প্রথম দু'টি সূরার নাম হলো সূরা ফাতিহা এবং সূরা বাকারা। শেষ দু'টি হল সূরা ফালাক ও সূরা নাস। শেষ দু'টি সূরাকে একত্রে 'মুআওভেযাতান' (নিরাপত্তা দানকারী যুগল) বলা হয়। কেননা এ উভয় সূরাই 'কুল আউযু' দিয়ে শুরু হয়েছে। এই দুই সূরায় আখেরী যুগের ফেতনার হাত থেকে রক্ষা পাবার দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

প্র. কুরআন করীমের সর্বাপেক্ষা বড় এবং সর্বাপেক্ষা ছোট সূরা কী?

উ. সবচেয়ে বড় সূরা হল সূরা বাকারা এবং সবচেয়ে ছোট সূরা হল সূরা কাউসার।

প্র. বর্তমান বিন্যাস হিসেবে কুরআন করীমের সর্বপ্রথম আদেশ কী?

উ.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(ইয়াআয়্যুহান্নাসু'বুদু রাব্বাকুমুল্লাযী খালাক্বাকুম ওয়াল্লাযীনা মিন ক্বাবলিকুম লা'আল্লাকুম তাত্তাকুন)

অর্থ : হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পার। (সূরা বাকারা: ২২)।

প্র. সূরা ফাতিহায় কয়টি দলের কথা উল্লেখ রয়েছে?

উ. তিনটি দলের কথা। যথা: ১) আনআমতা আলাইহিম, (পুরস্কারপ্রাপ্ত), ২) মাগযুব (অভিশপ্ত), ৩) যাল্লিন (পথভ্রষ্ট)।

প্র. সূরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াতে কত প্রকারের লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ?

উ. তিন প্রকার লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যথা: মুত্তাকী (খোদাভীরু), কাফির (অস্বীকারকারী) এবং মুনাফিক (কপট)।

প্র. কুরআন করীম কতদিনে নাযিল হয়েছে?

উ. প্রায় ২৩ বছরে।

প্র. কুরআন করীমে যেসব শরীয়তধারী নবীর উল্লেখ আছে তাঁদের নাম লিখুন।

উ. হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)।

প্র. নবীদের নামে নামকরণ হয়েছে এমন সব সূরার নাম লিখুন?

উ. সূরা ইউসুফ, সূরা হুদ, সূরা ইবরাহীম, সূরা মুহাম্মদ, সূরা নূহ, সূরা লুকমান।

প্র. কুরআন করীমে যেসব নবীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের নাম লিখুন ?

উ. হযরত আদম (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত লূত (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.), হযরত ইসহাক (আ.), হযরত ইয়াকুব (আ.), হযরত ইউসুফ (আ.), হযরত হূদ (আ.), হযরত সালেহ (আ.), হযরত শুয়াইব (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত হারূন (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত ইলিয়াস (আ.), হযরত ইউনূস (আ.), হযরত যুলকিফল (আ.), হযরত আল্ইয়াসা (আ.), হযরত ইদ্রীস (আ.), হযরত আইউব (আ.), হযরত যাকারিয়া (আ.), হযরত ঈসা (আ.), হযরত লুকমান (আ.), হযরত উযায়ির (আ.), হযরত যুলকারনাইন (আ.), হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং শেষ যুগে আগমনকারী উম্মতী নবী হযরত আহমদ (আ.)-সহ সর্বমোট ২৮ জন।

প্র. কুরআন করীমে কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ রয়েছে? সূরার নাম বলুন?

উ. যায়েদ বিন হারিস (সা.)-এর নাম। সূরা আহযাব : ৩৮ নং আয়াতে তাঁর নাম

এসেছে।

প্র. কুরআন করীমের কোন সূরার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ্' নেই এবং কেন?

উ. সূরা 'তওবা'-র প্রথমে বিসমিল্লাহ্ নেই। কেননা এটি সূরা আনফালের অংশ-বিশেষ।

প্র. কুরআন করীমের কোন সূরায় বিসমিল্লাহ্ দু'বার আছে?

উ. সূরা নামলে (প্রথমে আয়াতে একবার এবং ৩১ নং আয়াতে আরেকবার)।

প্র. কুরআন করীমে আঁ-হযরত (সা.)-এর নাম (মুহাম্মদ) কতবার উল্লেখ করা হয়েছে? উদাহরণ দিন।

উ. চারবার। এগুলো হল- ১) সূরা আলে ইমরান : ১৪৫, ২) সূরা মুহাম্মদ : ০৩, ৩) সূরা আহযাব : ৪১, ৪) সূরা ফাতহ্ : ৩০

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

(মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযিনা মা'আহু আশিদ্দাউ আলাল কুফ্ফারি রুহামাউ বায়ন-াহুম)

অর্থ: মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল। আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর (এবং) পরস্পরের প্রতি কোমল। (সূরা ফাতহ: ৩০)

প্র. নাযিল হবার দিক হতে পবিত্র কুরআনের সর্বশেষ সূরার নাম কী?

উ. সূরা আন্ নাসর। (১১০ নং সূরা)।

প্র. কুরআন মজীদে কোথায় আঁ-হযরত (সা.)-এর 'খাতামান্নাবীঈন' এবং 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

উ. **খাতামান্নাবীঈন:** সূরা আহযাবের ৪১ নং আয়াত-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ

(মা কানা মুহাম্মাদুন আবা আহাদিম্ মির্ রিজালিকুম ওয়ালাকির্ রাসূলাল্লাহি ওয়া খাতামান্নাবীঈন)

অর্থ: হযরত মুহাম্মদ (সা.) তোমাদের পুরুষদের (বয়ঃপ্রাপ্ত) কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহ্র রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন (নবীদের মোহর)।

রাহমাতুল্লিল আলামীন : সূরা আম্বিয়ার ১০৮ নং আয়াত-

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

(ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহ্মাতাল্লিল আলামীন)

অর্থ: আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।

প্র. 'লায়লাতুল কদর' বলতে কী বুঝেন?

উ. 'লায়লাতুল কদর' হলো সেই পবিত্র রাত যে রাতে কুরআন করীম নাযিল হওয়া আরম্ভ হয় এবং যার মাহাত্ম্য বর্ণনায় আল্লাহ তা'লা বলেছেন-

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝

(লায়লাতুল কাদ্রি খায়রুম্ মিন আলফি শাহ্রিন)

অর্থ: লাইলাতুল কদর হাজার মাস হতেও উত্তম।

আঁ-হযরত (সা.) রমযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোর মাঝে একে অন্বেষণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ রাতে খোদা তা'লা তাঁর বান্দার অনেক কাছে চলে আসেন এবং তাদের দোয়াসমূহকে কবুলিয়্যতের মর্যাদা দান করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "যে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আগমন হয় সে যুগকেও লায়লাতুল কদর বলা হয়।"

প্র. কুরআন করীমে যেসব ফলের কথা বর্ণিত আছে সেগুলোর নাম লিখুন।

উ. রুম্মান (ডালিম), ইনাব (আঙ্গুর), তীন (ডুমুর), তালহুন (কলা), যয়তুন (জলপাই), নাখলুন (খেজুর)।

প্র. কুরআন করীমে উল্লেখিত কিছু পশুর নাম লিখুন।

উ. জামালুন (উট), গানামুন (বকরী), জাননুন (দুম্বা/ভেড়া), বাকারাতুন (গাভী), ক্বালবুন (কুকুর), খিনজির (শূকর), খাইলুন (ঘোড়া), বিগালুন (খচ্চর), হিমারুন (গাধা), ফিলুন (হাতি), কাসওয়ারাতুন (বাঘ), যে'বুন (নেকড়ে), ইজলুন (বাছুর), না'জাতুন (মেষ/ভেড়ী), কিরাদাতুন (বানর)।

প্র. কুরআন করীমে বর্ণিত কতিপয় জাতির নাম লিখুন।

উ. হযরত নূহ (আ.)-এর জাতি [আর্মেনিয়ায় বসবাস করত], আদ জাতি [হযরত হূদ (আ.)-এর জাতি], সামূদ জাতি [হযরত সালেহ (আ.)-এর জাতি], আসহাবিল বাস, [সামূদ জাতির একটি শাখা], আসহাবিল আইকাহ [হযরত শুয়াইব (আ.)-এর জাতি], হযরত লূত (আ.)-এর জাতি, ফেরাউনের জাতি [হযরত মূসা (আ.) এবং বনী ইসরাঈলের ওপর যারা অত্যাচার করেছিল], আসহাবিল ফীল [ইয়েমেনের লোক যারা হস্তী বাহিনী নিয়ে কা'বা গৃহ ধ্বংস করতে এসেছিল]।

প্র. পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে সূরা ফাতিহার কী কী নাম পাওয়া যায়?

উ. সূরা ফাতেহার অনেক নাম রয়েছে। তবে অধিক প্রমাণসিদ্ধ হলো- ফাতেহাতুল কিতাব (ঐশী কিতাবের উদ্বোধনী সূরা), আস্ সালাত (নামায), আল হাম্দ (প্রশংসা), উম্মুল কুরআন (কুরআন-জননী), আল কুরআনুল আযীম (মহান কুরআন), উম্মুল কিতাব (কিতাব-জননী), আস্ সাব'উল মাসানী (সাতটি বার-বার আবৃত্ত আয়াত), আশ্ শিফা (আরোগ্য), আর্ রুকাইয়া (রক্ষাকবচ), আল কানয (ধনভান্ডার)।

প্র. পবিত্র কুরআনে কোন দু'টি সূরাকে 'আয যাহরাওয়ান' (দু'টি উজ্জ্বল ফুল) বলা হয়?

উ. সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরান-কে।

প্র. রসূল (সা.) কোন সূরাকে কুরআনের চূড়া বা শীর্ষ বলে আখ্যায়িত করেছেন?

উ. সূরা বাকারা-কে।
প্র. পবিত্র কুরআনের সবচেয়ে বড় আয়াত কোনটি?
উ. সূরা বাকারার ২৮৩ নং আয়াত।
প্র. সূরা বাকারার সারাংশ কোন আয়াতকে বলা হয়?
উ. ১৩০ নং আয়াতকে। কেননা এ আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলো ধারাবহিকভাবে এ দীর্ঘ সূরাতে পর্যালোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথমে নিদর্শনাবলী, এরপর শরীয়ত, তারপর শরীয়তের তাৎপর্য এবং অবশেষে জাতীয় উন্নতির পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে।
প্র. হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) তাদের বংশে একজন মহান নবী তথা মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের জন্য যে দোয়া করেছিলেন তা কোথায় বর্ণিত আছে?
উ. সূরা বাকারার ১৩০ নং আয়াতে।
প্র. সূরা আলে ইমরানের আর কী কি নাম রয়েছে?
উ. আয্ যাহরা (একটি উজ্জ্বল ফুল), আল আমান (শান্তি), আল কানয (সম্পদ), আল মুয়িনাহ (সাহায্যকারী), আল মুজাদালাহ (পরস্পর বিতর্ক), আল ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), তৈয়্যবা (পবিত্র)।
প্র. পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আশহুরুল হারাম (সম্মানিত মাস) কয়টি ও কী কী?
উ. সম্মানিত মাস হলো চারটি। এগুলো হলো- মুহররম, রজব, যিলকদ, যিলহজ্জ। এসব মাসে যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
প্র. পবিত্র কুরআনে বায়তুল আতিক (প্রাচীন গৃহ) বলতে কোন গৃহকে বুঝানো হয়েছে?
উ. কাবা শরীফ-কে।
প্র. মক্কা উপত্যকার পুরাতন নাম কী? এর উল্লেখ কোথায় পাওয়া যায়?
উ. মক্কার পুরাতন নাম হলো 'বাক্কা'। সূরা আলে ইমরানের ১৯৭ নং আয়াতে এর উল্লেখ আছে।
প্র. নাযিল হওয়ার দিক হতে কুরআন করীমের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ আয়াত দু'টি কী কী?
উ. কুরআন করীমের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত :

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ

(ইক্বরা বিস্মি রাব্বিকাল্লাযী খালাক্ব)

অর্থ: পাঠ কর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আলাক্ব : ২)
কুরআন করীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত :
সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনা আছে; অধিকাংশের মতানুসারে নিম্নের আয়াতকে সর্বশেষ আয়াত বলা হয়-

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

(আল্ ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম ওয়া আত্মামতু আ'লায়কুম নি'মাতি ওয়া রাযীতু লাকুমুল ইসলামা দ্বীনা)
অর্থ: আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিয়ামতকে (অনুগ্রহকে) সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদা: ৪)।
একটি বিখ্যাত বর্ণনায় নিম্নের আয়াতকে সর্বশেষ আয়াত বলা হয়েছে :

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ

(ওয়াত্তাকু ইয়াওমান তুরজা'উনা ফীহি ইলাল্লাহ্)

অর্থ: এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (সূরা বাকারা : ২৮২)।
প্র. আখেরী যুগে নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবার কথা কুরআন করিমের কোথায় বর্ণিত আছে?
উ. সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে।
প্র. কোন সূরা নাযিল হবার পর হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছিলেন, 'এ সূরা আমার অকালবার্ধক্য এনে দিয়েছে?
উ. সূরা হূদ।
প্র. পবিত্র কুরআনে রসূল (সা.)-কে বার-বার কী নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে?
উ. আল্লাহ্র নূর বা জ্যোতি। যেমন: সূরা নিসা: ১৭৫, সূরা মায়েদা: ১৭, সূরা নূর: ৩৬, সূরা তাগাবুন: ০৯, সূরা সাফ্ফ: ০৯।
প্র. কোন সূরা অবতীর্ণ হবার সময় ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) ফেরেশতা প্রহরী হিসেবে কাজ করেছিল বলে উল্লেখ রয়েছে?
উ. সূরা কাহাফ।
প্র. রসূল (সা.) দাজ্জালের ফেতনা থেকে রক্ষা পাবার জন্য কী পড়তে বলেছেন?
উ. সূরা কাহাফের প্রথম ১০ আয়াত এবং শেষ ১০ আয়াত সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করতে বলেছেন।
প্র. খতমে নবুওয়তের আশিস ও কল্যাণ, ওফাতে মসীহ্ (আ.) এবং সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্বপক্ষে কুরআন মজীদ হতে একটি করে উদ্ধৃতি দিন।
উ. ক) খতমে নবুওয়াতের আশিস ও কল্যাণ :

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ

(ওয়ামাইয়্যুতি'ইল্লাহা ওয়ার্রাসূলা ফাউলাইকা মা'আল্লাযীনা আন্আ'মাল্লাহু আ'লায়হিম মিনান্ নাবীয়্যীনা ওয়াস্ সিদ্দীকীনা ওয়াশ্ শুহাদায়ি ওয়াস্সালিহীন)

অর্থ: আর যে (সব ব্যক্তি) আল্লাহ্ ও এ রসূলের আনুগত্য করবে এরাই তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাদের আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন (এরা) নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহদের (অন্তর্ভুক্ত হবে)। (সূরা নিসা : ৭০)।

খ) ওফাতে মসীহ্ (আ.) :

কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'লা হযরত ঈসা (আ.)-কে তাঁর অনুসারীদের পদস্খলন সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবেন তখন হযরত ঈসা (আ.) নিজে বলবেন-

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ

(ওয়া কুনতু আ'লায়হিম শাহীদাম্ মা-দুমতু ফীহিম ফালাম্মা তাওয়াফ্ফায়তানী কুন্তা আনতার্ রাক্বীবা আ'লায়হিম)

অর্থ: এবং আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম, এরপর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে। (সূরা মায়েদা : ১১৮)।

গ) সাদাকাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) : এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে-

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

(ফাক্বাদ লাবিসতু ফীকুম উমুরাম্ মিনক্বাবলিহী আফালা তা'কিলুন)

অর্থ: নিশ্চয় আমি ইতোপূর্বে তোমাদের মাঝে এক সুদীর্ঘকাল জীবন যাপন করেছি, তবুও কী তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না ? (সূরা ইউনূস : ১৭)।

তেমনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ও তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে আমার জীবনে দোষারোপ করতে পার"? (তাযকেরাতুশ শাহাদাতাইন, বাংলা অনুবাদ, পৃ.৭৭)।

প্র. জুমুআর নামায ও দুই ঈদের নামাযে হুযূর (সা.) কোন দু'টি সূরা পাঠ করতেন?

উ. সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া।

প্র. কোন সূরাকে রসূল (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা বলে অভিহিত করেছেন?

উ. সূরা ইখলাস-কে।

প্র. কোন সূরাকে পবিত্র কুরআনের হৃদয় আখ্যা দেয়া হয়েছে?

উ. সূরা ইয়াসীন-কে।

প্র. কুরআনে রসূল (সা.)-কে কী কী উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে?

উ. আল মুয্যাম্মিল (চাদরাবৃত ব্যক্তি), আল মুদ্দাসসির (পোষাকাবৃত ব্যক্তি), আব্দুল্লাহ (আল্লাহ্র বান্দা), আল ইনসান (পরিপূর্ণ মানব), ত্বা-হা (পবিত্র ও পথ প্রদর্শক)।

প্র. কুরআন শরীফে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত বলতে কোন মসজিদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

উ. মসজিদে কুবা।

প্র. কুরআন মজীদে উম্মতে মোহাম্মাদীয়াকে কী কি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে?

উ. খায়রা উম্মাতিন (সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত), সূরা আলে ইমরান: ১১১, এবং উম্মাতান ওসাতান (মধ্যমপন্থী উত্তম উম্মত), সূরা বাকারা : ১৪৫।

প্র. রসূল (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে পবিত্র কুরআনে মুমিনদের কী বলা হয়েছে?

উ. উম্মুল মু'মিনীন বা মু'মিনদের মাতা বলা হয়েছে। (সূরা আহযাব: ৭ নং আয়াত)।

প্র. পবিত্র কুরআনে কোন নবীর নাম ইসরাঈল রাখা হয়েছে?

উ. হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর নাম।

প্র. কুরআন শরীফে যুননূন (মাছওয়ালা) দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে?

উ. হযরত ইউনূস (আ.)-কে।

প্র. শেষ যুগে আগত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতেই বিশ্বব্যাপী ইসলাম বিজয় লাভ করবে বলে পবিত্র কুরআনের কোথায় ইংগিত করা হয়েছে?

উ. সকল মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে একমত, এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে পূর্ণ হবে। আয়াতটি হল-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۝

(হুয়াল্লাযি আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দ্বিনীল হাক্কি লিউযহিরাহু আলাদ দ্বিনী কুল্লিহি ওয়ালাও কারিহাল মুশরিকুন)

অর্থ: তিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি তাকে সব ধর্মের ওপর বিজয় দান করেন। আর মুশরিকরা যত অপছন্দই করুক না কেন (তিনি তা দান করবেন)। (সূরা আস্ সাফ্ফ : ১০)।

প্র. রসূল (সা.) সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য আগমন করেছেন এ সম্পর্কে একটি আয়াত উপস্থাপন করুন।

উ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

(ইয়া আইয়্যুহান্নাসু ইন্নি রাসূলুল্লাহি ইলায়কুম জামিয়ান)

অর্থ: হে মানুষ ! নিশ্চয় আমি তোমাদের সবার জন্য আল্লাহ্র রসূল। (সূরা আরাফ : ১৫৯)।

প্র. কুরআন করীমের একজন প্রাচীন তফসীরকারকের নাম লিখুন।

উ. তফসীরে কবীরের প্রণেতা হযরত আল্লামা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রাহে.)।

বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)

প্র. রসূলুল্লাহ্ (সা.) কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ. ৯ রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দের সোমবার বর্তমান সৌদি আরবের মক্কা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। (সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, পৃ. ৯৩)।
প্র. হযরত রসূলে করিম (সা.)-এর নাম, কুনিয়াত (পারিবারিক নাম) এবং লকব (উপাধি) লিখুন।
উ. তাঁর পবিত্র নাম: মুহাম্মদ (সা.), কুনিয়াত: 'আবুল কাসেম' (কাসেমের পিতা) এবং লকব: 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) এবং 'আস্ সুদুক' (অধিক সত্যবাদী)।
প্র. তাঁর (সা.) দাদা, পিতা এবং মাতার নাম কী?
উ. দাদা: হযরত আব্দুল মুত্তালিব, পিতা: হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং মাতা: হযরত আমিনা বিনতে ওয়াহ্হাব।
প্র. তাঁর পিতা এবং মাতার কখন মৃত্যু হয়?
উ. তাঁর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ তাঁর জন্মের ছয় মাস পূর্বে ইন্তেকাল করেন এবং মাতা তাঁর ছয় বছর বয়সের সময় ইন্তেকাল করেন।
প্র. তাঁর দুধ মাতার নাম কী?
উ. হযরত হালিমা সা'দিয়া বিন্তে আবু যুরাইব (রা.)। তিনি হাওয়াজিন বংশের বনী সা'দ গোত্রের একজন মহিলা ছিলেন।
প্র. মায়ের মৃত্যুর পর কে শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখাশুনা করেন?
উ. পিতামহ হযরত আব্দুল মুত্তালিব। পরে তিনিও মারা গেলে শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখাশুনা করেন তাঁর চাচা হযরত আবু তালিব।
প্র. আঁ-হযরত (সা.) কত বছরে, কার সাথে প্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন?
উ. পঁচিশ বছর বয়সে হযরত খাদীজাতুল কুবরা বিন্তে খুওয়াইলিদ (রা.)-এর সাথে। তখন হযরত খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। হযরত খাদীজা (রা.)-এর লকব বা উপাধি ছিল 'তাহেরা' ।
প্র. আঁ-হযরত (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের নাম লিখুন।
উ. ১) হযরত খাদীজাতুল কুব্রা (রা.), ২) হযরত সওদা বিনতে জাম'আ (রা.) ৩) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বিন্তে আবু বকর (রা.), ৪) হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.), ৫) হযরত যয়নাব বিন্তে খুজায়মা (রা.), ৬) হযরত উম্মে সালমা হিন্দ বিন্তে উমাইয়া (রা.), ৭) হযরত যয়নব বিন্তে জুহাশ (রা.), ৮) হযরত জুয়ায়রিয়া বিন্তে হারিস (রা.), ৯) হযরত সাফিয়া বিন্তে হুয়ায়ি বিন আখতাব (রা.), ১০) হযরত উম্মে হাবিবা বিন্তে আবু সুফিয়ান (রা.), ১১) উম্মে ইব্রাহীম হযরত মারিয়া কিবতিয়াহ্ (রা.) এবং ১২) হযরত মায়মুনা বিন্তে হারিস (রা.)।

একসঙ্গে চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা কেবলমাত্র তাঁর জন্য বৈধ করা হয়েছিল। এ বর্ণনা সূরা আহ্যাবের ৫১ নং আয়াতে রয়েছে। হযরত রসূল করিম (সা.)-এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর বিয়ের সময় বয়স ছিল ৪০ বছর এবং তাঁর (সা.) বাকী সমস্ত বিয়ে হযরত খাদীজা (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হয়েছিল। হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত মারিয়া কিবতিয়াহ্ (রা.) নবী করিম (সা.)-এর কুমারী স্ত্রী ছিলেন আর অন্যান্যরা কেউ ছিলেন বিধবা, আবার কেউ ছিলেন তালাকপ্রাপ্তা।
প্র. আঁ-হযরত (সা.)-এর সাহেবযাদীগণের (কন্যা) নাম লিখুন।
১. হযরত যয়নাব (রা.), স্বামী : আবুল আস বিন রাবী (রা.) ২. হযরত রুকাইয়া (রা.) ও ৩. হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)। তাদের বিবাহ আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা এবং উতিবার সাথে হয়েছিল। কিন্তু রোখ্সতনার পূর্বেই বিবাহ ভেঙ্গে যায়। পরে তাদের উভয়ের বিবাহ (একজনের মৃত্যু হলে অপর জনের সাথে) হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। হযরত উসমান (রা.)-কে এজন্য যুন-নূরাইন (দুই নূরের অধিকারী) বলা হয়; ৪. হযরত ফাতেমাতুয যোহরা (রা.), স্বামী : হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.)।
প্র. তাঁর সাহেবযাদাগণের (পুত্র) নাম কী কী?
উ. ১. হযরত কাসেম (রা.), ২. হযরত তাহের (রা.) ৩. হযরত তাইয়্যেব (রা.) (তাঁর আরেক নাম আব্দুল্লাহ্ ছিল) এবং ৪. হযরত ইবরাহীম (রা.)।
প্র. আঁ-হযরত (সা.) কত বছর বয়সে নবুওয়তের দাবি করেন?
উ. চল্লিশ বছর বয়সে।
প্র. তাঁর উপর প্রথম ওহী কোথায় নাযিল হয়?
উ. হেরা পর্বতের গুহায়।
প্র. পুরুষ, নারী, শিশু, দাস, বাদশাহ্, খ্রিস্টান, ফারসি এবং রোমানদের মাঝে কে-কে সর্বপ্রথম তাঁর উপর ঈমান আনয়ন করেন?
উ. পুরুষদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.), মহিলাদের মাঝে হযরত খাদীজা (রা.), বালকদের মাঝে হযরত আলী (রা.), দাসদের মাঝে হযরত যায়েদ বিন হারিস (রা.), বাদশাহ্গণের মাঝে হাব্শি বাদশাহ্ নাজ্জাশী, খ্রিস্টানদের মাঝে ওরাকা বিন নাওফাল, ফারসিদের মাঝে হযরত সালমান ফারসি (রা.) এবং রোমানদের মাঝে হযরত সোহায়েব রূমী (রা.) সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেন।
প্র. রসূলে আকরাম (সা.)-এর মৃত্যুতে হযরত হাসসান বিন সাবেত (রা.) যে শোকগাঁথা আবৃত্তি করেছিলেন তা লিখুন।
উ.

كُنْتَ السَّوَادَ لِنَاظِرِیْ   فَعَمِیَ عَلَیَّ النَّاظِرُ
مَنْ شَآءَ بَعْدَکَ فَلْیَمُتْ   فَعَلَیْکَ کُنْتُ اُحَاذِرُ

(কুন্তাস্ সাওয়াদা লিনাযিরী ফা-আ'মীয়া আ'লায়কান্ নাযিরু
মান্ শা-আ বা'দাকা ফালইয়ামুত্ ফা-আ'লায়কা কুন্তু উহাযিরু)

অর্থ: পংক্তির কাব্যরূপ:
নয়নের মণি ছিলে গো আমার তোমার বিহনে তাই
অন্ধ হলো যে, দু'চোখ আমার আর কোনও আলো নাই
আমারতো কোন ভয় নেই আর আর কারও প্রয়াণের
আমার তো শুধু শংকা ছিল যে তোমারই বিরহের।

প্র. আঁ-হযরত (সা.) যে সকল রাজা-বাদশাহ্দের নামে তবলীগি পত্র প্রেরণ করেছিলেন তাদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম লিখুন।

উ. ১) হিরাক্লিয়াসঃ কায়সার-এ-রোম (রোম সম্রাট), ২) খসরু পারভেজঃ কিসরা (পারস্য সম্রাট), ৩) আসহামাহ নাজ্জাশীঃ আবিসিনিয়ার বাদশাহ, ৪) মুকাউকিসঃ মিসরের বাদশাহ, ৫) মুনসির তাইমিঃ আমীর, বাহরাইন।

প্র. আঁ-হযরত (সা.)-এর একটি পংক্তি বলুন।

উ. اَ نَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ اَنَا اِبْنُ عَبدِ الْمُطَّلِبْ

(আনান নাবিয়্যু লা কাযিব আনা ইবনু আবদিল মুত্তালিব)

অর্থ: আমি নবী, মিথ্যাবাদী নই; আমি আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র।

প্র. মক্কা থেকে হিজরতের পথে মহানবী (সা.) কোন গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন? তাঁর (সা.) সাথে আর কে ছিল?

উ. সওর গুহায়। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন।

প্র. পবিত্র কুরআনে রসূল (সা.)-এর কোন নবীর সাথে সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে?

উ. হযরত মূসা (আ.)। (সূরা মুয্যাম্মিল : ১৬ নং আয়াত)।

প্র. রসূল (সা.)-এর উটনীর নাম কী ছিল?

উ. কাসওয়া।

প্র. রসূল (সা.) সর্বোত্তম গুণাবলীর ধারক-বাহক – এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ তা'লার ঘোষণা কী?

উ. اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

(ইন্নাকা লা'-আলা খুলুকিন আযিম)

অর্থ: নিশ্চয় তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর ওপর অধিষ্ঠিত। (সূরা কলমঃ ৫)।

প্র. আঁ-হযরত (সা.)-এর চরিত্র সম্বন্ধে হযরত আয়েশা (রা.) কী বলেছেন?

উ. كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ

(কানা খুলুকুহুল কুরআন)

অর্থঃ তাঁর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কুরআন। (সহীহ্ বুখারী ও সুনানে আবু দাউদ)।

প্র. হুযূর (সা.) কবে, কোথায় ইন্তেকাল করেন? তাঁর (সা.) রওযা মোবারক কোথায় অবস্থিত?

উ. হুযূর (সা.) ২৬ মে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১১ হিজরির ১লা রবিউল আউয়াল ৬৩ বছর বয়সে মদীনায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাসগৃহেই সমাহিত করা হয়।
(তারিখে আহমদীয়াত, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫২-৫৫৩ এবং দ্বিনী মা'লুমাত, ম.খো.আ. পাকিস্তান, পৃ. ১৬)।

প্র. রসূল (সা.) নবুওয়তের দাবির পর কত বছর জীবিত ছিলেন?

উ. প্রায় ২৩ বছর।

এক নজরে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর চরিত

খ্রিস্টাব্দ	হিজরি পূর্ব সন	বিশেষ ঘটনাবলী
৫৭০	৫৪	● ইয়েমেনের গভর্নর আবরাহা আশরাম হস্তী বাহিনী নিয়ে কা'বা ঘর ধ্বংসের জন্যে মক্কা আক্রমণ করতে এলে দলবলসহ আল্লাহ্‌র ক্রোধের কারণে গুটিবসন্ত ও প্লাবনের শিকার হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ● এ ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ্‌র বিয়ে হয়। ● হযরত আব্দুল্লাহ্ মদীনায় ইন্তেকাল করেন।
৫৭১	৫১	● ৫৭১ (২০ এপ্রিল, সোমবার) ৫১ (৯ রবিউল আউয়াল) হযরত আব্দুল্লাহ্‌র ঔরসে এবং হযরত আমিনার গর্ভে কুরাইশ বংশে আরবের মক্কা নগরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন। ● জন্মের ২ সপ্তাহ পরে লালন-পালনের জন্য তাঁর দুধ মাতা বনু সা'দ গোত্রের হালিমা সা'দিয়ার কাছে তাঁকে দেয়া হয়। সেখানে তিনি ৫ বছর অবস্থান করেন।
৫৭৬	৪৫	● হযরত আমিনা মদীনার পথে আবওয়া নামক স্থানে ইহলোক ত্যাগ করেন। এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।
৫৭৮	৪৩	● দাদা হযরত আব্দুল মুত্তালিব আঁ-হযরত (সা.)-কে ছেড়ে দুনিয়া থেকে চলে যান।
৫৮২	৪০	● ১২ বছর বয়সে চাচা হযরত আবু তালিবের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গমন করেন। বসরায় 'বাহিরা' নামক খ্রিস্টান সাধুর সাথে পরিচয় হয়।

৫৯০ ৩২ ● হরব্ উল ফুজ্জার' বা অন্যায় সমরে ব্যথিত হয়ে 'হিলফুল ফুযূল' সমিতি গঠন করেন।

৫৯৩ ২৯ ● হযরত খাদীজা (রা.)-এর ব্যবসার কাজে নিযুক্ত হন এবং সিরিয়া গমন করে ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হন। এ সময় তিনি 'আমীন' উপাধিতে খ্যাত হন।

৫৯৫ ২৭ ● হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.)-এর (৪০) সাথে আঁ-হযরত (সা.) (২৫) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত আবু তালিব ৫০০ দিরহাম মোহরানা ধার্য করে এ বিবাহ দেন। আঁ-হযরত (সা.)-এর তিন পুত্র-কাসেম, তৈয়ব ও তাহের এবং চার কন্যা যয়নব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম এবং ফাতেমা- এ স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেরা অল্প বয়সেই মারা যান।

৬০৫ ১৭ ● কা'বা ঘরের সংস্কার আর কৃষ্ণপাথর (হাজরে আসওয়াদ) স্থাপনের ঘটনা। ইতোপূর্বে তিনি মক্কায় 'আল্ আমীন', 'আস্ সুদুক' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এ সময় থেকেই তিনি হেরা গুহায় গভীর ধ্যান ও আল্লাহ্‌র ইবাদতে রত থাকতেন।

৬১০ ১২ ● রমযান মাসের শেষ দশকের সোমবারে হেরা গুহায় ৪০ বছর বয়সে প্রথম ওহী লাভ করেন ।

● হযরত খাদীজার চাচাত ভাই ওরাকা বিন নাওফাল আঁ-হযরত (সা.)-কে 'বিশ্বনবী' বলে সনাক্ত করেন।

● তৌহীদের প্রচার শুরু। হযরত খাদীজা ও হযরত আলী প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে হযরত আবু বকর, হযরত বেলাল, হযরত যায়েদ বিন হারিস, হযরত উসমান, হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ, হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস, হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম ও হযরত তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ্ (রা.) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন।

৬১৫ ৭ ● রজব মাসে প্রথমে ১০টি এবং পরে ৮৩টি মুসলমান পরিবার নাজ্জাশীর রাজ্য আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এ সময়ের নাজ্জাশীর ব্যক্তিগত নাম ছিল আসহামাহ।

৬১৬ ৬ ● কুরাইশদের যুলুম-নির্যাতন চরম আকার ধারণ করে।

● হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব এবং হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ।

৬১৭ ৫ ● 'শি'বে আবু তালিব' বা আবু তালিবের উপত্যকায় হযরত রসূল করিম (সা.) সহ মুসলমানদের কুরাইশরা অবরুদ্ধ করে রাখে।

এ অবরোধকালের সময়সীমা প্রায় আড়াই থেকে তিন বছর ছিল।

৬২০ ২ ● হযরত আবু তালিব এবং হযরত খাদীজা (রা.) ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় হযরত খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল ৬৫ বছর।

● আঁ-হযরত (সা.) হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) এবং হযরত সওদা বিনতে জাম'আ (রা.) প্রত্যেককে ৪০০ দিরহাম মোহরানা দিয়ে বিয়ে করেন ।

● আঁ-হযরত (সা.) মক্কা থেকে ৭৫ মাইল দক্ষিণে তায়েফ গমন করেন। কিন্তু বহু যুলুম নির্যাতন ভোগ করে মক্কায় ফিরে আসেন। এটি নবুওয়তের দশম বছর ছিল।

৬২১ ১ ● আকাবার প্রথম বয়াত।

৬২২ **হিজরি** (১) ● পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়।

● রোম এবং পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ এবং রোমের বিজয় লাভ। আঁ-হযরত (সা.) এ প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

● আকাবার দ্বিতীয় বয়াত অনুষ্ঠিত হয়। ৭৫ জন ইয়াসরেব বা মদীনাবাসী এতে অংশগ্রহণ করেন এবং আঁ-হযরত (সা.)-কে তাদের দেশে আশ্রয় দেয়ার অঙ্গীকার করেন (যিলহজ্জ মাস)।

● আঁ-হযরত (সা.) ইয়াসরেব তথা মদীনার পথে হিজরত করেন। পথিমধ্যে তিনি (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) মক্কা থেকে ৩ মাইল দক্ষিণে সওর নামক গুহায় আশ্রয় নেন। সেখানে তিন দিন অবস্থান করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর সোমবার সেখান থেকে তিনি মদীনার পথে রওনা দেন।

● ২০ সেপ্টেম্বর আঁ-হযরত (সা.) মদীনার সন্নিকটে কুবা নামক স্থানে পৌঁছেন। পরবর্তীকালে স্মৃতিস্বরূপ সেখানে 'কুবা মসজিদ' নির্মিত হয়।

● আযান এবং জুমু'আর নামাযের বিধান জারী হয়।

● মসজিদে নববীর প্রতিষ্ঠা হয়।

৬২৩ ২ ● নামাযরত অবস্থায় যেরুযালেমের বায়তুল মাকদাস থেকে মক্কার কা'বার দিকে কিবলা পরিবর্তন। তখন শাবান মাস ছিল।

● ৪৭টি শর্ত সম্বলিত 'মদীনা সনদ' প্রণয়ন– যা পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান নামে আখ্যায়িত।

● রোযা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা এবং হজ্জ এর বিধান জারী হয়।

- মার্চ মোতাবেক রমযান মাসে মদীনার ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে 'বদর' নামক কূয়ার নিকটবর্তী প্রান্তরে মক্কার কুরাইশ এবং মুসলমানদের মাঝে 'বদরের যুদ্ধ' সংঘটিত হয়।
- শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রোখসাতনা অনুষ্ঠিত হয়।
- রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী (সূরা রূম) পুনরায় পারস্য বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে আরম্ভ করে।
- যিলহজ্জ মাসে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।
- 'জান্নাতুল বাকী' প্রতিষ্ঠা এবং এ কবরে হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.)-কে সর্বপ্রথম দাফন করা হয়।

৬২৪ ৩
- শাবান মাসে হযরত রসূল করিম (সা.) হযরত উমরের কন্যা হযরত হাফসা (রা.)-কে বিয়ে করেন।
- রমযান মাসে হযরত ইমাম হাসান (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।
- মার্চ মোতাবেক শাওয়াল মাসে মদীনার ৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ নামক উপত্যকায় মুসলমান এবং মক্কার কুরাইশদের মাঝে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- ইহুদী গোত্র বানু কায়নুআকা-কে মদীনা থেকে নির্বাসন দেয়া হয়।
- মদের নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়।

৬২৪ ৪
- সফর মাসে কাফেররা 'বির মাউনা' নামক স্থানে ধোঁকা দিয়ে ৬৯ জন 'হাফেযে কুরআন'-কে শহীদ করে দেয়।
- রবিউল আউয়াল মাসে ইহুদী গোত্র বনু নযীর-কে মদীনা থেকে নির্বাসন দেয়া হয়।
- ইসলামী উত্তরাধিকার আইন ঘোষণা করা হয়।
- আঁ-হযরত (সা.) হযরত যয়নাব বিনতে খোজায়মা (রা.)-কে বিয়ে করেন।
- শাবান মাসে হযরত ইমাম হোসেন (রা.) জন্মগ্রহণ করেন।

৬২৫ ৪
- শাওয়াল মাসে হযরত রসূল করিম (সা.) উম্মে সালমা হিন্দ বিনতে উমাইয়া (রা.)-কে বিয়ে করেন।

৬২৫ ৫
- জমাদিউস সানি মাসে চন্দ্রগ্রহণ হয় এবং হুযূর (সা.) বা-জামাত 'সালাতুল খুসুফ'-এর নামায আদায় করেন।

- মক্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয় এবং আঁ-হযরত (সা.) মক্কার গরীবদের সাহায্য প্রেরণ করেন। আবু সুফিয়ান আঁ-হযরত (সা.)-কে মক্কাবাসীদের জন্য দোয়ার অনুরোধ করেন। (বুখারী, কিতাবুল ইস্‌তিসকা)।
- শাবান মাসে আঁ-হযরত (সা.) হযরত যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী এবং তাঁর (সা.) ফুফাত বোন হযরত যয়নাব বিনতে জুহাশ (রা.)-কে ঐশী নির্দেশে বিয়ে করেন।
- পর্দার আদেশ জারী হয়।

৬২৬ ৫
- শা'বান মাসে বনু মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে হুযূর (সা.) এক অভিযান পরিচালনা করেন।
- বনু মুস্তালিকা গোত্রের সর্দার হারেস বিন আবি যারার কন্যা জুয়ায়রিয়া (রা.)-কে আঁ-হযরত (সা.) বিয়ে করেন।

৬২৭ ৫
- ৩১ মার্চ কুরাইশ, ইহুদী এবং বেদুঈনদের ১০৬০০ সৈন্যের একটি সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে আবু সুফিয়ান মদীনা আক্রমণ করে।
- আঁ-হযরত (সা.) হযরত সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শ মোতাবেক ৬ দিন যাবৎ মদীনার চারদিকে পরিখা খনন করে তিন হাজার মুসলমান সৈন্য নিয়ে সেখানে থেকেই যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধ 'জঙ্গে আহযাব' বা 'পরিখার (খন্দক) যুদ্ধ' নামে খ্যাত। শাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- বিবাহ এবং তালাকের বিধান জারী হয়।

৬২৮ ৬
- ১৯ ফেব্রুয়ারি আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ তার পুত্র সিরোস কর্তৃক নিহত হয়।
- মার্চ মাসে 'বয়াতে রিয্‌ওয়ান' এবং বিখ্যাত হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়, যাকে পবিত্র কুরআন 'ফাতহুম্ মুবীন' বা প্রকাশ্য বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছে।

৬২৮ ৭
- হুযূর আকরাম (সা.) বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ্গণের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণ করেন।
- আগস্ট (মহর্‌রম) মাসে খায়বারের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর বীরত্বের জন্য তাঁকে 'আসাদুল্লাহ্' বা আল্লাহ্‌র সিংহ উপাধি দেয়া হয়।
- হুযূর (সা.) উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)-কে বিয়ে করেন।

৬২৯ ৭
- আঁ-হযরত (সা.) ফেব্রুয়ারি মাসে ২,০০০ সাহাবী নিয়ে উমরাহ্ হজ্জ পালনের জন্যে মক্কায় গমন করেন এবং ৩ দিন অবস্থান করে চলে আসেন।
- মূ'তার যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। হযরত যায়েদ (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ (রা.) এবং হযরত জাফর (রা.) শহীদ হন। হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) 'সাইফুল্লাহ' খেতাব পান।
- আঁ-হযরত (সা.) হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-কে বিয়ে করেন। হযরত মায়মুনাহ বিনতে হারিস এবং হযরত সাফিয়া বিনতে হুয়ায়ি বিন আখতাব (রা.)-কেও তিনি এ বছর বিয়ে করেন।

৬৩০ ৮
- ৬ জানুয়ারি মোতাবেক ১০ রমযানে ১০,০০০ সাহাবী নিয়ে আঁ-হযরত (সা.) মক্কা অবরোধ করেন এবং পরিশেষে মক্কা বিজয় করেন।
- হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা.)-এর গর্ভে সাহেবযাদা ইবরাহীম জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবেই তিনি মারা যান। আঁ-হযরত (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'সে জীবিত থাকলে সত্যবাদী নবী হতো।'
- ২৭ জানুয়ারি মোতাবেক ৬ শাওয়াল মক্কার তিন মাইল দূরে হুনায়নের প্রান্তরে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
- মুসলমানগণ তায়েফ বিজয় করেন।

৬৩১ ৯
- নভেম্বর মাসে তাবুকের যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। এ যুদ্ধের আরেক নাম 'গাযওয়াতুল উসরা'– অর্থাৎ, কষ্টের যুদ্ধ।

৬৩২ ১০
- ফেব্রুয়ারি মোতাবেক যিলহজ্জ মাসে আঁ-হযরত (সা.) ১,১৪,০০০ সাহাবী এবং পবিত্র সহধর্মিণীগণসহ বিদায় হজ্জ পালন করেন ।
- আঁ-হযরত (সা.) আরাফাতের মাঠে ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ দেন ।

৬৩২ ১১
- ১লা রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার মোতাবেক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মে ৬৩ বছর বয়সে আঁ-হযরত (সা.) তাঁর প্রিয় প্রভুর কাছে গমন করেন। [ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজে'উন]। (আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিউঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)

নোট: আঁ-হযরত (সা.)–এর জন্ম ও মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) তাঁর 'সীরাতে খাতামান্নাবীঈন' পুস্তকে জন্ম তারিখ সম্বন্ধে লিখেছেন, আঁ-হযরত (সা.)-এর সঠিক জন্ম তারিখ হলো ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ। মিশরের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশা ফালাকী সাহেব বহু গবেষণা করে পুস্তক রচনা করে দেখিয়েছেন, হুযূর (সা.)-এর জন্ম ৯ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার মোতাবেক ২০ এপ্রিল ৫৭১ খ্রিস্টাব্দ। আল্লামা আকরাম খাঁ প্রমুখ পন্ডিতবর্গও এটা সমর্থন করেছেন। ঐতিহাসিক তারিখগুলো সম্বন্ধে মতভেদ থাকার কারণে কারও কাছে উপরোক্ত তারিখগুলোতে অমিল দৃষ্টিগোচর হতে পারে, তবে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য পরিবেশনের জন্যে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে।

হাদীস শরীফ

প্র. হাদীস কাকে বলে?

উ. হাদীস সেসব বাক্যবলীর নাম যা আঁ-হযরত (সা.)-এর পবিত্র কথা, কাজ এবং অনুমোদন বা সমর্থন অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে।

প্র. 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উ. 'সিহাহ্ সিত্তাহ্' অর্থ ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসের পুস্তক। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে মুহাদ্দিসগণ (হাদীস বিশারদগণ) নিম্নোক্ত ছয়টি হাদীসের পুস্তককে অধিক প্রমাণিত ও বিশ্বাসযোগ্য এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে নির্ধারিত করেছেন। মর্যাদাক্রম অনুযায়ী হাদীসের পুস্তকগুলো হলো:

১. সহীহ্ বুখারী: সংগ্রাহক: হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী (রহ.) [১৯৪-২৫৬ হিজরি]

২. সহীহ্ মুসলিম: সংগ্রাহক: হযরত ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (রহ.) [২০৯-২৬১ হিজরি]

(সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিমকে একত্রে 'সহীহায়ন' বলা হয়। এদের উভয়ের সর্বসম্মত বর্ণনাকে 'মুত্তাফাকুন আলায়হে' বলা হয়)।

৩. জামে তিরমিযী: সংগ্রাহক: হযরত ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী (রহ.) [২০৪-২৭৯ হিজরি]।

৪. সুনানে আবু দাউদ: সংগ্রাহক: হযরত ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আশআস (রহ.) [২০২-২৭৫ হিজরি]।

৫. সুনানে নিসাঈ: সংগ্রাহক: হযরত ইমাম হাফেজ আহমদ বিন শোয়াইবুন্নিসাঈ (রহ.) [২১৫-৩০৬ হিজরি]।

৬. সুনানে ইব্‌নে মাজাহ্: সংগ্রাহক: হযরত ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ ইবনে মাজাহ কাযদীনি (রহ.) [২০৯ - ২৭৫ হিজরি]।
প্র. কোন সাহাবী এবং কোন সাহাবীয়া সর্বাপেক্ষা বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন?
উ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)।
প্র. হুযূর (সা.)-এর এমন একটি হাদীস বলুন যেখানে প্রত্যেক শতাব্দীতে উম্মতে মুহাম্মদীয়ায় মোজাদ্দেদ আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে?
উ. إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَّنْ يُّجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا
(ইন্নাল্লাহা ইয়াব'আসু লিহাযিহিল উম্মাতি আ'লা রাসি কুল্লি মিআতি সানাতিন মান ইউজাদ্দিদু লাহা দিনাহা)
অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য এমন এক মহাপুরুষকে আবির্ভূত করবেন যিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে পুনর্জীবিত করবেন। (সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, কিতাবুল মালাহিম, পৃ. ২৪১)।
প্র. আঁ-হযরত (সা.) হযরত ঈসা (আ.)-এর বয়স কত বলে নিরূপণ করেছেন?
উ. ১২০ বৎসর। এ সম্বন্ধে হাদীসটি হল -

إِنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَاشَ عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ سَنَةٍ

(ইন্না ঈসাব্‌না মারয়ামা আশা ইশরীনা ওয়া মিআতা সানাতিন)
অর্থ: নিশ্চয় ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম (আ.) ১২০ বছর জীবিত ছিলেন। (কনযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬০)।
প্র. হাদীস শরীফে মূসায়ী মসীহ্ হযরত ঈসা (আ.) এবং মুহাম্মদী মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর চেহারা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা উল্লেখ করুন।
উ. মূসায়ী মসীহ্ (আ.)-এর গায়ের রং লোহিত বর্ণ, মাথার চুল কোঁকড়ানো ও প্রশস্ত বক্ষ।
মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.) সুদর্শন, তাঁর গায়ের রং গোধূম, মাথার চুল সোজা ও লম্বা। (বুখারী, ২য় খন্ড, কিতাব বাদাউল খালক,পৃ. ১৬৫ ও কুনযুল উম্মাল)।
প্র. যে হাদীসে মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) একই ব্যক্তি হবেন বলে উল্লেখ রয়েছে তা বলুন।
উ. لَا الْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ
(লাল্ মাহ্‌দীয়্যু ইল্লা ঈসাব্‌নু মারইয়াম)
অর্থ: মাহদী ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে অপর কেউ নন"– অর্থাৎ, মাহদী এবং ঈসা একই সত্তা। (সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফীতান, বাব শিদ্দাতুয্‌যামান)।
প্র. হাদীস শরীফে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কী কী কাজের উল্লেখ রয়েছে?

উ. ক্রুশ ধ্বংস করা (ইয়াক্‌সিরুস্ সলীব), শূকর বধ করা (ইয়াকতুলুল্ খিন্‌যীর), যুদ্ধ রহিত করা (ইয়াযাউল হারব), ইসলামকে পুনর্জীবিত করা এবং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার করা (লিইউযহিরাহু আ'লাদ্দীনি কুল্লিহি), ইসলামী শরীয়ত কায়েম করা, বহি ও অভ্যন্তরীণ যাবতীয় বিরোধের ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী (হাকামান আদলান) হারানো ঈমানকে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা, অধিক পরিমাণে (আধ্যাত্মিক) ধনভান্ডার বিতরণ করা।
প্র. যে হাদীসে আঁ-হযরত (সা.) ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে তাঁর সালাম পৌঁছাতে বলেছেন তা উল্লেখ করুন।
উ. اَلَا مَنْ اَدْرَكَهُ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ
(আলা মান্ আদরাকাহু ফাল্‌ইয়াকরা আলায়হিস্ সালাম)
অর্থ: স্মরণ রেখো, যে কেউ ইমাম মাহদী (আ.)-এর সাক্ষাৎ পাবে সে অবশ্যই তাকে আমার সালাম পৌঁছাবে। (তিবরানী আল্ আওসাতি ওয়াস্ সগীর)।
প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে যে হাদীসে পারস্য বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করা হয়েছে তা বলুন।
উ. যখন সূরা জুমু'আর 'ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম' আয়াত নাযিল হয়, তখন আঁ-হযরত (সা.) হযরত সালমান ফারসি (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বলেন-

لَوْ كَانَ الْإِيْمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ

(লাও কানাল্ ঈমানু ইনদাস্ সুরাইয়্যা লানা লাহু রিজালুন আও রাজুলুম্ মিন্ হা-উলায়ি)
অর্থ: ঈমান যদি সুরাইয়া নক্ষত্রে উঠে যায় তাহলে এর (পারস্য বংশের) এক বা একাধিক ব্যক্তি পুনরায় একে (ঈমান) তা থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনবেন। (বুখারী, ৩য় খন্ড, কিতাবুত তফসীর)
প্র. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) খাতামান্নাবীঈনের তাৎপর্য বর্ণনায় কী বলেছেন?
উ. قُوْلُوْا اِنَّهُ خَاتَمُ الْاَنْبِيَاءِ وَلَا تَقُوْلُوْا لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ
(কূলু ইন্নাহু খাতামুল আমবিয়ায়ি ওয়া লা তাকূলু লা নাবীয়্যা বা'দাহু)
অর্থ: "তোমরা বল, 'আঁ-হযরত (সা.) খাতামুল আম্বিয়া' কিন্তু একথা বলো না, 'তাঁর (সা.)-এর পরে কোন নবী নেই'।" (দুররে মনসুর, ৫ম খন্ড, পৃ. ২০৪ এবং তাকমেলা মাজমাউল বিহার, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৮৫)।
প্র. দু'টি হাদীস উল্লেখ করুন যাতে প্রমাণিত হয় আঁ-হযরত (সা.)-এর পর নবী আসতে পারে।
উ. ১) لَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيْقًا نَبِيًّا
(লাও আশা লাকানা সিদ্দিকান নাবিয়্যান)

অর্থ: "যদি সে [হুযূর (সা.)-এর সন্তান সাহেবযাদা ইবরাহীম] জীবিত থাকত তবে সে সত্য নবী হতো।" (সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খন্ড, কিতাবুল জানায়েয এবং তারিখ ইবনে আসাকির, ৩য় খন্ড, পৃ. ২৯৫)।

২) اَبُوْ بَكْرٍ اَفْضَلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ نَبِيٌّ

(আবু বাকরিন আফযালু হাযিহিল উম্মাতি ইল্লা আইঁয়াকুনা নাবিয়্যুন)

অর্থ: "আবু বকর এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ–যদি ভবিষ্যতে কোন নবী হন তিনি ব্যতীত।" (কুনুযুল হাকায়েক ফি হাদিসি খায়রুল খালায়িক, পৃ. ০৪ এবং জামেউস সগীর, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৭)।

প্র. সর্বপ্রাচীন হাদীস গ্রন্থের নাম কী?

উ. হযরত হাম্মাম বিন মুনাব্বাহ (রহ.) কর্তৃক সংকলিত 'সহীফা হাম্মাম বিন মুনাব্বাহ'। তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর একজন শিষ্য ছিলেন।

তথ্যসূত্র :

১) পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা পরিচিতি, বিষয়বস্তু, আয়াত, টীকা ও বিষয়সূচী দ্রষ্টব্য।
২) সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা : হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ, এম.এ (রা.)।
৩) দ্বীনি মা'লুমাত, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
৪) হাদীকাতুস সালেহীন।

খোলাফায়ে রাশেদীন

প্র. খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে কী বুঝায়? কাদেরকে খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয়?

উ. হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর তিরোধানের পর যে চারজন সাহাবী হুযূর (সা.)-এর প্রতিনিধিরূপে সমগ্র আরব রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজের সর্বাধিনায়কত্ব করে গেছেন তাঁরাই মুসলিম জাহানের ইতিহাসে 'খোলাফায়ে রাশেদীন' নামে পরিচিত। তাঁদের উপাধি ছিল আমীরুল মু'মিনীন বা মু'মিনদের নেতা। এ চারজন মহাসম্মানিত পুণ্যবান পুরুষ হলেন- ১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.), ২) হযরত উমর ফারুক (রা.), ৩) হযরত উসমান গণী (রা.), ৪) হযরত আলী মুর্তজা (রা.)।

প্র. খোলাফায়ে রাশেদীন রেজওয়ানুল্লাহি আলাইহিমগণের খিলাফতকাল উল্লেখ করুন।

উ. ১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.): ১১ হিজরি-১৩ হিজরি (৬৩২-৬৩৪ ইং)
২) হযরত উমর ফারুক (রা.): ১৩ হিজরি-২৪ হিজরি (৬৩৪-৬৪৪ ইং)
৩) হযরত উসমান গণী (রা.): ২৪ হিজরি-৩৫ হিজরি (৬৪৪-৬৫৬ ইং)
৪) হযরত আলী মুর্তজা (রা.): ৩৫ হিজরি-৪০ হিজরি (৬৫৬-৬৬১ ইং)

প্র. শায়খাইন কাদের বলা হয়? রসূল (সা.)-এর সাথে তাঁদের কী সর্ম্পক ?

উ. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং হযরত উমর ফারুক (রা.)-কে একত্রে শায়খাইন বলা হয়। তাঁরা উভয়েই রসূল (সা.)-এর শ্বশুর এবং খলীফা ছিলেন।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)

প্র. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মায়ের নাম কী?

উ. তিনি ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বনি তাইম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম উসমান (ডাক নাম কোহাফা) এবং মাতার নাম উম্মুল খায়ের সালমা।

প্র. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর আসল নাম কী?

উ. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি কোহাফা (রা.)। তাঁর আসল নাম ছিল 'আতীক'।

প্র. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর কোন কন্যাকে হুযূর (সা.)-এর সাথে বিবাহ দেন?

উ. হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)।

প্র. হযরত আবু বকর (রা.)-এর একান্ত প্রচেষ্টার ফলে মক্কার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাদের কয়েকজনের নাম বলুন।

উ. হযরত উসমান (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.), হযরত আব্দুর রহমান (রা.), হযরত সা'দ (রা.)।

প্র. হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবদ্দশায় কাকে তাঁর (সা.) পরিবর্তে ইমামতি করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন?

উ. হযরত আবু বকর (রা.)-কে।

প্র. হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফতে আসীন হয়েই সর্বপ্রথম কী কাজ করেন?

উ. হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নির্দেশিত হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-এর নেতৃত্বে ৭০০ সৈন্যের মুসলিম সেনাবাহিনী সিরিয়া অভিযানে প্রেরণ করেন।

প্র. হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতের সময় কয়েকজন ব্যক্তি মিথ্যা নবুওয়তের দাবি করেছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বলুন।

উ. বনু হানিফা গোত্রের মুসায়লামা কাযযাব, ইয়েমেনের আসাদ আনসি, বনী আসাদ গোত্রের তোলায়হা, ইয়ারবু গোত্রের সাজাহ্ নাম্নী এক খ্রিস্টান নারী।

প্র. হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর সম্মানে কী বলেছেন?

উ. "যদি আমি আমার উম্মতের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তবে তাকেই (আবু বকরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম।" (বুখারী, কিতাবুল মানাকিব)।

প্র. পবিত্র কুরআন মজীদে হযরত আবু বকর (রা.)-কে কী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে?
উ. সানিয়াসনাইনি (দু' জনের দ্বিতীয়)। সূরা তওবা : ৪০ নং আয়াত।
উ. রসূল (সা.)-এর পর কোন সাহাবী সর্বাধিক কুরআনের তত্ত্বকথা বুঝতে পারতেন?
উ. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)।
প্র. কোন সূরা অবতীর্ণ হলে কোন সাহাবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যু সন্নিকটে বুঝতে পেরে কাঁদতে শুরু করেন?
উ. সূরা আন্ নাসর অবতীর্ণ হলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)।
প্র. হযরত মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর অতুলনীয় শান ও মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করে তাঁর উদ্দেশ্যে কী বলেছেন?
উ. اَبُوْ بَكْرٍ اَفْضَلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ نَبِيٌّ

(আবু বাকরিন আফযালু হাযিহিল উম্মাতি ইল্লা আইঁয়াকুনা নাবিয়্যুন)
অর্থ: আবু বকর এ উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যদি ভবিষ্যতে কোন নবী হন তিনি ব্যতীত। (কুনযুল হাকায়েক ফি হাদিসি খায়রুল খালায়িক, পৃ. ০৪ এবং জামেউস সগীর, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৭)।
প্র. হযরত আবু বকর (রা.) কত বছর খিলাফতের গুরুদায়িত্ব পালন করেন এবং কখন মৃত্যুবরণ করেন?
উ. ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের মে মাস থেকে ৬৩৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত। তিনি ২৩ আগস্ট ৬৩৪ সন মোতাবেক ১৩ হিজরির ২২ জমাদিউস সানি মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত উমর ফারুক (রা.)

প্র. হযরত উমর ফারুক (রা.) কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? তাঁর পিতা-মাতার নাম কী?
উ. হযরত উমর ফারুক (রা.) ৫৮৩ খিস্টাব্দে বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আদিয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খাত্তাব এবং মাতার নাম খানতামাহ।
প্র. হুযূর (সা.) কোন দুই উমরের জন্য দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ! তুমি এ উভয়ের মধ্যে থেকে একজনকে ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য দান কর?"
উ. ১) উমর বিন খাত্তাব ২) উমর বিন হিশাম।
প্র. হযরত উমর (রা.) কখন ইসলাম কবুল করার সৌভাগ্য লাভ করেন? ইসলাম গ্রহণের পর হুযূর (সা.) তাঁকে কোন উপাধি প্রদান করেন?
উ. নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছরে ৩৩ বছর বয়সে তিনি ইসলাম কবুল করেন। ইসলাম গ্রহণের পর হুযূর (সা.) তাঁকে 'ফারুক'–অর্থাৎ, সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী উপাধিতে ভূষিত করেন।

প্র. হযরত উমর (রা.)-এর ডাকনাম কী ছিল?
উ. আবু হাফসা।
প্র. হযরত উমর (রা.) তাঁর কোন কন্যাকে হুযূর (সা.)-এর সাথে বিবাহ দেন?
উ. হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা)।
প্র. হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কোন সাহাবী সর্ম্পকে বলেছেন, "যদি শয়তান তাকে কোন রাস্তায় চলতে দেখে তাহলে শয়তান ভিন্ন রাস্তায় পথ চলতে শুরু করে?"
উ. হযরত উমর ফারুক (রা.)।
প্র. হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে উল্লেখযোগ্য কোন-কোন সাম্রাজ্য ও রাজ্য বিজয় হয়েছিল?
উ. পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়, রোম সাম্রাজ্য বিজয়, যেরুযালেম বিজয়, মিসর বিজয়।
প্র. মজলিসে শূরা সর্বপ্রথম কোন খলীফা প্রতিষ্ঠা করেন?
উ. হযরত উমর ফারুক (রা.)।
প্র. কোন খলীফার সময়কালে মদীনার মসজিদে নববী এবং কাবাগৃহের সংস্কার সাধন শুরু হয়?
উ. হযরত উমর ফারুক (রা.)।
প্র. হিজরি কামরি সনের প্রবর্তন কে করেন? এর মাস কয়টি ও কী কী?
উ. হযরত উমর ফারুক (রা.)। হিজরি কামরি সনের মাস হল ১২ টি। এগুলো হল- মহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানি, রজব, শাবান, রমযান, শাওয়াল, যিলকদ, যিলহজ্জ।
প্র. যেরুযালেম বিজয়ের সময় খ্রিস্টান ধর্মগুরুর নাম কী ছিল?
উ. খ্রিস্টান পাদ্রী সফ্রোনিয়াস।
প্র. হযরত উমর (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর মৃত্যুর পর খলীফা নির্বাচনের জন্য যে কমিটি গঠন করে যান তাদের সংখ্যা কয়জন ছিল এবং নাম কী কী?
উ. হযরত উমর ফারুক (রা.) তাঁর মৃত্যুর পর খলীফা নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করে যান। এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬ জন। তারা হলেন- ১) হযরত উসমান (রা.), ২) হযরত আলী (রা.), ৩) হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.), ৪) হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.), ৫) হযরত তালহা (রা.), ৬) হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.)। হযরত উমর (রা.) আরও বলেন, এ ছয়জনের মধ্যে যিনি সর্বাধিক সমর্থন লাভ করবেন, তিনিই খলীফা হিসেবে যোগ্যতম বিবেচিত হবেন।
প্র. হযরত উমর (রা.) কখন মৃতুবরণ করেন?
উ. হযরত উমর ফারুক (রা.) মদীনার মসজিদে নামাযরত অবস্থায় আবু লুলু ফিরোজ নামক পার্শি গোলাম কর্তৃক ২৬ যিলহজ্জ ২৩ হিজরি গুরুতরভাবে আহত হন এবং ১লা

মহররম ২৪ হিজরি শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত উসমান গণী (রা.)

প্র. হযরত উসমান গণী (রা.) কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর পিতা-মাতার নাম কী?
উ. হযরত উসমান গণী (রা.) মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের উমাইয়া গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হল আফফান এবং মাতার নাম আরওয়াহ।
প্র. হযরত উসমান (রা.)-এর ডাকনাম কী ছিল? তিনি আরবে কী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন?
উ. ডাক নাম ছিল আবু আমর এবং আব্দুল্লাহ্। তিনি আরবে গণী (সম্পদশালী) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।
প্র. কাকে যুন-নূরাইন (দুই নূরের অধিকারী) বলা হয় এবং কেন?
উ.হযরত উসমান গণী (রা.)-কে। কেননা তিনি হুযূর (সা.)-এর পবিত্র দুই কন্যা হযরত রুকাইয়া (রা.) এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-কে (একজনের মৃত্যুর পরে অন্যজনকে) বিবাহ করেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে এত বেশি ভালোবাসতেন যে তিনি একবার বলেছিলেন, তাঁর (সা.) যদি আরও একটি কন্যা সন্তান থাকতো, তাকেও তিনি উসমানের (রা.) সাথে বিবাহ দিতেন।
প্র. মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত উসমান (রা.) মদীনার কোন কূপ, কত হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য হিবা (দান) করে দিয়েছিলেন?
উ. মদীনার একমাত্র সুপেয় পানিয় জলের কূপ 'বিরে রূমা'। তিনি (রা.) বিশ হাজার দিরহাম দিয়ে এ কূপ ক্রয় করে মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য দান করে দিয়েছিলেন।
প্র. হযরত উসমান (রা.) কার নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কী কারণে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন?
উ. রসূল (সা.)-এর নির্দেশেই তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়া (রা.)-এর অসুস্থতার কারণে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন।
প্র. কোন খলীফার আমলে মুসলিম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ. ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান গণী (রা.)-এর খিলাফতকালে।
প্র. কোন ব্যক্তির কুচক্রান্ত ও স্বার্থপর নীতির কারণে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে অরাজকতা ও অসন্তোষের সূচনা হয়?
উ. খলীফা হযরত উসমান (রা.)-এর জামাতা ও চাচাতো ভাই 'মারওয়ান' এর।
প্র. হযরত উসমান (রা.) কখন, কীভাবে শাহাদাত বরণ করেন?
উ. দীর্ঘ ১২ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং সততার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও আব্দুল্লাহ বিন সাবার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন মোতাবেক ১৮ যিলহজ্জ ৩৫ হিজরি সনে হযরত উসমান (রা.)-এর গৃহে প্রবেশ করে

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

কুরআন পাঠরত ৮২ বছরের বৃদ্ধ খলীফার ওপর কাপুরুষোচিত হামলা করে তাঁকে শহীদ করে দেয়।
প্র. হযরত উসমান (রা.)-এর কোন স্ত্রী তাঁকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে গিয়ে হাতের অঙ্গুলি হারান?
উ. হযরত নাইলা।

হযরত আলী মুর্তজা (রা.)

প্র. হযরত আলী (রা.) কবে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর পিতা-মাতার নাম কী?
উ. হযরত আলী (রা.) ৬০০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের হাশেমী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হল হযরত আবু তালিব এবং মায়ের নাম ছিল হযরত ফাতেমা । তিনি হুযূর (সা.)-এর আপন চাচাতো ভাই ছিলেন।
প্র. হিজরতের সময় কোন সাহাবী নিজ মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে শত্রু পরিবেষ্টিত গৃহে আঁ-হযরত (সা.)-এর বিছানায় শায়িত ছিলেন?
উ. হযরত আলী মুর্তজা (রা.)।
প্র. হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কোন কন্যাকে হযরত আলী (রা.)-এর সাথে বিবাহ দেন? তাদের কয়জন সন্তান-সন্ততি ছিল?
উ. হযরত ফাতেমাতুয্ যোহরা (রা.)-কে। হযরত ফাতেমা (রা.)-এর গর্ভে হযরত হাসান (রা.), হযরত হোসেন (রা.) এবং মুহসীন নামে তিনটি ছেলে এবং যয়নব এবং উম্মে কুলসুম নামে দু'টি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। মুহসীন বাল্যকালে মারা যান। হযরত আলী (রা.) হযরত ফাতেমা (রা.)-এর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় কোন বিবাহ করেননি।
প্র. খায়বার যুদ্ধের অসামান্য বীরত্বের জন্য হুযূর (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে কী উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন?
উ. আসাদউল্লাহ্ (আল্লাহ্র সিংহ)।
প্র. হুদায়বিয়া সন্ধির লেখক কে ছিলেন ?
উ. হযরত আলী (রা.)।
প্র. কোন যুদ্ধাভিযানের সময় হুযূর (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন? তখন হুযূর (সা.) হযরত আলীকে উদ্দেশ্যে করে কী বলেছিলেন?
উ. তাবুকের যুদ্ধের সময়। হুযূর (সা.) তখন বলেছিলেন-

يَا عَلِيُّ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ كَهَارُوْنَ مِنْ مُوْسٰى غَيْرَ اَنَّكَ لَسْتَ نَبِيًّا۔

(ইয়া আলিয়্যু আমা তারযা আন তাকুনা মিন্নি কাহারূনা মিম্ মূসা গায়রা আন্নাকা লাসতা নাবিয়্যান)

অর্থঃ হে আলী! তুমি কী এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি আমার নিকট সেরূপ মর্যাদার অধিকারী যেরূপ মূসার নিকট হারুনের। তবে পার্থক্য হল, আমার পরে তুমি নবী হবে না। (তাবাকাতি কবির, ৫ম খন্ড, পৃ.১৫)।

প্র. হুযূর (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আলী (রা.) কখন, কোথায় ইসলাম প্রচারের জন্য গমন করেন?

উ. আঁ-হযরত (সা.)-এর নির্দেশে হিজরি দশম সালে ইয়েমেনে ইসলাম প্রচারের জন্য যান।

প্র. হযরত আলী (রা.)-এর অসামান্য বীরত্বের জন্য হুযূর (সা.) তাঁকে কোন তরবারী প্রদান করেছিলেন?

উ. 'জুলফিকার' নামক তরবারী।

প্র. হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে মুসলমানদের মাঝে কয়টি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ও কী কী?

উ. তিনটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এগুলো হল- ১) জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রের যুদ্ধ) ২) সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ ৩) নাহরাওয়ানের যুদ্ধ।

প্র. 'উষ্ট্রের যুদ্ধ' নাম হবার কারণ কী?

উ. এ যুদ্ধে মুসলমানদের একটি পক্ষের সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) উষ্ট্রের পিঠে অবস্থান করে দিয়েছিলেন বিধায় এ যুদ্ধ জঙ্গে জামাল বা উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে ইতিহাসে খ্যাত।

প্র. হযরত আলী (রা.) মদীনা থেকে কোথায়, কী কারণে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন?

উ. কুফায়। আর এটি করার কারণ ছিল খিলাফতের পূর্বাঞ্চলে সুশাসন এবং বিশেষ করে বেদুঈনদের পদানত করে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা।

প্র. খারিজী কারা ছিল?

উ. হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতকালে যারা দুমার সালিশে অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ ত্যাগ করেছিল, তারাই ইসলামের ইতিহাসে খারিজী নামে পরিচিত। তারা ছিল ইসলামের গোঁড়াপন্থী ও চরমপন্থী সম্প্রদায়। প্রথম দুই খলীফাকে মানলেও যেহেতু তাদের মতে শেষ দু'জন খলীফা ইসলামের শত্রুদের সাথে মীমাংসা বা আলোচনা করতে চেষ্টা করেছিলেন, সেজন্য তারা এই শেষ দু'জন খলীফার চরম বিরোধিতা করে। এদের মতে, বংশ-গোত্র নির্বিশেষে সার্বজনীনতার ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচিত হবে। কোন ব্যক্তি ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ পালনে ব্যর্থ হলে তারা তাকে কাফের হিসেবে গণ্য করে থাকে।

প্র. হযরত আলী (রা.) কবে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন?

উ. হযরত আলী (রা.) আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম খারিজীর বিষাক্ত ছুরির আঘাতে গুরুতররূপে আহত হন এবং ২১ রমযান ৪০ হিজরি মোতাবেক ৬৬১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেন।

তথ্যসূত্র :

১) সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা : হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ, এম.এ (রা.)।

২) দ্বীনি মা'লুমাত, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।

৩) ইসলামের ইতিহাস, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

৪) পকেট বুক, প্রণেতা : হযরত মাওলানা গোলাম ফরিদ খাদেম সাহেব।

আসহাবে রসূল (সা.)
[রসূল (সা.)-এর সাহাবীগণ]

প্র. মদীনার প্রথম মুসলমান কে?

উ. নাজর গোত্রের প্রধান হযরত আবু উসামা আসাদ বিন জুরাকাহ্ (রা.)।

প্র. সাহাবাদের (রা.) প্রথম 'ইজ্‌মা' (সর্ববাদীসম্মত মত) কখন ও কীভাবে সংঘটিত হয়েছিল?

উ. আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রেম ও মহব্বতে বিভোর শোকাহত সাহাবীগণ তাঁর ওফাত লাভের বিষয়টি সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। হযরত উমর (রা.) এতই শোকাভিভূত ও বেদনায় মুহ্যমান ছিলেন যে, মসজিদে নববীতে কোষমুক্ত তরবারী উত্তোলন করে তিনি ঘোষণা করলেন, যে কেউ বলবে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন, তার শিরোশ্ছেদ করা হবে। মসজিদে উপস্থিত অবশিষ্ট সাহাবীগণ নীরব হয়ে থাকলেন। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) মসজিদে প্রবেশ করে মিম্বরে দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত করলেন-

وَمَامُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

(ওয়ামা মুহাম্মাদুন্ ইল্লা রাসূলুন, ক্বাদ্ খালাত্ মিন্ ক্বাবলিহির রুসূল)

অর্থ: এবং মুহাম্মদ (সা.) কেবল একজন রসূল। তাঁর পূর্বেকার সব রসূল অবশ্যই গত হয়েছেন। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৫)।

এ আয়াত তেলওয়াত করার পর সকল সাহাবা বিনা ব্যতিক্রমে মেনে নিয়েছিলেন, আঁ-হযরত (সা.) তাঁর পূর্ববর্তী সকল রসূলের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর পূর্ববর্তী সব রসূলও তাঁর ন্যায় গত হয়েছেন বা ওফাত লাভ করেছেন।

প্র. আশারাহ্ মুবাশ্বারাহ্ (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জন) কারা ছিলেন?

উ. আঁ-হযরত (সা.) তাঁর দশজন প্রিয় সাহাবীকে তাঁদের জীবদ্দশায়ই বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন। তাঁরা হলেন-

(১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)
(২) হযরত উমর বিন আল্ খাত্তাব (রা.)
(৩) হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)
(৪) হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.)
(৫) হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.)
(৬) হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.)
(৭) হযরত সাঈদ বিন যায়িদ (রা.)
(৮) হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.)

(৯) হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)
(১০) হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.)

প্র. কোন এক মুক্ত ক্রীতদাসের নাম বলুন যাকে হুযূর (সা.) সেনাবাহিনীর উচ্চ পদে নিযুক্ত করেছিলেন?

উ. মূ'তা-এর যুদ্ধে হযরত যায়েদ বিন হারিস (রা.)-কে। এ যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

প্র. হযরত রসূল করিম (সা.)-এর দরবারের বিখ্যাত কবির নাম লিখুন এবং তাঁর একটি পংক্তি লিখুন।

উ. হযরত হাসান বিন সাবেত (রা.)। তাঁর ভালোবাসাপূর্ণ একটি পংক্তি হল–

فَاِنَّ اَبِىْ وَ وَالِدَهٗ وَعِرْضِىْ   لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءٌ

(ফাইন্না আবি ওয়া ওয়ালিদাহু ওয়া ই'রযি   লিয়িরযি মুহাম্মাদিন মিনকুম বিকায়ু)

অর্থ: হে রসূল (সা.)-এর শত্রুগণ! নিশ্চয় আমার বাবা ও তাঁর বাবা আর আমার সমস্ত মান-সম্মান হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্মান-মর্যাদার খাতিরে তোমাদের সম্মুখে ঢালস্বরূপ।

প্র. একজন বিখ্যাত মুসলমান মহিলা সাহাবী কবির নাম বলুন।

উ. হযরত খানসা রাযিআল্লাহু আনহা।

প্র. ইসলামের প্রথম মুয়ায্যিন কে?

উ. হযরত বেলাল (রা.)

প্র. মক্কার বাইরে প্রথম মোবাল্লেগ কে?

উ. হযরত মুসায়েব বিন উমায়ের (রা.)

প্র. সেসব বিশিষ্ট সাহাবীদের নাম লিখুন যাঁরা কাতেবে ওহী বা ওহী-ইলহাম লেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন?

উ. হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.), হযরত খালীফ বিন সাঈদ বিন আল্ আস (রা.), হযরত হানযালা বিন আর রবী আল আসদী (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), হযরত আব্বাস বিন সাঈদ আল্ আস (রা.), হযরত মুআইকীব বিন আবী ফাতিমা (রা.), হযরত সারজিল বিন হাসনাহ (রা.) (এরূপ প্রায় ৪০ জন ওহী লেখক ছিলেন)।

[ফতহুল বারী, ৯ম খন্ড, পৃ. ১৯, অধ্যায়: রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওহী বিষয়]।

প্র. একজন কাতেবে ওহী (ওহী লিখক) মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন, তার নাম কী?

উ. আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ আবি সারাহ্।

প্র. হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "তোমরা চার ব্যক্তির নিকট কুরআন শিখ"–সে

চারজন ব্যক্তির নাম লিখুন।
উ. ১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), ২) হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস হযরত সালেম (রা.), ৩) হযরত উবাই বিন কাব (রা.), ৪) হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.)।
প্র. 'সাইফুল্লাহ্' (আল্লাহ্র তরবারী) কে?
উ. আঁ-হযরত (সা.) বীর মুসলিম সেনানী হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে 'সাইফুল্লাহ্' উপাধি দিয়েছিলেন।
প্র. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর আসল নাম কী? তাঁকে আবু হুরায়রা বলা হয় কেন?
উ. হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর আসল নাম উযায়ের। তিনি একটি বিড়াল পুষতেন এবং বিড়ালটিকে খুব ভালোবাসতেন। এজন্য নবী করিম (সা.) তাঁকে আদর করে আবু হুরায়রা (বিড়ালের পিতা) বলে ডাকতেন।
প্র. এমন এক মুক্ত ক্রীতদাসের নাম বলুন যিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ কুরাইশদের কাছে ছেড়ে দিয়ে হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন? তখন হুযূর (সা.) তাঁকে কী বলেছিলেন?
উ. হযরত সোহায়েব রুমী (রা.)। হুযূর (সা.) তাঁকে বলেন, "সোহায়েব তোমার এই বর্তমান সওদা তোমার পূর্বেকার সমস্ত সওদার চাইতে বেশি লাভজনক।"
প্র. হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দুই চাচা তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন যাদেরকে হুযূর (সা.) খুবই ভালবাসতেন। তাদের নাম লিখুন?
উ. ১) হযরত হামযা বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) ২) হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)।
প্র. আস্হাবে সুফ্ফা কারা?
উ. আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রতি গভীর অনুরাগ ও ভালোবাসার কারণে যারা বেশিরভাগ সময়ই মসজিদে পড়ে থাকতেন যাতে তারা হুযূর (সা.)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত কোন কথা শোনা থেকে বঞ্চিত না হন, তাঁদেরকেই আস্হাবে সুফ্ফা বলে। 'সুফ্ফা' মসজিদে নব্বীর অংশ-বিশেষ। উপরোক্ত সাহাবাগণ সুফফায় বসবাস করতেন বিধায় তাঁদেরকে 'আস্হাবে সুফ্ফা' বলা হত।
প্র. এমন একজন মহিলা সাহাবীয়ার নাম বলুন যিনি হুযূর (সা.)-এর সাথে বহু যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন?
উ. হযরত উম্মে আম্মারা (রা.)।
প্র. এমন একজন সাহাবীর নাম বলুন যিনি বালক বয়স থেকে হুযূর (সা.)-এর মৃত্যু অবধি তাঁর খেদমতে উৎসর্গীকৃত ছিলেন?
উ. হযরত আনাস বিন মালেক (রা.)।
প্র. কোন সাহাবীকে হত্যা করার সময় তিনি জল্লাদের সম্মুখে মাথা পেতে দিয়ে এ পংক্তি বলেছিলেন, "আমি যখন মুসলমান থাকা অবস্থায় নিহত হতে যাচ্ছি তখন আমার কোন

ভ্রুক্ষেপ নেই যে, আমার ধড় কোন দিকে পড়বে, এ সমস্ত কিছু খোদার জন্য। আমার খোদা চাইলে আমার দেহের খন্ড-বিখন্ড করা টুকরোগুলোর উপর অশেষ কল্যাণ ও আশিষ বর্ষিত হতে থাকবে।"
উ. হযরত খোবায়েব (রা.)।
প্র. যখন বিরে মাউনা নামক স্থানে সত্তর জন হাফেযে কুরআনকে শহীদ করা হচ্ছিল তখন তাদের অনেকে মুখ থেকে কী শব্দ-উচ্চারণ করেছিলেন?
উ. اَللّٰهُ اَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
(আল্লাহু আকবর, ফিযতু ওয়া রাব্বিল কা'বাতি)
অর্থ: আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, কা'বার মালিকের কসম! আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি।
প্র. কোন সাহাবীর উপাধি 'যুল জানাহাইন' (দুই ডানাধারী) ছিল?
উ. হযরত জাফর বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.)। (বুখারী)।
প্র. কোন সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে হুযূর (সা.) বলেছিলেন, "প্রত্যেক নবীর হাওয়ারী থাকে। নিশ্চয় আমার হাওয়ারী হল–"?
উ. হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)। (বুখারী)।
প্র. কোন সাহাবীকে উদ্দেশ্য করে হুযূর (সা.) এ দোয়া করেছিলেন, "আল্লাহুম্মা আল্লিমহুল হিকমাতা", "হে আল্লাহ! তাকে তুমি অশেষ প্রজ্ঞা শিক্ষা দাও?" (বুখারী)।
উ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)।
প্র. রসূল (সা.) কোন দুইজন সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "এরা দু'জন জান্নাতের যুবকদের সর্দার এবং এ পৃথিবীতে আমার দু'টি সুগন্ধিযুক্ত ফুল"? (বুখারী)।
উ. আঁ-হযরত (সা.)-এর প্রিয় দুই দৌহিত্র হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) ও হযরত হোসেন ইবনে আলী (রা.)।
প্র. হুযূর (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-এর সম্মানে কী বলেছেন?
উ. মরিয়ম ছিলেন (তৎকালীন দুনিয়ার) সকল নারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর খাদীজা হলো সমগ্র নারী জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (বুখারী)।
প্র. রসূল (সা.) কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "প্রত্যেক উম্মতের একজন বিশ্বস্ত লোক থাকে, আমার উম্মতের বিশ্বস্ত লোকটি হল–"?
উ. হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.)। (বুখারী)।
প্র. এমন একজন চরম বিরুদ্ধবাদীর নাম বলুন যাকে হুযূর (সা.) তার কৃতকর্মের জন্য হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছিলেন?
উ. হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহ্ল (রা.)
প্র. মসজিদে নববীর যে জায়গা রসূল (সা.) দু'জন এতীম বালকের কাছ থেকে ক্রয় করে

নিয়েছিলেন তাদের নাম কী?
উ. হযরত সাহল (রা.) ও হযরত সোহায়েল (রা.)।
প্র. মসজিদে নববী নির্মাণের সময় সাহাবারা ইট, মাটি উঠানোর সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর যে সমস্ত পংক্তি আবৃত্তি করতেন তার একটি বলুন?
উ. هٰذَا الْحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ   هٰذَا اَبَرُّ رَبَّنَا وَاَطْهَرْ
(হাযাল হিমালু লা হিমালা খায়বারা হাযা আবাররু রাব্বানা ওয়া আতহারু)
অর্থ: এ বোঝা খায়বারের ব্যবসায়িক দ্রব্যাদী নয় যা গাধার উপর চড়ানো হয়ে থাকে বরং হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এই বোঝা তাকওয়া ও পবিত্রতার বোঝা যা আমরা তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য উত্তোলন করছি।
প্র. ঐতিহাসিক বিখ্যাত আরবী পংক্তিমাল্য 'সাব'-আ মুআ'ল্লাকাত (সাতটি ঝুলন্ত কবিতা)'-এর একজন কবি হুযূর (সা.)-এর পবিত্র সাহাবী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁর নাম কী?
উ. হযরত লবীদ বিন রাবি'আ (রা.)।
প্র. ইহুদীদের মাঝে সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে হুযূর (সা.)-এর সাহাবী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন?
উ. হযরত হুসাইন বিন সালাম (রা.)।
প্র. মদীনায় হিজরতের পরে মুহাজিরদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন শিশু জন্মগ্রহণ করেন?
উ. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)। পিতা: হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) যিনি হুযূর (সা.)-র ফুফাতো ভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহর মায়ের নাম ছিল হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)। যিনি হযরত আয়েশা (রা.)-র বড় বোন ছিলেন।
প্র. কোন সাহাবী হুযূর (সা.)-এর বিশেষ লেখকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর (সা.) নির্দেশে হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন?
উ. হুযূর (সা.)-এর চিঠিপত্র প্রেরণ, গ্রহণ ও যোগাযোগের পরিধি বৃদ্ধি পাবার কারণে হুযূর (সা.) হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-কে তাঁর বিশেষ লেখক বা প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। হুযূর (সা.)-এর নির্দেশে তিনি মাত্র ১৫ দিনে হিব্রু ভাষার উপর বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন।
প্র. কোন সাহাবীর ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা আবাসা অবতীর্ণ হয়?
উ. অন্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)।
প্র. পবিত্র কুরআনে কোন তিনজন সাহাবীর তওবা কবুল হয়েছে মর্মে ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল এবং এর উল্লেখ কোথায় আছে?
উ. সেই তিনজন সাহাবী হলেন– (১) হযরত কাব বিন মালেক (রা.), (২) হযরত হিলাল বিন উমাইয়া (রা.), (৩) হযরত মুরারাহ বিন রাবি (রা.)। তাবুক যুদ্ধে অলসতা করে না

যাওয়ার কারণে হুযূর (সা.)-এর নির্দেশে মুসলমানরা তাদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখেন এবং তারা সমাজচ্যুত অবস্থায় ৫০ দিন অতিবাহিত করেন। এ সময় তারা খোদার দরবারে সকাতরে অনুতপ্ত হয়ে দোয়া ও কান্নাকাটি করতে থাকেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'লা সূরা তওবার ১১৮ নং আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের তওবা কবুল হয়েছে মর্মে ঘোষণা করেন।
প্র. কোন সাহাবীয়াকে 'যাতুন নিতাকায়ন' (দুই বন্ধনীর অধিকারী) নামে ডাকা হয় এবং কেন?
উ. হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)-কে। কেননা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে খাবার ও পানীয় যে দু'টি পাত্রে ভর্তি করা হয়েছিল, তা বাঁধার জন্য কোন কিছু না পাওয়ার কারণে তিনি তাঁর কোমরবন্ধনীর কাপড় লম্বালম্বি দু'ভাগ করে পাত্র দু'টির মুখ বেঁধে দিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁর নাম 'যাতুন নিতাকায়ন' হয়ে গিয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

১) সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল মানাকেব।
২) দ্বীনি মা'লুমাত, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
৩) সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, হযরত মির্যা বশির আহমদ, এম.এ. (রা.)।
৪) হাদীকাতুস সালেহীন।

বুযুর্গানে ইসলাম
(ইসলামের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ)

প্র. ফিকাহ্ শাস্ত্রের উৎস কয়টি ও কী কী?
উ. ফিকাহ শাস্ত্রের উৎস চারটি। এগুলো হল- ১) কুরআন, ২) সুন্নত ও হাদীস, ৩) ইজমা, ৪) কিয়াস।
প্র. সুন্নত কাকে বলে?
উ. হুযূর আকরাম (সা.)-এর কাজ এবং তাঁর কার্য-পদ্ধতিকেই সুন্নত বলা হয়।
প্র. ফিকাহ্ শাস্ত্রের চারজন ইমামের নাম লিখুন।
উ. (১) হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.) [৮০হিজরি-১৫০ হিজরি]।
(২) হযরত ইমাম শাফী (রহ) [১০৫ হিজরি-২০৪ হিজরি]।
(৩) হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রহ.) [৯৫ হিজরি-১৭৯ হিজরি]।
(৪) হযরত ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল (রহ.) [১৬৪ হিজরি-২৪১ হিজরি]।
প্র. 'তাবেঈন' কাদের বলা হয়? দু'জন বিখ্যাত তাবেঈনের নাম লিখুন।
উ. 'তাবেঈন' তাদেরই বলা হয় যারা সাহাবীদের সংস্পর্শে এসে ফয়েয (আধ্যাত্মিক

কল্যাণ) লাভ করেছিলেন। হযরত হাসান বসরী (রহ.) এবং হযরত ওয়ায়েস কারনী (রহ.) ছিলেন দু'জন বিখ্যাত তাবেঈন।

প্র. পর্যায়ক্রমে উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে আবির্ভূত প্রত্যেক শতাব্দীর মুজাদ্দিদগণের নাম লিখুন।

উ. প্রথম শতাব্দী : হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয (রহ.)
দ্বিতীয় শতাব্দী : হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এবং
হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)
তৃতীয় শতাব্দী : হযরত ইমাম আবু শারাহ (রহ.) এবং
হযরত ইমাম আবুল হাসান আশআরী (রহ.)
চতুর্থ শতাব্দী : হযরত ইমাম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (রহ.) এবং
হযরত কাজী আবু বকর বাকলানী (রহ.)
পঞ্চম শতাব্দী : হযরত ইমাম গায্‌যালী (রহ.)
ষষ্ঠ শতাব্দী : হযরত সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)
সপ্তম শতাব্দী : হযরত ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এবং
হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী (রহ.)
অষ্টম শতাব্দী : হযরত ইমাম হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.) এবং
হযরত সালেহ বিন ওমর (রহ.)
নবম শতাব্দী : হযরত আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি (রহ.)
দশম শতাব্দী : হযরত ইমাম মোহাম্মদ তাহের গুজরাটি (রহ.)
একাদশ শতাব্দী : হযরত মোজাদ্দেদ আলফে সানী আহমদ সারহিন্দী (রহ.)
দ্বাদশ শতাব্দী : হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলভী (রহ.)
ত্রয়োদশ শতাব্দী : হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভী (রহ.)

(নবাব সিদ্দিক হাসান খান ভূপালী প্রণীত : " হুজাজুল কিরামা ফি আসারিল কাদিমাহ", পৃ. ১২৭-১২৯)।

**চতুর্দশ শতাব্দী : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)।**

প্র. কোন একজন মুসলমান সুফি মহিলার নাম বলুন।

উ. হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)।

প্র. হযরত নেয়ামত উল্লাহ ওলী সম্পর্কে কিছু বলুন।

উ. হযরত নেয়ামত উল্লাহ (রহ.) দিল্লীর একজন পরম আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের অধিকারী, দিব্যদর্শন লাভকারী এবং অলৌকিক মোজেযা প্রদর্শনকারী দরবেশ ছিলেন। তাঁর আধ্যাত্মিক পরম উৎকর্ষতার সাক্ষ্য পাওয়া যায় হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) সম্পর্কে তাঁর

একটি ফারসি কবিতা থেকে–যা শতাব্দীর পর শতাব্দী লোকমুখে প্রচলিত আছে।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর কোন পুস্তকে হযরত শাহ্ নেয়ামত উল্লাহ্ (রহ.) ও তাঁর কাসীদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন?

উ. নিশানে আসমানী।

প্র. হযরত নেয়ামত উল্লাহ (রহ.)-এর দু'টি পংক্তি লিখুন–যা থেকে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

উ. বাংলা অনুবাদ :

১) যখন বসন্তবিহীন শীতকাল– অর্থাৎ, ত্রয়োদশ শতাব্দীর হেমন্তকাল অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন চতুর্দশ শতাব্দীর বসন্তের সূর্য উদয় হবে–যুগের মুজাদ্দিদ আগমন করবে।

২) যখন তাঁর যুগ অতি সফলতার সাথে অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন তাঁর আদর্শ ও মর্যাদাবিশিষ্ট পুত্র তাঁর স্মৃতিস্বরূপ থাকবে। (নিশানে আসমানী, বাংলা অনুবাদ, পৃ. ২৬)।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন মাসলা-মাসায়েলের সমাধানের জন্য কুরআন, সুন্নত ও হাদীসের পর কোন ইমামের মতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করতে বলেছেন?

উ. হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-র।

প্র. কাকে দ্বিতীয় উমর বলা হয়?

উ. উমাইয়া খলীফা হযরত উমর বিন আব্দুল আযিয (রহ.)-কে।

প্র. হযরত ইমাম গায্‌যালী (রহ.) কী পুস্তক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন?

উ. ইমাম গায্‌যালী দর্শন শাস্ত্রের উপর 'কিমিয়ায়ে সা'দাত' নামক পুস্তক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

প্র. মুসলিম বিশ্বের সুফিকূল শিরোমণি কে ? তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কী?

উ. হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.)। গ্রন্থের নাম হল "ফুতুহাতে মক্কীয়া"।

তথ্যসূত্র:

১) দ্বীনি মা'লুমাত, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
২) ফিকাহ আহমদীয়া।

ইসলামের ইতিহাস

প্র. কত খ্রিস্টাব্দে ইসলামের প্রকাশ হয়?

উ. ৬১০ খ্রিস্টাব্দে।

প্র. ওরাকা বিন নাওফাল কে?

উ. তিনি ছিলেন হযরত খাদীজা (রা.)-এর চাচাতো ভাই এবং খ্রিস্টান পন্ডিত। যখন আঁ-হযরত (সা.) নিজের প্রথম ওহী লাভের অভিজ্ঞতা ওরাকা বিন নাওফালের কাছে বর্ণনা করেন তখন তিনি বলেছিলেন, 'আমি নিশ্চিত, আপনার ওপর সেই ফিরিশ্‌তাই নাযিল হয়েছে, যে ফিরিশ্‌তা মূসা (আ.)-এর ওপর নাযিল হয়েছিল। আমি যদি সেদিন জীবিত থেকে আপনাকে সাহায্য করতে পারতাম–যেদিন আপনার জাতি আপনাকে বিতাড়িত করবে।'

প্র. হাবশায় হিজরত করা সম্পর্কে কী জানেন?

উ. যখন মক্কার কুরাইশদের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করল তখন রসূল (সা.)-এর নির্দেশে নবুওয়তের পঞ্চম বছরে কিছু সংখ্যক মুসলমান পুরুষ, নারী ও শিশু হাবশায় (আবিসিনিয়ায়) হিজরত করেন। মক্কাবাসীরা হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীকে অনেকবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। বরং বাদশাহ্ মুসলমানদের সাথে ন্যায়পরাণয়তার সাথে আচরণ করতে থাকেন। হাবশার বাদশাহ্ পরবর্তীতে নিজেও ঈমান আনয়ন করেন। তিনি সর্বপ্রথম মুসলমান বাদশাহ্ ছিলেন।

প্র. চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার মোজেযা কী ছিল?

উ. মক্কার কিছু কাফের হুযূর (সা.)-কে বারবার মোজেযা (আলৌকিক ঘটনা) প্রদর্শন করতে বলে। হুযূর (সা.) তাদের উপর্যুপোরি কথার প্রেক্ষিতে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করার মোজেযা প্রদর্শন করে দেখান। এ ঘটনার বিবরণ কুরআন মজীদের সূরা কমরের ০২ নং আয়াত থেকে ০৭ নং আয়াত পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

প্র. আ'মুল হাযন (দুঃখের বছর) বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

উ. শি'বে আবু তালিব বা আবু তালিবের উপত্যকায় অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার কিছুদিন পরই রসূল আকরাম (সা.) পালাক্রমে দু'টি দুঃখজনক ঘটনার সম্মুখীন হন। অর্থাৎ, হযরত খাদীজা (রা.) এবং হযরত আবু তালিব উভয়ই একজনের পর অন্যজন ইন্তেকাল করেন। তাদের উভয়ের মৃত্যুতে হুযূর (সা.) বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। এ কারণে নবুওয়তের দশম বছরকে 'আ'মুল হাযন' বা দুঃখের বছর বলা হয়।

প্র. মিরাজ ও ইসরার মাঝে পার্থক্য কী?

উ. 'মিরাজ' হুযূর (সা.)-এর সেই আধ্যাত্মিক সফরকে বলা হয় যার মাধ্যমে তাঁকে মক্কা থেকে আল্লাহ্‌র দরবার পর্যন্ত নেয়া হয়েছিল। মিরাজ সফরে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে আকাশের স্তরগুলো সফর করেছিলেন। সূরা নজমে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। 'ইসরা' অপর একটি আধ্যাত্মিক সফর যা হুযূর (সা.)-কে মক্কা থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত করানো হয়েছিল। সূরা বনী ইসরাঈলে এ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

প্র. আকাবার প্রথম বয়াত কী?

উ. নবুওয়তের দ্বাদশতম বছরে মদীনার ১২ সদস্যর একটি দল হজ্জ করার জন্য মক্কায় আগমন করে। এদের মধ্যে পাঁচজন পূর্বের বছর মুসলমান হয়েছিলেন। হুযূর (সা.)

তাদের সাথে আকাবা (প্রশস্ত পাহাড়ী রাস্তা) নামক স্থানে সাক্ষাৎ করে ইসলামের দাওয়াত দিলে অবশিষ্ট সাতজনও ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তখন হুযূর (সা.) তাদের নিম্নে বর্ণিত শর্তের ওপর আমল করার অঙ্গীকার নিয়ে বয়াত গ্রহণ করেন। শর্তগুলো হল -

১) আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদে সর্বদা বিশ্বাস রাখবে, ২) কখনো শিরক করবে না, ৩) চুরি করবে না, ৪) ব্যভিচার করবে না, ৫) কাউকে হত্যা করবে না, ৬) কারো ওপর অপবাদ আরোপ করবে না, ৭) প্রত্যেক পুণ্যকাজে সর্বান্তকরণে হুযূর (সা.)-এর একনিষ্ঠ আনুগত্য করবে। ইসলামের ইতিহাসে এ বয়াতই 'আকাবার প্রথম বয়াত' নামে প্রসিদ্ধ।

প্র. আকাবার দ্বিতীয় বয়াত কী?

উ. আঁ-হযরত (সা.) মক্কায় থাকাকালে মদীনা হতে নও-মুসলিমদের একটি দল ৬২২ খ্রিস্টাব্দে হজ্জের সময়ে আকাবার উপত্যকায় আঁ-হযরত (সা.)-এর সাথে সাক্ষাত করে। এ সাক্ষাতে তাঁরা শপথ করেন, আঁ-হযরত (সা.) মদীনায় গেলে তারা তাঁর (সা.)-এর নিরাপত্তার জিম্মাদারী থাকবেন। এ বয়াতে ৭০ জন পুণ্যাত্মা অংশ নেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই 'আকাবার দ্বিতীয় বয়াত' নামে পরিচিত। বয়াতের পর হুযূর (সা.) হযরত মূসা (আ.)-এর ন্যায় তাদের মধ্যে থেকে ১২ জন 'নকীব' (নেতা) নিযুক্ত করেন– যারা হুযূর (সা.)-এর পক্ষ থেকে নিজ-নিজ গোত্রের তত্ত্বাবধান করবে এবং তাদের প্রত্যেকেই নিজ গোত্রের জন্য তাঁর (সা.) কাছে জবাবদিহি করবে।

প্র. মদীনায় হিজরত করা সর্ম্পকে কী জানেন?

উ. হুযূর (সা.) আল্লাহ্ তা'লার আদেশে ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদীনার দিকে হিজরত করেন। হিজরত করার সময় হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সাথী ছিলেন। পথিমধ্যে তারা মক্কা থেকে তিন মাইল দক্ষিণে অনুর্বর, শুষ্ক, তৃণলতাহীন পাহাড়ের 'সওর' নামক গুহায় আশ্রয় নেন। মক্কার কাফেররা পদচিহ্ন অনুসন্ধান করতে-করতে গুহার মুখে এসে উপস্থিত হয়। এমনকি শত্রুদের পা গুহার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার আশ্চর্য পরিকল্পনার ফলে তারা গুহায় প্রবেশ না করে ফিরে যায়। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) যখন হুযূর (সা.)-এর ধরা পড়ার আশংকায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন তখন তিনি (সা.) তাঁকে আশ্বস্ত করে বলেন, **"লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মা'-আনা"**– অর্থাৎ, ভয় করো না, নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। ৬২২ খিস্টাব্দের ১২ সেপ্টেম্বর সোমবার তারা উভয়ে সওর গুহা থেকে বের হয়ে মদীনা অভিমুখে রওনা দেন।

(সীরাতে খাতামান্নাবিঈন, পৃ.২৩৯ ও দ্বীনি মা'লুমাত, ম.খো.আ.পাকিস্তান, পৃ. ২৭)

প্র. মদীনায় হিজরত করার সময় কোন ব্যক্তি হুযূর (সা.)-এর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল ? তাঁর সম্বন্ধে কী ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল? তা কবে পূর্ণ হয়েছিল?

উ. সওর গুহা হতে বের হয়ে হুযূর (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) যখন মদীনার পথে রওয়ানা হলেন তখন যথেষ্ট পুরস্কারের লোভে সুরাকা বিন মালিক তাঁদের

পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদের নিকটবর্তী হলে হুযূর (সা.) তাকে দেখে বললেন: "সুরাকা সেই সময় তোমার কী অবস্থা হবে যখন তোমার হাতে কিসরার (পারস্যের সম্রাটের) কংকন থাকবে?" এ ভবিষ্যদ্বাণী হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতের সময় পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। পুরুষের স্বর্ণ ব্যবহার যদিও নিষিদ্ধ তবুও এ মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সত্যতা ও ইসলামের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়, এর পূরণার্থে হযরত উমর (রা.) সুরাকাকে পারস্য সম্রাটের স্বর্ণের কংকন পরিধান করান।

প্র. হিজরতের পর আঁ-হযরত (সা.) সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন?

উ. মসজিদে কুবা। এটি মদীনা হতে দুই বা আড়াই মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত। আনসারদের গোত্রগুলোর মধ্য থেকে বেশ কয়েকটি পরিবার এখানে বসবাস করত। আঁ-হযরত (সা.) মক্কা হতে হিজরতের পর এ স্থানে ১০/১২ দিন অবস্থান করে পরে মদীনায় যান।

প্র. মদীনায় আঁ-হযরত (সা.)-এর আগমনের সময় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে মদীনার আনসার মহিলা ও শিশুরা যে পংক্তি আবৃত্তি করছিল তা বলুন ?

উ.

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاع
وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلّٰهِ دَاع

(তালা'-আল বাদরু আ'লায়না মিন সানিয়্যাতিল বাদায়ি
ওয়াজাবাশ্ শুকরু আ'লায়না মা দা'-আ লিল্লাহি দা'ঈ)

অর্থ: আজ আমাদের ওপর বিদা পাহাড়ের উপত্যকা থেকে পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হয়েছে। এজন্য এখন আমাদের ওপর সর্বদা খোদার কৃতজ্ঞতা আদায় আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্র. মদীনার পূর্ব নাম কী ছিল?

উ. মদীনার পূর্ব নাম ছিল ইয়াসরেব (রোগের শহর)। যখন হুযূর (সা.) এ স্থানে আগমন করলেন তখন থেকে এ শহরের নাম হল 'মদীনাতুর রসূল' (রসূলের শহর)। (সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, পৃ. ২৬১)।

প্র. হিজরতের প্রাথমিক দিনগুলোতে হুযূর (সা.) কুবায় এবং মদীনায় কোন-কোন সাহাবীর বাড়িতে অবস্থান করেন?

উ. কুবাতে হযরত কুলসুম বিন হিদাম (রা.) এবং মদীনায় হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর বাড়িতে।

প্র. মদীনায় কোন-কোন গোত্রের বসতি ছিল?

উ. আনসারদের দু'টি গোত্র আওস এবং খাযরাজ। আর ইহুদীদের তিনটি গোত্র বনু কায়নুআকা, বনু নযীর এবং বনী কুরায়যা।

প্র. ইসলামী পরিভাষায় 'গাযওয়া' এবং 'সারিয়া'-এর মাঝে পার্থক্য কী?

উ.'গাযওয়া' হলো সে যুদ্ধ যেখানে হুযূর (সা.) স্বয়ং উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন আর 'সারিয়া' হলো যে যুদ্ধে রসূল (সা.) কোন কারণে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

প্র. 'মুয়াখাত' (ভ্রাতৃত্ব বন্ধন) কী?

উ. মক্কা হতে হিজরতকারীদের (মুহাজিরদের) জন্য আঁ-হযরত (সা.) নির্দেশ দেন যেন মদীনার প্রতিটি মুসলিম একজন মুহাজিরকে নিজের ভাই হিসেবে বরণ করে নেয়। একেই ইসলামের ইতিহাসে 'মুয়াখাত' বলা হয়।

প্র. বদরের যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে সাহাবীদের আত্মবিলীনতার একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন।

উ. বদরের যুদ্ধের পূর্বে আঁ-হযরত (সা.) সাহাবাদের কাছে পরামর্শ চাচ্ছিলেন। এমন সময়ে আনসারদের সর্দার হযরত মেকদার বিন আমর (রা.) দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, "হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা মূসা (আ.)-এর সঙ্গীদের ন্যায় আপনাকে কখনও বলব না, তুমি আর তোমার প্রভু যাও এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো, আমরা এখানেই বসে থাকলাম বরং আমরা আপনার ডানে লড়বো, আপনার বামে লড়বো, আপনার সামনে লড়বো, আপনার পিছনে লড়বো। হে আল্লাহ্‌র রসূল! যে সকল দুশমন আপনার ক্ষতি সাধন করতে এসেছে তারা আপনাকে কখনও স্পর্শ করতে পারবে না যতক্ষণ তারা আমাদের লাশের ওপর দিয়ে যায়।"

প্র. বদরের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল এবং কতজন অংশগ্রহণ করেছিলেন?

উ. হিজরতের দ্বিতীয় সনে ১৭ রমযান শুক্রবার মোতাবেক ১৪ মার্চ ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে কাফির এবং মুসলমানদের মাঝে বদরের প্রান্তরে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধকে 'ইয়াও-মুল ফুরকান'– অর্থাৎ, সত্য-মিথ্যার পার্থক্যের দিনও বলা হয়ে থাকে। এতে ৩১৩ জন মুসলিম সৈন্য এবং কাফিরদের ১০০০ সৈন্য যোগদান করে। এতদসত্ত্বেও লাঞ্ছনার সাথে কাফিরদের পরাজয় বরণ করতে হয়। (সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, পৃ.৩৫৭)

প্র. উহুদ যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছে?

উ. উহুদের যুদ্ধ হিজরতের তৃতীয় বছরের শাওয়াল মাস মোতাবেক মার্চ ৬২৪ সালে মদীনার ০৫ মাইল পশ্চিমে উহুদ নামক উপত্যকায় অনুষ্ঠিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানগণ প্রথমে বিজয় লাভ করে কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাবির (রা.)-এর নেতৃত্বে এক দল তীরন্দাজ বাহিনীকে আঁ-হযরত (সা.) একটি গিরিখাদের উপর পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন। বিজয় দেখে সেনাপতির হুকুম অমান্য করে আনন্দের অতিশয্যে গিরিখাদে নিযুক্ত হওয়া সৈন্যরা যুদ্ধ ময়দানে উপস্থিত অন্যান্য মুসলিম সৈন্যদের সাথে বিজয়ানন্দে অংশগ্রহণ করতে এলে মুসলমানদের বিজয় অনিশ্চিত হয় এবং হযরত হামযা (রা.)-সহ ৭০ জন সাহাবা শহীদ হন। এদের মধ্যে ৬ জন ছিলেন মুহাজির আর অন্যান্য সকল শহীদ ছিলেন আনসার। এ যুদ্ধে রসূল (সা.)-এর দাঁত মোবারক শহীদ হয় এবং তিনিসহ ১২ জন সাহাবা গুরুতর আহত হন।

(সীরাতে খাতামান্নাবীঈন,পৃ. ৫০০ এবং দ্বীনি মা'লুমাত, ম.খো.আ.পাকিস্তান, পৃ. ২৯)

প্র. কীভাবে তালহা (রা.)-এর হাত উহুদের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হয়?

উ. উহুদের যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন হযরত তালহা (রা.) লক্ষ্য করলেন, শত্রুপক্ষ আঁ-হযরত (সা.)-কে লক্ষ্য করে অজস্র তীর নিক্ষেপ করছে, তখন তিনি তাঁর হাত রসূল (সা.)-এর মুখের সামনে তুলে ধরে আড়াল দিলেন। তীরের পর তীর তাঁর হাতে এসে পড়ছিল। আর সেই মহান অনুগত সাহাবী (রা.) হাত একটুও সরাচ্ছিলেন না এই ভেবে যে, তীর আঁ-হযরত (সা.)-এর পবিত্র মুখমন্ডলে না আবার আঘাত করে। এভাবে তীরের আঘাতে-আঘাতে হযরত তালহা (রা.)-এর হাত ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়।

প্র. আহযাবের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? একে খন্দকের যুদ্ধ বলা হয় কেন?

উ. পঞ্চম হিজরি সনের শাওয়াল মাস মোতাবেক ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে এ যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে আঁ-হযরত (সা.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শক্রমে মদীনার চতুর্দিকে পরিখা খনন করা হয়, তাই এ যুদ্ধ পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ নামেও খ্যাত।

প্র. 'বয়াতে রিযওয়ান' কী? কুরআন করীমের কোন সূরায় এর উল্লেখ করা হয়েছে?

উ. হুদায়বিয়ার সন্ধির খুব সংকটাপন্ন অবস্থায় প্রায় ১৫০০ জন সাহাবী সকল প্রকারের কুরবানী করার জন্য আঁ-হযরত (সা.)-এর হাতে যে বয়াত করেন, তা-ই 'বয়াতে রিযওয়ান' নামে পরিচিত। এটা সেই বয়াত যার মাধ্যমে মুসলমানরা খোদা তা'লার পরম সন্তুষ্টি লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। সূরা ফাতাহ্‌র **১১-১৯** নং আয়াতে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্র. হুদায়বিয়ার সন্ধি বলতে কী বুঝেন?

উ. ষষ্ঠ হিজরির যিলকদ মাস মোতাবেক ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মুসলমান এবং কাফিরদের মাঝে একটি সন্ধি হয়। এটাই হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত।

প্র. হাবশায় হিজরতকারীগণ কোন বিজয় লাভের পর হাবশা থেকে ফিরে আসেন?

উ. খায়বার যুদ্ধে বিজয় লাভের পর। আঁ-হযরত (সা.) তাদের ফিরে আসাতে এত বেশি আনন্দিত হয়েছিলেন যে, তিনি বলেছিলেন, ''জানি না আমি কিসে বেশি আনন্দিত- খায়বার বিজয়ের জন্য নাকি জাফরের আগমনের জন্য।"

প্র. গাযওয়া 'যাতুর রিকা' (পট্টি দেওয়া যুদ্ধ) কখন সংঘটিত হয় আর এ যুদ্ধের এরকম নামকরণ হওয়ার কারণ কী?

উ. এ গাযওয়া সপ্তম হিজরির জমাদিউস সানি মাসে 'নজদ' এলাকার দিকে সংঘটিত হয়। সফরের কাঠিন্য আর বাহন সল্পতার কারণে সাহাবীদের পায়ের চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। অনেকের পায়ের নখ ফেটে রক্ত বের হচ্ছিল। তখন সাহাবীরা নিজেদের কাপড় ছিড়ে পায়ের মধ্যে পট্টি দিতে থাকে। যখন সে কাপড় রক্তে ভিজে যাচ্ছিল তখন পুনরায় সাহাবারা বার বার নতুন করে পট্টি দিতে থাকে। আর এভাবে তারা সমস্ত রাস্তা

অতিক্রম করে। এ কারণে এ যুদ্ধের নাম 'যাতুর রিকা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

প্র. মক্কা বিজয় সর্ম্পকে আলোকপাত করুন।

উ. অষ্টম হিজরির রমযান মাস মোতাবেক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে নবী আকরাম (সা.) দশ হাজার পবিত্রাত্মা সাহাবীদের নিয়ে মক্কা বিজয় করেন। মক্কাবাসীর সীমাহীন অত্যাচার, নিপীড়ন এবং মাত্রাতিরিক্ত দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও হুযূর (সা.) ক্ষমা, অনুকম্পার এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন এই বলে– لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ اِذْهَبُوْا فَاَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ

(লা তাসরিবা আলায়কুমুল ইয়াওমা ইযহাবু ফাআনতুমুত তুলাকায়ু)

অর্থাৎ, আজকের দিনে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। যাও, তোমরা সবাই স্বাধীন।

প্র. মক্কা বিজয়ের পর যখন আঁ-হযরত (সা.) পবিত্র কা'বা গৃহে সংরক্ষিত মূর্তিগুলো ভাঙছিলেন তখন তিনি কুরআনের কোন আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন?

جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ۝

(জাআল হাক্কু ওয়া যাহাক্বাল বাতিলু ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা)

অর্থঃ সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮২)।

প্র. তাবুকের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়? এ যুদ্ধের অপর নাম কী?

উ. এ যুদ্ধ নবম হিজরি মোতাবেক ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়। একে গাযওয়া-এ-উসরা (কষ্টের যুদ্ধ) নামেও ডাকা হয়। কেননা এ যুদ্ধে মুসলমানদেরকে অনেক দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সফর করতে হয় এবং অত্যন্ত কষ্টকর সফর অসম ধৈর্যের সাথে সম্পন্ন করতে হয়।

প্র. বিদায় হজ্জ বলতে কী বুঝেন?

উ. দশম হিজরি মোতাবেক ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আঁ-হযরত (সা.)-এর ওপর হজ্জের সময় এ আয়াত অবতীর্ণ হয় "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়েদাঃ ০৪)। এরপর তিনি (সা.) এ আয়াত মুজদালেফার ময়দানে হজ্জের উদ্দেশ্যে সমবেত মানুষের সামনে উচ্চস্বরে পাঠ করে শুনান। তারপর হুযূর (সা.) আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে করে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন– যা পরবর্তীতে 'বিদায় হজ্জের ভাষণ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ ভাষণে তিনি উম্মতকে 'আল বিদা' বলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক রীতিনীতির মূল বিষয়াবলী অত্যন্ত সুন্দর-সাবলীলভাবে উপস্থাপন করে গিয়েছেন। হুযূর আকরাম (সা.)-এর জীবনের এটিই ছিল সর্বশেষ হজ্জ।

প্র. ১) হিলফুল ফুযূল, ২) দারুন নদওয়া, ৩) শি'বে আবু তালিব, ৪) হাজরে আসওয়াদ, ৫) আরাফাত, ৬) দারে আরকাম বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

উ. **(১) হিলফুল ফুযূল (শান্তিসংঘ):** প্রাচীন আরবের কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মনে করল আমরা সম্মিলিতভাবে এই অঙ্গীকার করি যে, সর্বদা নিপীড়িত মানুষকে সাহায্য করব, অন্যায়ের প্রতিবাদ করব, অধিকার বঞ্চিতদের তাদের অধিকার আদায় করে দিতে সার্বিক সহযোগিতা করব। 'ফুযূল' শব্দটি আরবি 'ফযল' শব্দের বহুবচন। এই অঙ্গীকারকারী ব্যক্তিদের মধ্যে তিন ব্যক্তির নাম 'ফযল' ছিল। এ কারণে পরবর্তীতে এই অঙ্গীকার 'হিলফুল ফুযূল' নামে সুখ্যাতি লাভ করে।

(২) দারুন নদওয়া (পরামর্শ গৃহ): কুসাই বিন কিলাব কাবা শরীফের নিকটে একটি গৃহ তৈরী করেছিলেন। কুরাইশরা এ গৃহে একত্রিত হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলী আলোচনা করতেন। এ গৃহকেই 'দারুন নদওয়া' বলা হয়।

(৩) শি'বে আবু তালিব (আবু তালিবের উপত্যকা): এটি মক্কার একটি পাহাড়ী উপত্যকার নাম। যার মালিক ছিলেন হুযূর (সা.)-এর আপন চাচা হযরত আবু তালিব। এ উপত্যকাতেই বনু হাশিম, বনু আব্দুল মুত্তালিব গোত্র হুযূর (সা.)-এর সাথে তিন বছর পর্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল।

(৪) হাজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর) : কাবা শরীফের এক পার্শ্বে অবস্থিত একটি বিশেষ কালো পাথর যাকে হজ্জের সময় তাওয়াফকালে চুম্বন করতে হয় বা চুম্বন করতে না পারলে হাত দিয়ে ইশারা করতে হয়। এ প্রান্ত থেকেই তাওয়াফ শুরু করতে হয় এবং প্রতি চক্কর শেষে একে চুম্বন করতে হয়।

(৫) আরাফাত: এটি সে ময়দান যেখানে ৯ যিলহজ্জ তারিখে হাজীরা একত্রিত হয়ে থাকে। যোহর ও আসর নামায জমা করে পড়ে এবং ইমাম সাহেবের খুতবা শুনে। কিয়ামে আরাফাত বা আরাফাতে অবস্থান হজ্জের অন্যতম একটি প্রধান ফরয।

(৬) দারে আরকাম (আরকামের গৃহ): এটি হল হযরত আরকাম বিন আরকাম (রা.)-এর সেই গৃহ যেটিকে হুযূর (সা.) নবুওয়তের ৪র্থ বছর থেকে শুরু করে নবুওয়তের ৬ষ্ঠ বছর পর্যন্ত ইসলাম প্রচার এবং তালীম-তরবিয়তের কেন্দ্র বানিয়েছিলেন। এ জন্য ইতিহাসে এই গৃহ 'দারুল ইসলাম' (ইসলামের গৃহ) নামে বিশেষভাবে পরিচিত।

প্র. হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং হযরত ইমাম হোসেন (রা.) কবে জন্মগ্রহণ করেন?

উ. হযরত ইমাম হাসান (রা.) তৃতীয় হিজরির রমযান মাসে– অর্থাৎ,, রোখসাতানার প্রায় দশ মাস পর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর চেহারা, আকার-আকৃতি ও প্রকৃতির সাথে হুযূর (সা.)-এর অনেক বেশি সাদৃশ্য ছিল। তাঁকে ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে বিষপ্রয়োগে শহীদ করা হয়। হযরত ইমাম হোসেন (রা.) ৪র্থ হিজরির শাবান মাসে জন্মগ্রহণ করেন।

তথ্যসূত্র:

১) দ্বীনি মা'লুমাত, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।

২) সীরাতে খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা : হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ, এম.এ. (রা.) ।

বিবিধ (১)

প্র. কার শাসনামলে পবিত্র কুরআনের মধ্যে হরকত (যবর, যের, পেশ, সাকিন ইত্যাদি) সন্নিবেশিত করা হয়?

উ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ -এর।

প্র. বিখ্যাত মুসলমান চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকের নাম লিখুন।

উ. বু আলী সিনা (চিকিৎসক), জাবির ইবনে হাইয়ান (বৈজ্ঞানিক) এবং ইবনে রুশ্‌দ (দার্শনিক)।

প্র. 'জান্নাতুল বাকী' কী ?

উ. মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্থান যেখানে আঁ-হযরত (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ, সাহাবা (রিজওয়ানুল্লাহি আলায়হিম) এবং রসূল করিম (সা.)-এর আহলে বায়েত (বংশধর) সমাহিত আছেন।

প্র. উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ বংশের রাজত্বকাল কত বছর ছিল?

উ. হযরত আমীর মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রা.) কর্তৃক হিজরি ৪১ সন মোতাবেক ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে বনী উমাইয়াদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিজরি ১৩২ মোতাবেক ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মারওয়ানের সময় এদের পতন হয়।

প্র. আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ বংশের রাজত্বকাল কত বছর ছিল?

উ. আবু আব্বাস আব্দুল্লাহ্ বিন সাফ্‌ফাহ্ কর্তৃক হিজরি ১৩২ সন মোতাবেক ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিজরি ৬৫৬ মোতাবেক ১২৫০ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খান কর্তৃক শেষ বাদশাহ্ মু'তাসিম বিল্লাহ্ নিহত হলে এ বংশের রাজত্বের পতন ঘটে।

প্র. মিশর, পারস্য, স্পেন ও সিন্ধু বিজেতাগণের নাম লিখুন।

উ. মিশর : হযরত আমর ইবনুল আস (রা.), পারস্য : হযরত সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.), স্পেন : তারিক বিন যিয়াদ এবং সিন্ধু : মুহাম্মদ বিন কাসিম।

প্র. গায়েবানা জানাযার নামায কখন থেকে শুরু হয়?

উ. আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ আসহামাহ নাজ্জাশীর মৃত্যুর পর নবী করিম (সা.) তার মরদেহের অনুপস্থিতিতে জানাযার নামায আদায় করেন। তখন থেকেই গায়েবানা জানাযার নামাযের সূচনা ঘটে।

প্র. কারবালায় হযরত ইমাম হোসেন (রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের ঘটনা কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়?

উ. ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়ার শাসনামলের ১০ মহররম ৬১ হিজরি মোতাবেক ১০ অক্টোবর ৬৮০ খিস্টাব্দে।

প্র. সর্বপ্রথম আরবি অভিধান ও আরবি ব্যাকরণ কে প্রণয়ন করেন? এগুলোর নাম কী?

উ. প্রথম আরবি অভিধান প্রণয়ন করেন হযরত খালিদ বিন আহমদ। এই অভিধান 'কিতাবুল আইন' নামে পরিচিত। তার পারস্যবাসী শিষ্য সিবাওয়াহ প্রথম আরবি ব্যাকরণ পুস্তক রচনা করেন। এ পুস্তক 'আল কিতাব' নামে পরিচিত।

প্র. বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

উ. আব্বাসীয় খলীফা আবু জাফর আল মনসুর (৭৬২-৭৬৬ খ্রি.)।

প্র. ঐতিহাসিক ক্রুসেডের সময় কোন মুসলিম সেনানায়কের রণকৌশল ও দক্ষতার বলে মুসলমানরা পবিত্র নগরী যেরুযালেম নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিল?

উ. হযরত গাজী সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহ.)-এর।

প্র. বিশ্বের ইতিহাসের সর্বপ্রথম সংবিধানের নাম কী ? এ সনদ কয়টি শর্ত সম্বলিত ছিল?

উ. মদীনা সনদ। এটি ৪৭টি শর্ত সম্বলিত ছিল।

প্র. স্পেনে মুসলমানরা কত বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল?

উ. প্রায় ৭০০ বছর পর্যন্ত।

প্র. স্পেনের রাজপ্রাসাদ 'আল হামরা'-য় আরবি লিপিতে কী লিখিত রয়েছে?

উ. اَلْعِزَّةُ لِلّٰهِ، اَلْقُدْرَةُ لِلّٰهِ، اَلْحُكْمُ لِلّٰهِ، لَاغَالِبَ اِلَّا اللّٰهُ۔

(আল ইয্যাতু লিল্লাহি, আল কুদরাতু লিল্লাহি, আল হুকমু লিল্লাহি, লা গালিবা ইল্লা আল্লাহ্)

অর্থ: মহা সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ্র জন্য, মহা প্রতাপ ও শক্তি আল্লাহ্র জন্য, শাসন ক্ষমতাও আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহই একমাত্র বিজয়ী।

তথ্যসূত্র:

১) দ্বীনি মালুমাত, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।

২) ইসলামের ইতিহাস, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

ইসলামের পুনর্জাগরণ

(আখারিন যুগ)

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)

প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী

প্র. আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী কে? তিনি কবে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন?

উ. হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি ১২৫০ হিজরির ১৪ শাওয়াল মোতাবেক ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ভারতের বাটালা পরগণার গুরুদাসপুর জেলার 'কাদিয়ান' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র. তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা এবং শ্রদ্ধেয় মাতার নাম কী?

উ. পিতার নাম: হযরত মির্যা গোলাম মর্তুজা সাহেব (তিনি কাদিয়ানের সর্দার ছিলেন); মাতার নাম: হযরত চেরাগ বিবি সাহেবা।

প্র. বাল্যকালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন?

উ. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সর্বপ্রথম মুন্সী ফযল ইলাহী সাহেবের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীতে মৌলভী ফযল আহমদ সাহেবের কাছে কিছু আরবি ব্যাকরণ এবং মৌলভী গুল আলী শাহ সাহেবের কাছে আরবি ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। এছাড়া পিতার কাছে তিনি হেকিমী শাস্ত্রের উপর কিছু বই নিয়েও পড়াশুনা করেন। তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেননি।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যৌবনে কোথায় চাকুরী করেছিলেন?

উ. ১৮৬৪ সালে সিয়ালকোটে শেরেস্তাদের চাকুরী করেছিলেন যেমন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-এর অধীনে ব্যবসায় করেছিলেন।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম কখন মামলা দায়ের করা হয় এবং কে করেছিল?

উ. ১৮৭৭ সনে রালইয়ারাম নামক এক খ্রিস্টান ব্যক্তি। এই মামলা 'ডাকঘর মামলা' নামে খ্যাত।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দ্বিতীয় বিবাহ কোন বংশে এবং কার সাথে সম্পন্ন হয়?

উ. ১৮৮৪ সালের ১৭ নভেম্বর দিল্লীর বিখ্যাত সুফি হযরত খাজা মীর দর্দ (রহ.)-র বংশে উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাইয়েদা নুসরত জাহাঁ বেগম সাহেবা (রা.)-এর সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

প্র. হযরত মসীহ্ নাসেরী (আ.) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর 'ইরহাস' কে ছিলেন? ('ইরহাস' অর্থ সেই ব্যক্তি যে তার পরবর্তীতে আগমনকারী ব্যক্তির জন্য নিদর্শন

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)
জন্ম: ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫, মৃত্যু: ২৬ মে ১৯০৮

ও স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ হয়ে থাকেন)

উ. হযরত মসীহ্ নাসেরী (আ.)-এর ইরহাস হযরত ইয়াহিয়া (আ.) ছিলেন। ইঞ্জিলে যাকে 'যোহন' নামে সম্বোধন করা হয়েছে। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইরহাস হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী (রহ.) ছিলেন।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর হুশিয়ারপুর সফর আহমদীয়াতের ইতিহাসে কেন বিখ্যাত?

উ. তিনি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হুশিয়ারপুরে সফর করেন। তিনি সেখানে চল্লিশ দিন পর্যন্ত একান্তে চিল্লাকাশি করেন– অর্থাৎ, পৃথক হয়ে ইবাদতে মগ্ন থাকেন। এ সময়ে তিনি 'মুসলেহ মাওউদ' সংক্রান্ত মহা সুসংবাদ প্রাপ্ত হন।

প্র. বয়াতের দশটি শর্তের ঘোষণা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কখন করেছিলেন?

উ. ১৮৮৯ সনের ১২ জানুয়ারি 'তাকমীলে তবলীগ' নামক বিজ্ঞাপন প্রকাশের মাধ্যমে।

প্র. তিনি কখন এবং কোথায় প্রথম বয়াত নেয়া শুরু করেন? কারা সেদিন বয়াত করেছেন?

উ. তিনি ২০ রজব, ১৩১০ হিজরি মোতাবেক ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে লুধিয়ানা নিবাসী হযরত সূফী আহমদ জান সাহেবের মহল্লা জাদীদস্থ গৃহে প্রথম বয়াত নেয়া শুরু করেন। সেদিন ৪০ জন হুযূর (আ.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। তাঁদের মাঝে সর্বপ্রথম বয়াত করেন হযরত হেকিম মাওলানা নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)। এছাড়া উল্লেখযোগ্য আরও যারা বয়াত করেছেন তারা হলেন, হযরত হাফেয হামিদ আলী সাহেব (রা.), হযরত মুন্সি আব্দুল্লাহ্ সানৌরি সাহেব (রা.), হযরত মুন্সি আড়োড়া খান সাহেব (রা.), হযরত মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব (রা.), হযরত পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব (রা.) ও হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.)।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কতগুলো পুস্তক প্রণয়ন করেছেন? সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ রচিত পুস্তকের নাম কী?

উ. সর্বমোট ৮৫টি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। প্রথম ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে 'বারাহীনে আহমদীয়া' (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড) এবং সর্বশেষ 'পয়গামে সুলহ্' ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। (দ্বীনি মালুমাত, ম. ওখা.আ. পাকিস্তান, পৃ. ৩৭)।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সুসংবাদপ্রাপ্ত সন্তানদের নাম ও জন্ম-মৃত্যু তারিখ বলুন।

উ. ১) সাহেবযাদী ইসমত সাহেবা [জন্ম: মে ১৮৮৬-মৃত্যু: জুলাই ১৮৯১]
২) সাহেবযাদা বশির আউয়াল [জন্ম: ৭ আগস্ট ১৮৮৭-মৃত্যু: ৪ নভেম্বর ১৮৮৮]
৩) হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) [জন্ম: ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯, মৃত্যু: ৮ নভেম্বর ১৯৬৫]
৪) সাহেবযাদী শওকত সাহেবা [জন্ম: ১৮৯১-মৃত্যু: ১৮৯২]

৫) হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ সাহেব এম.এ. (রা.) [জন্ম: ২০ এপ্রিল ১৮৯৩-মৃত্যু: ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৩]

৬) হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরিফ আহমদ সাহেব (রা.) [জন্ম: ২৪ মে ১৮৯৫-মৃত্যু: ২৬ ডিসেম্বর ১৯৬১]

৭) হযরত সাহেবযাদী নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা (রা.) [জন্ম: ২রা মার্চ ১৮৯৭-মৃত্যু: ২৩ মে ১৯৭৭]

৮) হযরত সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব [জন্ম: ১৪ জুন ১৮৯৯-মৃত্যু ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৭]

৯) সাহেবযাদী আমাতুন নাসির সাহেবা [জন্ম: ২৮ জানুয়ারি ১৯০৩-মৃত্যু: ৩রা ডিসেম্বর ১৯০৩]

১০) হযরত সাহেবযাদী আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবা (রা.) [জন্ম: ২৫ জুন ১৯০৪-মৃত্যু: ৬ মে ১৯৮৭]

এর মধ্যে ৩, ৫, ৬, ৭, ও ১০ নং ক্রমিকের সদস্যগণ দীর্ঘ জীবন লাভ করেছেন, বাকিরা শৈশবেই মারা গিয়েছেন।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন স্থানকে নিজের দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে বর্ণনা করেছেন?

উ. সিয়ালকোটকে।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কপুরথলা এবং কপুরথলা জামা'ত সম্বন্ধে কী বলেছেন।

উ. তিনি কপুরথলাবাসীদেরকে লিখেছেন- "আমি আশা করছি কিয়ামতের দিনও আপন-ারা আমার সাথে থাকবেন, কেননা দুনিয়াতেও আপনারা আমার সাথী হয়েছেন।"

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পাঁচজন সাহাবীর নাম লিখুন।

উ. ১) হযরত ড. মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)

২) হযরত মাওলানা শের আলী সাহেব (রা.)

৩) হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.)

৪) হযরত মাওলানা সারওয়ার শাহ্ সাহেব (রা.)

৫) হযরত হাফেয রৌশন আলী সাহেব (রা.)

প্র. হুযূর আকদাস (আ.) কখন মসীহ্ মাওউদ হবার দাবি করেছিলেন?

উ. ১৮৯০ সনে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁকে ইলহাম করে বলা হয়েছে:-

مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اسکے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے وکان وعداللہ مفعولا۔

(মসীহ ইবনে মারিয়াম রাসূলুল্লাহ ফওত হো চুকা হ্যা অওর উসকে রাঙ্গ মে হো কার ওয়াদা কে মাওয়াফেক তু আয়া হ্যায়। ওয়া কানা ওয়াদাল্লাহি মাফ'য়ুলান)

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

অর্থ: আল্লাহ্‌র রসূল মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাঁর রঙে রঙ্গীন হয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তুমি আগমন করেছ। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

নোটঃ তিনি (আ.) মামুর (প্রত্যাদিষ্ট) হওয়ার ইলহামের ওপর ভিত্তি করেই আল্লাহ্ তা'লার অনুমতিক্রমে বয়াতের কার্যক্রম শুরু করেছিলেন।

প্র. জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম সালানা জলসা কবে অনুষ্ঠিত হয় এবং এতে কত লোক অংশগ্রহণ করেন?

উ. ১৮৯১ সনের ২৭ ডিসেম্বর, মসজিদে আকসা, কাদিয়ানে এবং ৭৫ জন আহমদী এ জলসায় অংশগ্রহণ করেন।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সাধারণভাবে মুসলিম উলামাদের প্রতি প্রথম কবে মোবাহালার চ্যালেঞ্জ দেন?

উ. ১৮৯২ সনের ১০ ডিসেম্বর তারিখে।

প্রঃ.'জঙ্গে মুকাদ্দাস' কী?

উ. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯৩ সনে পাদ্রী ডিপুটি আব্দুল্লাহ্ আথমের সাথে যে লিখিত এবং মৌখিক বাহাস (বিতর্ক) করেন এটাই 'জঙ্গে মুকাদ্দাস' (পবিত্র যুদ্ধ) নামে খ্যাত।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'বারাকাতুদ্ দোয়া' পুস্তকটি কখন, কী উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন?

উ. দোয়া সম্পর্কে স্যার সৈয়দ আহমদ খানের দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধনের জন্য ১৮৯৩ সনের এপ্রিল মাসে হুযূর (আ.) এ পুস্তক রচনা করেন।

প্র. চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ-এর নিদর্শন কখন প্রকাশিত হয়েছিল?

উ. আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক হিন্দুস্তানে–অর্থাৎ, পূর্ব গোলার্ধে ১৩ রমযান ১৩১১ হিজরি (২১ মার্চ ১৮৯৪ ইং) সনে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৮ রমযান ১৩১১ হিজরি (৬ এপ্রিল ১৮৯৪ ইং) সনে সূর্যগ্রহণ এর নিদর্শন প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে পশ্চিম গোলার্ধে ১১ মার্চ ১৮৮৫ তারিখে চন্দ্রগ্রহণ এবং ২৬ মার্চ ১৮৯৫ তারিখে সূর্যগ্রহণ হয়।

প্র. কাদিয়ানে সর্বপ্রথম কবে প্রেস স্থাপিত হয়?

উ. ১৮৯৫ সনে 'যিয়াউল ইসলাম প্রিন্টিং প্রেস এবং লাইব্রেরি' । এ প্রেস হতেই সর্বপ্রথম "যিয়াউল হক" পুস্তক প্রকাশিত হয়।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর 'ইশকে রসূল (সা.)' [রসূলপ্রেম] সম্বন্ধে রচিত আরবি, ফার্সি এবং উর্দূ কবিতা থেকে একটি করে পংক্তি বলুন?

উ. **আরবিঃ** جِسْمِیْ یَطِیْرُ اِلَیْکَ مِنْ شَوْقٍ عَلَا   یَالَیْتَ کَانَتْ قُــــــوَّةُ الطَّیَرَانِ

(জিসমি ইয়াতিরু ইলায়কা মিন শাওকিন আ'লা
ইয়া লায়তা কানাত কুওয়াতুত্ তায়রানি)

অর্থ: হে মুহাম্মদ (সা.)! তোমার প্রেম ও ভালবাসার টানে আমার দেহ তোমার দিকে উড়ে যেতে চায়। হায়! আমার যদি উড়ার শক্তি থাকতো।

ফার্সি:

بعد از خدا بعشق محمدؐ مخمرم
گر کفر ایں بود بخدا سخت کافرم

(বা'দ আয খোদা বা-ইশ্‌কে মুহাম্মদ মুখাম্মরম
গার কুফরঙ্গঁ বাওয়াদ বা-খোদা সাখ্‌ত্ কাফিরাম)

অর্থ: খোদার পরে মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমে আমি বিভোর। যদি এটি কুফরী হয়, তাহলে খোদার কসম আমি পাক্কা কাফির।

উর্দূ:

ربط ہے جان محمدؐ سے مری جاں کو مدام
دل کو وہ جام لبالب ہے پلایا ہم نے

(রাব্‌ত হ্যা জা-নে মুহাম্মদ (সা.) সে মেরী জাঁ কো মুদাম
দিল কো ওহ্ জামে লাবালাব্ হ্যায় পিলায়া হামনে)

অর্থ: মুহাম্মদ (সা.)-এর হৃদয়ের সাথে মোর হৃদয়ের সম্পর্ক চিরন্তন, আমি কাণায়-কাণায় প্রেম সুরায় ভরা পেয়ালা পান করেছি।

প্র. বিশ্বধর্ম সম্মেলন কখন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ২৬-২৯ ডিসেম্বর ১৮৯৬ সনে লাহোরের টাউন হলে।

প্র. বিশ্বধর্ম সম্মেলন উপলক্ষ্যে কী নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল?

উ. এ সম্মেলনের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি প্রবন্ধ লিখেন এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বে এই ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন, আমার এ প্রবন্ধ সকল প্রবন্ধের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে, বাস্তবিক এরূপই হয়েছিল। যখন হযরত আব্দুল করিম সিয়ালকোটি (রা.) তাঁর (আ.) রচিত প্রবন্ধ পাঠ করলেন তখন সকলে একবাক্যে এই সম্মতি জ্ঞাপন করল, মির্যা সাহেবের প্রবন্ধ সকল প্রবন্ধের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। পরবর্তীতে এই প্রবন্ধ "ইসলামী নীতিদর্শন" নামে প্রকাশিত হয়।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ওপর কী কারণে 'ইন্নি উহাফিযু কুল্লা মান ফিদদ্বার (তোমার গৃহের চর্তুসীমার লোকদের আমি সুরক্ষা করবো) ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছিল?

উ. হুযূর (আ.)-এর বাড়ি 'দারুল মসীহ'-তে অবস্থানকারী সদস্য-সদস্যা এবং নিষ্ঠাবান আহমদী ব্যক্তিবর্গ প্লেগ থেকে সুরক্ষিত থাকবে এ সম্পর্কে হুযূর আকদাস (আ.)-কে আশ্বস্ত করে উক্ত ইলহাম অবতীর্ণ হয়।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যাদের মৃত্যু হয়েছে এমন পাঁচজন বিরুদ্ধবাদীর নাম বলুন।

উ. (১) পাদ্রী আব্দুল্লাহ্ আথম : ১৮৯৬ ইং
(২) পন্ডিত লেখরাম পেশওয়ারী : ১৮৯৭ ইং
(৩) মুন্সি ইলাহি বখ্‌শ, একাউন্ট্যান্ট, লাহোর : ১৯০৭ ইং,
(৪) সা'দ উল্লাহ্ লুধিয়ানভী : ১৯০৭ইং
(৫) আমেরিকা নিবাসী ড. আলেকজান্ডার ডুই : ১৯০৭ ইং

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর কোন গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন, আরবি সব ভাষার জননী?

উ. 'মিনানুর রহমান' গ্রন্থে।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-র 'ইশ্‌কে কুরআন' (কুরআন প্রেম) সম্পর্কে রচিত যে কোন একটি পংক্তি বলুন।

উ.

دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں
قرآں کے گرد گھوموں کعبہ مرا یہی ہے

(দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্‌দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা)

অর্থ: আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত গ্রন্থগুলোর নাম লিখুন।

উ. বারাহীনে আহমদীয়া (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ও ৫ম খন্ড), পুরানী তাহরীরেঁ, এক ঈসায়ী কে চার সাওয়ালোঁ কা জওয়াব, সুরমা চশমায়ে আরিয়া, শাহানায়ে হক্ব, সাবয্ ইশতেহার, ফতেহ্ ইসলাম, তৌযিহে মারাম, ইযালায়ে আওহাম (১ম ও ২য় খন্ড), আলহক্ মোবাহাসা লুধিয়ানা, আলহক্ মোবাহাসা দিল্লী, আসমানী ফয়সালা, নিশানে আসমানী, আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, বারাকাতুদ্দোয়া, হুজ্জাতুল ইসলাম, সাচ্চায়ী কা ইযহার, জঙ্গে মুকাদ্দাস, শাহাদাতুল কুরআন, তোহফায়ে বাগদাদ, কিরামাতুস সাদেকীন, হামামাতুল বুশরা, নূরুল হক (১ম ও ২য় খন্ড), ইতমামুল হুজ্জা, সিররুল খিলাফা, আনোয়ারুল ইসলাম, মিনানুর রহমান, যিয়াউল হক, নূরুল কুরআন (১ম ও ২য় খন্ড), মে'য়ারুল মাযহাব, আরিয়া ধরম, সৎ বচন, ইসলামী উসূল কী ফিলাসফী, আঞ্জামে আথম, সিরাজ-ই-মুনীর, ইস্‌তিফ্‌তা, হুজ্জাতুল্লাহ্, তোহ্‌ফায়ে কায়সারীয়া, জালসায়ে আহবাব, মাহমুদ কী আমীন, কিতাবুল বারীয়া, আল্ বালাগ, জরুরতুল ইমাম, নাজমুল হুদা, রাযে হাকীকত, কাশফুল গিতা, আইয়্যামুস সুলাহ্, হাকীকাতুল মাহদী, মসীহ্ হিন্দুস্থান মেঁ, সিতারায়ে কায়সারীয়া, তিরিয়াকুল কুলুব, তোহফায়ে গজনভীয়া, রোয়েদাদ জলসা দোয়া, খুতবায়ে ইলহামীয়া, লুজ্জাতুন্ নূর, গভর্নমেন্ট আংরেজী অওর জিহাদ,

তোহফায়ে গোলড়ভীয়া, আরবাঈন (১, ২, ৩, ৪), ইজাযুল মসীহ্, এক গলতি কা ইযালা, দাফেউল বালা, আল্ হুদা, নুযূলুল মসীহ্, কিশ্তিয়ে নূহ, তোহফাতুন্ নদওয়া, ই'জাযে আহমদী, রিভিউ বার মোবাহাসা বাটালভী চকরালভী, মোওয়াহিবুর রহমান, নাসিমে দাওয়াত, সনাতম ধরম, তাযকিরাতুশ শাহাদাতাইন, সীরাতুল আব্দাল, লেকচার লাহোর, লেকচার সিয়ালকোট, আহমদী অওর গয়ের আহমদী মে ফারক, লেকচার লুধিয়ানা, আল ওসিয়্যত, চশমায়ে মসীহী, তাজাল্লিয়াতে ইলাহীয়া, কাদিয়ান কী আরিয়া অওর হাম, হাকীকাতুল ওহী, চশমায়ে মা'রেফত, পয়গামে সুলেহ।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর কোন বইতে তৎকালীন বৃটিশ সম্রাজ্ঞী রাণী ভিক্টোরিয়া-কে ইসলামের দাওয়াত দেন?

উ. ১৮৯৭ সনে রচিত 'তোহ্ফায়ে কায়সারীয়া'।

প্র. আহমদীয়া জামা'তের প্রথম ম্যাগাজিন কোনটি?

উ. আল্ হাকাম। ১৮৯৭ সনের ৮ অক্টোবর তারিখে এটি প্রথম অমৃতসর হতে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এটি কাদিয়ান হতে প্রকাশিত হয়।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মসীহ হিন্দুস্থান মেঁ' (ভারতে যীশু) কখন প্রকাশিত হয়?

উ. ১৮৯৯ সনের এপ্রিল মাসে। এ বইয়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর ক্রুশ পরবর্তী ঘটনা এবং ভারতবর্ষে তাঁর আগমন সম্পর্কে বহু ঐতিহাসিক তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিম্নোক্ত পংক্তি কার সম্পর্কিত এবং কীভাবে পূর্ণতা পেয়েছিল?

الا اے دشمنِ نادان و بے راہ
بترس از تیغِ برّانِ محمدؐ

[অলো অয়ে দুশমানে নাদান ও বে রাহ
বাতরাস আয তেগে বার্‌রাহে মুহাম্মদ (সা.)]

অর্থ: হে নির্বোধ ও দিকভ্রান্ত শত্রু সাবধান! তুই মুহাম্মদ (সা.)-এর কর্তনকারী তরবারীকে ভয় কর।

উ. আর্য সমাজী পন্ডিত লেখরাম পেশওয়ারী সম্পর্কে যাকে আল্লাহ্ তা'লা একজন ফেরেশতার মাধ্যমে ১৮৯৭ সনে মুহাম্মদ (সা.)-এর তরবারীর শিকার বানিয়েছিলেন।

প্র. 'খুতবায়ে ইলহামীয়া' কী?

উ. ১৯০০ সনের ১১ এপ্রিল ঈদুল আযহার দিনে মহান আল্লাহ্ তা'লা কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরবি ভাষায় যে খুতবা প্রদান করেন তা-ই 'খুতবায়ে ইলহামীয়া' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। সম্পূর্ণ খুতবাটি ইলহাম আকারে তাৎক্ষণিকভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপর নাযিল হয়।

প্র. জামা'তে আহমদীয়ার নাম 'আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত' কখন রাখা হয়?

উ. ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আদম শুমারীর প্রাক্কালে।

প্র. The Review of Religions পত্রিকাটি কেন বিখ্যাত?

উ. ইংরেজি ভাষাভাষীদের কাছে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০২ সনের জানুয়ারি মাসে কাদিয়ান হতে এ পত্রিকাটির প্রকাশনা আরম্ভ করেন। এখন পত্রিকাটি লন্ডন ও কাদিয়ান হতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

প্র. 'মিনারাতুল মসীহ' এবং 'বায়তুদ দোয়া'- এর ভিত্তিপ্রস্তর কে, কখন রেখেছিলেন?

উ. সৈয়দনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৩ মার্চ ১৯০৩ সনে।

প্র. হযরত মাওলানা আব্দুল করিম সাহেব সিয়ালকোটি (রা.) এবং হযরত মৌলভী বুরহান উদ্দিন সাহেব জেহলমী (রা.) কখন মৃত্যুবরণ করেন?

উ. হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সাহেব সিয়ালকোটি (রা.) ১১ অক্টোবর ১৯০৫ সনে এবং হযরত মৌলভী বুরহান উদ্দিন সাহেব জেহলমী (রা.) ৩ ডিসেম্বর ১৯০৫ সনে মৃত্যুবরণ করেন।

প্র. বেহেশতি মাকবেরা কত সনে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ১৯০৫ সনে।

প্র. বেহেশতি মাকবেরায় কে সর্বপ্রথম সমাহিত হন?

উ. ১৯০৫ সনের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে হযরত আব্দুল করিম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.)।

প্র. সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ২৯ জানুয়ারি ১৯০৬ সনে।

প্র. বঙ্গভঙ্গ রদের ভবিষ্যদ্বাণী কখন করা হয়?

উ. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৯০৬ সনে বঙ্গভঙ্গ রদের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এটি ১৯১১ সনে পূর্ণতা লাভ করে।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিখ্যাত সাহাবী হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.) কবে বয়াত নেন?

উ. ১৯০৭ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে। এর পূর্বেও শৈশবকালে তিনি তাঁর পিতা-মাতার বয়াত গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্র. ওয়াকফে জিন্দেগী (জীবন উৎসর্গকারী)-র সুশৃঙ্খল তাহরীকের ব্যবস্থাপনা কখন সর্বপ্রথম সূচনা হয়?

উ. ১৯০৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে।

প্র. কোন আমেরিকান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে পত্রালাপের মাধ্যমে বয়াত নেন?

উ. মি. আলেক্সজান্ডার রাসেল ওয়েব। তিনি খ্রিস্টধর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সত্যের সন্ধানে বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে পড়াশুনা করেন। পরিশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবির কথা জেনে তাঁর সাথে পত্রালাপের মাধ্যমে বয়াত নেন।

প্র. একজন ইংরেজ সৌরবিজ্ঞানীর নাম বলুন– যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত নেন?

উ. প্রফেসর ক্লিমেন্ট রিগ ১৯০৮ সনের ১২ এবং ১৮ মে লাহোরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দেয়া উত্তরে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁর হাতে বয়াত নেন।

প্র. আল্লামা ইকবালের পিতা কী আহমদী ছিলেন?

উ. হ্যাঁ, ড. আল্লামা ইকবালের পিতা শেখ নূর মোহাম্মদ সাহেব আহমদী ছিলেন। তিনি মাওলানা আব্দুল করিম সিয়ালকোটি (রা.) ও সৈয়দ হামিদ শাহ্ সাহেবের তবলীগে বয়াত নেন। আল্লামা ইকবালও ১৮৯৭ সনে বয়াত নেন। এমনকি তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শানে 'আফতাবে সাদেক' নামক একটি নযম লিখেন। (সূত্র. তারিখে আহমদীয়াত)

প্র. কোন-কোন প্রতিষ্ঠান হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে?

উ. **(১) তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল :** ১৮৯৮ সনে এর ভিত্তি রাখা হয়। প্রথমে এটি প্রাইমারী পর্যায়ে ছিল। পরবর্তীতে উচ্চ বিদ্যালয় হয়।

(২) তা'লীমুল ইসলাম কলেজ : ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মে তারিখে আরম্ভ হয়। কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধার কারণে ২ বছর পর বন্ধ করে দিতে হয়। পুনরায় ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কাদিয়ানে আরম্ভ হয়।

(৩) মাদ্রাসা আহমদীয়া : জামা'তের বিশিষ্ট আলেমগণের অন্তর্ধানের প্রেক্ষিতে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাসা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন জামেয়া আহমদীয়া নামে প্রচলিত আছে। এর মাধ্যমে মুবাল্লিগ (প্রচারক) তৈরী হচ্ছে।

প্র. আহমদীয়া জামা'তের এমন দু'টি পত্রিকার নাম বলুন–যেগুলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জামা'তের 'দু'টি বাহু' বলে আখ্যা দান করেছেন?

উ. (১) আল হাকাম, (২) আল বদর। আল হাকাম বন্ধ হয়ে গেছে। আল বদর এখনও 'সাপ্তাহিক বদর' নামে কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কখন তাঁর জীবনের শেষ বক্তৃতা দেন?

উ. লাহোরে ১৯০৮ সনের ২৫ মে আসরের নামাযের পর তাঁর প্রিয় সাহাবীদের উদ্দেশ্যে জীবনের শেষ বক্তৃতা দেন।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কবে, কোথায় ইন্তেকাল করেন?

উ. ২৬ মে ১৯০৮ সনে লাহোরে হুযূর আকদাস (আ.) ইন্তেকাল করেন এবং ২৭ মে ১৯০৮ সনে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বেহেশতি মাকবেরা কাদিয়ানে তাঁর জানাযা নামায পড়ান এবং সেখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

প্র. মৃত্যুর সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুখ নিঃসৃত সর্বশেষ শব্দ কী ছিল?

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

উ.

اللہ میرے پیارے اللہ۔

'আল্লাহ্, মেরে পেয়ারে আল্লাহ্' (আল্লাহ্, আমার প্রিয় আল্লাহ্)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় বিখ্যাত ইলহাম ও ভবিষ্যদ্বাণী

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর প্রথম ইলহাম কখন অবতীর্ণ হয় এবং তা কী ?

উ. ১৮৬৫ সনে তাঁর কাছে প্রথম ইলহাম হয়। ইলহামটি ছিল:

ثَمَانِيْنَ حَوْلًا اَوْ قَرِيْبًا مِّنْ ذٰلِكَ اَوْتَزِيْدُ عَلَيْهِ سِنِيْنًا وَتَرٰى نَسْلًا بَعِيْدًا

(সামানীনা হাওলান্ আও কারীবাম্ মিন্ যালিকা-আও তাযীদু আ'লায়হি সিনীনান ওয়া তারা নাসলাম্ বা'য়ীদা)

অর্থ: তোমার বয়স ৮০ বছরের মত হবে অথবা দুই-চার কম অথবা বেশি, এবং তুমি এত বয়স পাবে যে অনেক প্রজন্ম দেখতে পাবে। (তাযকেরা, প্রকাশিত: ১৯৬৯, পৃ.৭)।

প্র. কখন তিনি মা'মুর (প্রত্যাদিষ্ট) হিসাবে ইলহাম প্রাপ্ত হন?

উ. ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ তারিখে ইলহাম প্রাপ্ত হন। ইলহামটি ছিল:

قُلْ اِنِّیْ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِیْنَ

(কুল ইন্নী উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মু'মিনীন)

অর্থ: তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদিষ্ট হয়েছি এবং এতে আমিই প্রথম বিশ্বাসী।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ ইলহাম:

شَاتَانِ تُذْبَحَانِ

(শাতানে তুয্‌বাহানে)

অর্থ: দু'টি বকরী জবাই করা হবে- এর তাৎপর্য কী?

উ. এ ইলহামে হযরত মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) এবং হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)-এর হৃদয় বিদারক শাহাদাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ দুই বুযূর্গকে আহমদী হওয়ার কারণে আফগানিস্তানে শহীদ করা হয়। হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.) ১৯০৩ সনের ১৪ জুলাই শাহাদাত বরণ করেন।

প্র. হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ আরবি, ফার্সি, ইংরেজি, উর্দূ এবং পাঞ্জাবি ভাষার একটি করে ইলহাম লিখুন।

উ. **আরবি ইলহামঃ** أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

(আলায়সাল্লাহু বিকাফিন আ'বদাহু)

অর্থঃ আল্লাহ্ কী তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?

ফার্সি ইলহামঃ مکن تکیہ بر عمر نا پائیدار

(মাকুন তাকিয়া বর উমার না পায়েদার)

অর্থঃ এ অস্থায়ী জীবনের উপর ভরসা করো না।

ইংরেজি ইলহাম ঃ- I shall give you a large party of Islam.

অর্থঃ আমি তোমাকে ইসলামের একটি বিশাল জামা'ত দান করব।

পাঞ্জাবি ইলহামঃ جے توں میرا ہو رہیں سب جگ تیرا ہو

(জে তু মেরা হো রাহেঁ সব জাগ তেরা হো)

অর্থঃ তুমি আমার হলে গোটা জগৎ তোমার হবে।

উর্দূ ইলহামঃ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا

اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا

(দুনিয়া মেঁ এক নাযীর আয়া, পার দুনিয়ানে উসকো কবুল না কিয়া, লেকিন খোদা উসে কবুল কারেগা অওর বাড়ে যোর আওর হামলোঁ সে উসকি সাচ্চাই যাহের কার দেগা)

অর্থঃ পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছেন। কিন্তু পৃথিবী তাঁকে গ্রহণ করেনি। কিন্তু খোদা তাঁকে গ্রহণ করবেন এবং মহা শক্তিশালী প্রচন্ড আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তাঁর সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

প্র. সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আহমদীয়া জামা'তের বিজয়ের জন্য কী ইলহাম নাযিল হয়েছিল?

উ. میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا

(ম্যাঁ তেরি তবলীগ কো যামীন কে কিনারোঁ তাক পঁহচাউঙ্গা)

অর্থঃ আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছাব।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দু'টি ইলহাম লিখুন যাতে কাদিয়ান হতে হিজরত এবং প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ করা হয়েছে।

উ. (১) 'দাগে হিজরত' (হিজরতের চিহ্নাবলী) (২) 'ইন্নাল্লাযী ফারাযা আলায়কাল কুরআনা লারা-আদ্দুকা ইলা মায়াদিন' (সেই সত্তা যিনি তোমার উপর কুরআনের সেবা ফরয করেছেন অবশ্যই তিনি তোমাকে তোমার ঠিকানায় ফিরিয়ে আনবেন)।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এমন একটি ইলহামী দোয়া বলুন– যা তিনি খুব বেশি করে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

উ. رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانْصُرْنِي وَارْحَمْنِي

(রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ফায্নি ওয়ানসুরনি ওয়ার হামনি)

অর্থঃ হে আমার প্রভু! যা কিছু আছে সবই তোমার সেবক; সুতরাং হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর। তুমিই আমাকে সাহায্য কর আর তুমিই আমার প্রতি করুণা কর।

প্র. جَرِيُّ اللهِ فِي حُلَلِ الْأَنْبِيَاءِ (জারিউল্লাহি ফি হুলালিল আম্বিয়ায়ি)– অর্থাৎ, 'নবীগণের পোষাকে খোদার পাহলোয়ান' কে এবং কেন?

উ. এ উপাধি আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দান করেছেন। কেননা, আঁ-হযরত (সা.)-এর পূর্ণ আনুগত্য ও দাসত্বের কল্যাণে তিনি পূর্ববর্তী নবীদের বুরুজে (প্রতিচ্ছবিতে) পরিণত হয়েছেন।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম 'মুসলমানোঁ কা লিডার' (মুসলমানদের নেতা) দিয়ে কাকে বুঝানো হয়েছে?

উ. 'মুসলমানোঁ কা লিডার' দিয়ে হযরত মৌলভী আব্দুল করিম সিয়ালকোটি (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাকে 'শেইখে আযম' বলে সম্বোধন করেছেন?

উ. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতিফ (রা.)-কে 'শেইখে আযম' বলে সম্বোধন করেছেন।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপর অবতীর্ণ তাঁর জীবনের শেষের দিকের একটি ইলহাম লিখুন।

উ. اَلرَّحِيْلُ ثُمَّ الرَّحِيْلُ اَلْمَوْتُ الْقَرِيْبُ

(আর্ রাহিলু সুম্মার রাহিলু আল্ মাউতুল ক্বারীব)

অর্থঃ বিদায়, বিদায়, মৃত্যু সন্নিকটে।

প্র. রাশিয়ার জার (সম্রাট) সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কী ইলহামী ভবিষ্যদ্বাণী করেন?

উ. 'জার ভি হোগা তো হোগা উস্ ঘাড়ি বাহালে যার' (সেই সময়ে জারের শোচনীয় অবস্থা হবে)। ১৯১৭ সনে রাশিয়ার মহাপ্রতাপশালী সম্রাট জারের পতনের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের একটি শক্তিশালী নিদর্শন হিসেবে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণতা পায়।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মহান ভবিষ্যদ্বাণী "বাদশাহ্ তেরে কাপড়োঁ সে বারকাত ঢুন্ডেঙ্গে" (বাদশাহ্ তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে) কীভাবে পূর্ণতা পায়?

উ. ১৯৬৫ সনে গাম্বিয়ার গভর্ণর জেনারেল আলহাজ্জ স্যার এফ. এম. স্যাঙ্গাটে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কাছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র কাপড় পাওয়ার আবেদন করেন। তখন তাকে এটা প্রদান করা হয়। আর এভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণতা পায়।
এখনও প্রায় প্রতি বছর বৃটেনের সালানা জলসায় বহু রাজা ও বাদশাহ্ এ পবিত্র কাপড়ের কল্যাণ লাভ করছেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী

(১) "সেই রাতেই (৩০ জানুয়ারি, ১৯০৩) স্বপ্নে দেখলাম, যেন জারের (রাশিয়ার সম্রাট) রাজদণ্ড আমার হাতে রয়েছে এবং এর ভিতরে গুপ্তভাবে বন্দুকের নলও রয়েছে, উভয় কাজই চালানো যায়। আরও দেখলাম, সেই বাদশাহ্ যাঁর কাছে বু আলী সিনা ছিলেন– তাঁর ধনুক আমার কাছে রয়েছে। আর আমি সেই ধনুক থেকে একটা সিংহের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলাম। আর মনে হলো, বু আলী সিনা আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন এবং সেই বাদশাহ্ও (দাঁড়িয়ে আছেন)।" (দ্রষ্টব্যঃ তাযকেরা, পৃ. ৪৫৮)।
(২) সাহেবযাদা পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব (রা.) লিখেছেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেনঃ
"খোদা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন, আমার সিলসিলার মাঝেও প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দিবে এবং ফেত্না ও বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিরা পৃথক হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা সেই মতবিরোধকে মিটিয়ে দেবেন। বাকী যারা পৃথক হওয়ার যোগ্য এবং যারা সাধুতার সাথে সম্পর্ক রাখে না এবং ফেতনাপরায়ণ তারা পৃথক হয়ে যাবে। দুনিয়াতে এক হাশর হবে; আর সেটা হবে প্রথম হাশর। তখন রাজা-বাদশাহ্রা একে অপরের উপরে আক্রমণ চালাবে। এত বেশি হত্যাকাণ্ড হবে, ভূ-পৃষ্ঠ রক্তে প্লাবিত হয়ে যাবে। প্রত্যেক বাদশাহ্র প্রজারাও নিজেদের মাঝে ভয়াবহ যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত হবে। এক বিশ্বজোড়া ধ্বংসকাণ্ড সংঘটিত হবে। এ সব ঘটনারই কেন্দ্র হবে শাম বা সিরিয়া। সাহেবযাদা সাহেব! [সাহেবযাদা পীর সিরাজুল হক নোমানী (রা.)] সেই সময়ে আমার প্রতিশ্রুত পুত্র হবে। খোদা তাঁর সাথেই নির্ধারিত করে রেখেছেন সেসব ঘটনাকে। সেসব ঘটনার পর আমাদের সিলসিলার উন্নতি হবে এবং রাজা-বাদশাহ্রা আমাদের সিলসিলায় দাখিল হবেন। তোমাদেরকে সেই প্রতিশ্রুতিকে চিনে নিতে হবে।" (তাযকেরাতুল মাহ্দী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩)।
(৩) হুযূর (আ.) বলেছেন, "বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের তবলীগকে প্রতিহত করতে চায়, আমাকে তো আল্লাহ তা'লা আমার জামা'তকে (কাশফ বা দিব্যদৃষ্টিতে) বালুকারাশির

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

ন্যায় বিপুল সংখ্যায় দেখিয়েছেন।"
(৪) হুযূর (আ.) আরও বলেছেন, "আমি (কাশফ্ বা দিব্যদৃষ্টিতে) আমার জামা'তকে রাশিয়ার এলাকায় বালুকারাশির মত দেখতে পাচ্ছি।" (তাযকেরা, পৃ. ৮১৩)।
(৫) "এখন সেই দিন সন্নিকটে যখন সত্যতার সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং ইউরোপবাসী সত্য খোদার সন্ধান লাভ করবে। তারপর তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।" (তাযকেরা, পৃ. ২৯৪)।
(৬) "আমি আপনাকে (স্যার সৈয়দ আহমদ খান সাহেব) এ নিশ্চয়তা দান করছি, আমাকে একথাও পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছে, পুনরায় একবার ইসলামের দিকে হিন্দু ধর্মের প্রবলভাবে প্রত্যাবর্তন ঘটবে।" (ইশতেহার, ১২ মার্চ ১৮৯৭)।
(৭) "তোমার জন্যে সিরিয়ার সাধুগণ এবং আরবের আল্লাহ্র বান্দারা প্রার্থনা করছে।" এ ইলহাম প্রসঙ্গে হুযূর (আ.) বলেছেন, খোদা জানেন এটা কী ব্যাপার এবং তা কখন, কীভাবে প্রকাশ পাবে।
(৮) "আমি (স্বপ্নে) দেখলাম, আমি লন্ডন শহরের একটি বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে আছি এবং ইংরেজি ভাষায় জোরালো যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে ইসলামের সত্যতা তুলে ধরছি। এরপর আমি অনেকগুলো পাখি ধরলাম যেগুলো ছোট-ছোট গাছের ওপরে বসা ছিল। পাখিগুলো ছিল সাদা রঙের এবং আকারে তিতির পাখির সমান।
পরে, আমি এর তা'বির করলাম, যদিও আমি নিজে নই, তবু আমার বক্তৃতাবলী সেসব লোকের মাঝে প্রচারিত হবে এবং বহুসংখ্যক সৎ ও ন্যায়বান ইংরেজ সত্যের শিকারে পরিণত হবে।" (ইযালায়ে আওহাম, পৃ. ৫১৫-৫১৬)।
(৯) "কাশ্‌ফী (দিব্যদৃষ্টির) অবস্থায় এ অধম দেখতে পেল, মানুষের চেহারায় দুই ব্যক্তি একটি বাড়িতে বসে আছে। একজন মাটির ওপরে অপরজন ছাদের কাছে। আমি তখন সেই ব্যক্তিকে, যে মাটিতে বসা ছিল তাকে সম্বোধন করে বললাম, আমার এক লাখের একটি (আধ্যাত্মিক) সেনাবাহিনী দরকার, কিন্তু সে চুপ করে থাকলো, কোন জবাবই দিল না। তখন আমি অপর ব্যক্তির দিকে ফিরলাম, যে ছাদের কাছাকাছি আকাশের দিকে ছিল এবং তাকে সম্বোধন করে বললাম, আমার এক লাখের একটা সেনাবাহিনী দরকার। সে আমার এ কথা শুনে বলল, এক লাখ তো পাওয়া যাবে না, তবে পাঁচ হাজার সিপাহী দেয়া যাবে। তখন আমি মনে মনে বললাম, পাঁচ হাজার যদিও সংখ্যায় অল্পই, তবু খোদা তা'লা চাইলে অল্প বহু সংখ্যকের ওপর জয়লাভ করতে পারে। সেই সময় আমি এ আয়াত পাঠ করলাম-
"কত ছোট-ছোট দল আল্লাহ্র হুকুমে বড়-বড় দলের উপর জয়যুক্ত হয়েছে।" (ইযালায়ে আওহাম, তাযকেরা, পৃ. ১৭৮)।
(১০) "আর আমি (কাশফে) দেখতে পাচ্ছি, মক্কার অধিবাসীরা সর্বশক্তিমান খোদার বাহিনীতে দলে-দলে যোগদান করছে এবং এটি হবে আকাশের প্রভুর পক্ষ থেকে, যা এ

পৃথিবীবাসীর চোখে বিস্ময়কর ঠেকবে।" (নূরুল হক, ২য় খন্ড, তাযকেরা, পৃ. ২৫৬)।

১১. "আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি কাদিয়ানের দিকে আসছি। খুব অন্ধকার। রাস্তা সনাক্ত করাই কষ্টকর। আমি অনুমানের ওপর পা বাড়ালাম। একটা অদৃশ্য হাত আমাকে সাহায্য করছিল এবং আমি কাদিয়ানে পৌঁছে গেলাম এবং যে মসজিদটি শিখদের দখলে আছে, তা আমার দৃষ্টিতে এল। এরপর আমি সেই সোজা রাস্তাটি ধরে চলতে থাকলাম যেটি কাশ্মীরের দিক থেকে এসেছে। সেই সময়ে আমি এতো আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম যেন মনে হচ্ছিল, সেই আতংকে আমি বেহুঁশ হয়ে যাবো। তখন আমি বার-বার এ দোয়া পড়তে থাকলাম 'রাব্বি তাজাল্লা, রাব্বি তাজাল্লা (হে প্রভু! তুমি প্রকাশিত হও, হে প্রভু! তুমি প্রকাশিত হও) এক দেওয়ানার হাতে আমার হাত ছিল, এবং সে রাব্বি তাজাল্লা পড়ছিল। আর আমি খুব জোরের সঙ্গে দোয়া করছিলাম এবং এর আগে, আমার মনে আছে আমি আমার জন্য, আমার স্ত্রীর জন্য এবং আমার ছেলে মাহমুদের জন্য অনেক দোয়া করেছিলাম। পরে আমি স্বপ্নে দেখলাম দু'টি কুকুর, একটি খুব কালো, অন্যটি সাদা। আর এক ব্যক্তি কুকুর দু'টির পাঞ্জা কাটছে। এরপর ইলহাম হল:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

(কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাসি)

অর্থ: "তোমরাই সর্বোৎকৃষ্ট উম্মত, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্যে উত্থিত করা হয়েছে।" (তাযকেরা, পৃ. ২০৭- ২০৮)।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী ও মসীহ মাওউদ (আ.) তাঁহার **"আইয়ামুস সুলেহ্"** পুস্তকে বলেছেন:

"আমরা ঈমান রাখি, খোদা তা'লা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি, ফেরেশতা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা আরও ঈমান রাখি, কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা যা বলেছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যা বর্ণিত হয়েছে– উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তা সবই সত্য। আমরা এ-ও ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয় অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্যকরণীয় বলে নির্ধারিত তা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধকরণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিরোধী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা **'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু**

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এ ঈমান নিয়ে মৃত্যু বরণ করে। কুরআন শরীফ হতে যাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদা তা'লা এবং তার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করে, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করে সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযূর্গানের 'ইজমা'– অর্থাৎ, সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেয়া হয়েছে, সেসব সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক্ওয়া বা খোদাভীতি এবং সততা বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকবে, কবে সে আমাদের বুক চিরে দেখেছিল, আমাদের এই অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহি আলাল কাযিবীনা ওয়াল মুফতারীনা–"

অর্থাৎ, সাবধান! নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

(হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক প্রণীত)

(১) বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্ক (খোদা তা'লার অংশীবাদিতা) হতে পবিত্র থাকবে।

(২) মিথ্যা, ব্যভিচার, কুদৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম (অত্যাচার) ও খেয়ানত (আত্মসাৎ), অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হোক না কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দুরূদ পড়বে, প্রত্যহ নিজের পাপসমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট প্রার্থনা করবে ও নিয়মিত ইস্তেগফার পড়বে, এবং আবেগাপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর হাম্‌দ ও তা'রিফ (প্রশংসা) করবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে সাধারণত আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষত কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের উপরে সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

(৭) অহংকার ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবনযাপন করবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন থেকে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

(৯) আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

(১০) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালামের) সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলো, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসুলভ অবস্থার মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ : ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ ইং)।

খিলাফতে আহমদীয়া

খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল

হযরত হাফেয মাওলানা আলহাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন (রা.)

প্র. হযরত হেকিম মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ. তিনি (রা.) ১২৫৬ হিজরি মোতাবেক ১৮৪১ সালে পাঞ্জাবের শাহপুর জেলার ভেরা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর সম্মানিত পিতা-মাতার নাম বলুন?

উ. পিতার নামঃ মোহতরম হাফেয গোলাম রসূল সাহেব এবং মাতার নামঃ মোহতরমা নূর বখত সাহেবা।

প্র. হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) ইসলামের কোন খলীফার বংশধর ছিলেন?

উ. বংশানুক্রমিক ধারায় তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর

(রা.)-এর ৩৪তম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন।

হযরত হাফেয মাওলানা আলহাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন (রা.)

প্র. হুযূর (রা.) কত সালে কাবাগৃহে হজ্জ পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন?

উ. ১৮৬৫ ইং সনে।

প্র. হুযূর আনোয়ার (রা.) জ্ঞানার্জনের জন্য যে সকল শহরে ভ্রমণ করেছিলেন তার মধ্যে থেকে কয়েকটি শহরের নাম বলুন?

উ. মক্কা মোকাররমা, মদীনা মুওনাওয়ারা, বোম্বাই, রাওয়ালপিন্ডি, রামপুর, লক্ষ্মৌ এবং ভূপাল ইত্যাদি।

প্র. তিনি (রা.) কত সালে সর্বপ্রথম সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন?

উ. ১৮৮৫ ইং সনে।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত হেকিম নূরুদ্দীন (রা.)-কে কত সালে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সর্বপ্রথম সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করেন?

উ. ২৯ জানুয়ারি ১৯০৬ ইং সনে।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর প্রসিদ্ধ পুস্তকাবলীর নাম লিখুন।

উ. ১) ফাসলুল খিতাব, ২) তাসদিকে বারাহীনে আহমদীয়া, ৩) আবতালে উলুহিয়্যাতে মসীহ্।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর ইতায়াতের বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কী মন্তব্য করেছিলেন?

উ. "তিনি আমার এক একটি নির্দেশের এমন অনুসরণ করেন যেমন 'নব্য কী হরকত তানাফফুস কী হরকত' (হৃদয়ের স্পন্দনের সাথে ধমণীর স্পন্দন)।" [আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম]।

প্র. আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফা কে? কবে তিনি খিলাফতের আসনে সমাসীন হন?

উ. হযরত হাফেয মাওলানা হাজীউল হারামাঈন শরীফাঈন হেকিম নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)। তিনি ১৯০৮ সালের ২৭ মে তারিখে আহমদীয়া খিলাফতের আসনে সমাসীন হন।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর প্রতি
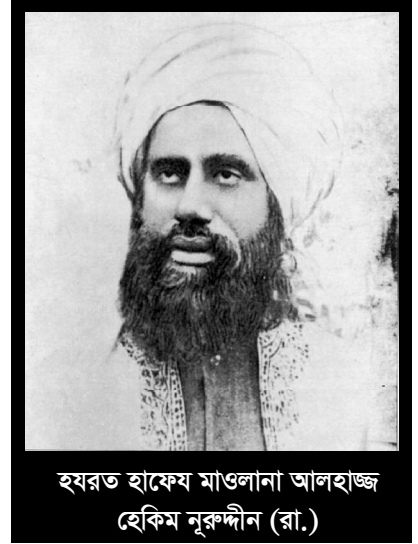
কিরূপে তাঁর আস্থা ব্যক্ত করেছেন?

উ. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন ঃ-

(চেহ্ খোশ বুদে গার হার ইয়াক আয উম্মাতে নূরে দীঁ বুদে
হামিঁ বুদে গার হার দিল পুর আয নূর ইয়াক্বী বুদে)

অর্থ: "কতো আনন্দের ব্যাপার হতো যদি উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি নূরুদ্দীন হতো, কতোই না ভাল হতো যদি প্রত্যেকটি হৃদয় একীনের নূরে (দৃঢ় বিশ্বাসের জ্যোতিতে) পরিপূর্ণ হতো!"

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) 'বায়তুল মাল' বিভাগ কখন কায়েম করেন?

উ. ৩০ মে ১৯০৮ সনে।

প্র. তালীমুল ইসলাম হাই স্কুল, কাদিয়ানের বোর্ডিং ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর কে, কখন রেখেছিলেন?

উ. ১৯১০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর তাফসীরে কুরআন কী নামে প্রকাশিত হয়েছে?

উ. হাকায়েকুল ফুরকান (কুরআনের তত্ত্বকথা)।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর মারাত্মকভাবে আহত হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করুন।

উ. ১৯১০ সনের অক্টোবর মাসে মুলতান সফরের প্রাক্কালে তিনি ঘোড়া হতে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। তা সত্ত্বেও তিনি (রা.) আনন্দিত হন; কেননা এভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে যাতে ইঙ্গিত ছিল, 'নূরুদ্দীন ঘোড়া হতে পড়ে যাবে।'

প্র. একজন বাঙালির নাম উল্লেখ করুন যিনি হুযূর (রা.)-এর হাতে বয়াত নেন?

উ. ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিখ্যাত মাওলানা হযরত সৈয়্যদ মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব এক বিশেষ দ্বীনি সফরে সমস্ত ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ওলামাদের সাথে আলাপ-আলোচনা শেষে ১৯১২ সনের ১লা নভেম্বর হুযূর (রা.)-এর পবিত্র হাতে বয়াত নেন।

প্র. আল্ ফযল পত্রিকার প্রকাশনা কখন আরম্ভ হয়?

উ. ১৯১৩ সনের ১৮ জুন হুযূর (রা.)-এর অনুমতিক্রমে ও সাহেবযাদা মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) সাহেবের সম্পাদনায় শুরুতে সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে 'আল ফযল'- এর প্রকাশনা আরম্ভ হয়। এরপর এ পত্রিকা তিন দিন পর পর প্রকাশ হতে থাকে

এবং অবশেষে ১৯৩৫ সনের ৮ই মার্চ হতে এটা দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বর্তমানে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল্ খামেস (আই.)-এর তত্ত্বাবধানে লন্ডন হতে 'সাপ্তাহিক আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল' নামে এর একটি সংস্করণ বের হচ্ছে।

প্র. আফ্রিকায় আহমদীয়াত সম্বন্ধে হুযূর (রা.) কী ভবিষ্যদ্বাণী করেন?

উ. ১৯১৪ সনের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে হুযূর (রা.) ঘোষণা করেন, 'অসুস্থাবস্থায় খোদা তা'লা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, আফ্রিকায় ৫ লক্ষ খ্রিস্টান মুসলমান হবে।'

প্র. প্রথম খিলাফত কালের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কর্মকান্ড বলুন?

উ. • মোবাল্লেগ পাঠানোর কার্যক্রমের সূচনা হয়। (সর্বপ্রথম মোবাল্লেগ ছিলেন হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়াল সাহেব (রা.) যাকে ইংল্যান্ডে প্রেরণ করা হয়)।

- বায়তুল মাল গঠন।
- আনুষ্ঠানিক লঙ্গরখানার ব্যবস্থাপনার সূচনা।
- "নূর" পত্রিকা এবং "আল হক" পত্রিকা প্রকাশ।

("নূর" পত্রিকা শিখদের জন্য এবং "আল হক" পত্রিকা হিন্দুদের মধ্যে তবলীগি কাজের জন্য প্রকাশ করা হয়েছিল)।

- আনুষ্ঠানিক মাদ্রাসা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা।
- কাদিয়ানে 'পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা।

প্র. হুযূর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত নিজ জীবনের ঘটনাবলী যে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে এর নাম কী?

উ. মীরাকাতুল ইয়াকীন ফী হায়াতে নূরুদ্দীন।

প্র. হুযূর (রা.) কবে কখন ইন্তেকাল করেন?

উ. ১৯১৪ সনের ১৩ মার্চ শুক্রবার বাদ জুমু'আ দুপুর ২:৩০ মিনিটে কাদিয়ানে। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সমান আয়ুপ্রাপ্ত হন (৭৩ বছর); যেরূপে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত রসূল করিম (সা.)-এর সমান আয়ুপ্রাপ্ত হয়েছিলেন (৬৩ বছর)।

খলীফাতুল মসীহ্ সানী

হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কবে, কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

উ. ১৮৮৯ সালের ১২ জানুয়ারি কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) হযরত রসূল করিম (সা.)-এর কোন ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়নকারী সাব্যস্ত হয়েছিলেন?

উ. يَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ (ইয়াতাযাওয়্যাজু ওয়া ইউলাদু লাহু)– অর্থাৎ, আগমনকারী ইমাম

হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)
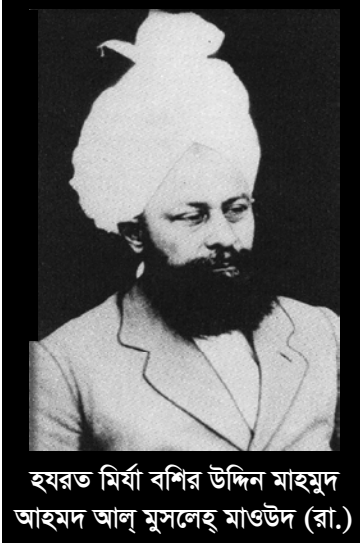
মাহদী বিবাহ্ করবে এবং তাঁর ঔরসে এক অসাধারণ সন্তান জন্মগ্রহণ করবে।

প্র. হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কবে সর্বপ্রথম সালানা জলসায় বক্তৃতা দেন?

উ. ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে মাত্র সতর বছর বয়সে তিনি কাদিয়ানে সালানা জলসায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'শিরকের মূলোৎপাটন'।

প্র. হুযূর (রা.) কবে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন?

উ. ১৪ মার্চ, ১৯১৪ সনে।

প্র. উপমহাদেশের বাইরে জামা'তে আহমদীয়ার সর্বপ্রথম তবলীগি মিশন কখন কার মাধ্যমে, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ২৮ জুন ১৯১৪ সনে লন্ডন, ইংল্যান্ডে হযরত চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল (রা.)-র মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ 'তা-ঈ আয়ি' (বড় চাচী এলেন) ইলহামটি কখন পূর্ণতা পায়?

উ. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বড় ভাই মির্যা গোলাম কাদের সাহেবের বিধবা স্ত্রী ১৯১৬ সনের মার্চ মাসে হুযূর (রা.)-এর হাতে বয়াত নেন। এভাবে 'তা-ঈ আয়ি' ইলহামটি পূর্ণতা পায়?

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী ওয়াকফে জিন্দেগী (জীবন উৎসর্গ) করার সর্বপ্রথম তাহরীক কখন করেছিলেন?

উ. ৭ ডিসেম্বর ১৯১৭ সনে।

প্র. সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ায় 'নাযারাত' (পর্যবেক্ষণ বিভাগ) কত সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উ. ১লা জানুয়ারি ১৯১৯ সনে।

প্র. জামা'তে আহমদীয়ার মজলিসে মুশাভিরাত (পরামর্শ সভা) কখন আরম্ভ হয়?

উ. হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কর্তৃক ১৯২২ সনের ১৫-১৬ এপ্রিল।

প্র. হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অভ্যন্তরীণভাবে জামা'তকে কী কী সংগঠনে বিভক্ত করেন।

উ. (১) লাজনা ইমাইল্লাহ্ : ১৯২২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে আহমদী

মহিলাদের জন্য, (২) নাসেরাতুল আহমদীয়া : ১৯২৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত বালিকাদের জন্য, (৩) মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া : ১৯৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত আহমদী যুবকদের জন্য, (৪) মজলিস আতফালুল আহমদীয়া : ১৯৩৮ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৭ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত আহমদী বালকদের জন্য। (৫) মজলিসে আনসারুল্লাহ্ : ১৯৪০ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে আহমদী পুরুষদের জন্য,

প্র. শুদ্ধি আন্দোলন কী? এর প্রতিরোধকল্পে হুযূর (রা.) কী পদক্ষেপ নেন?

উ. ভারতের উত্তর প্রদেশে আর্য সমাজীরা ১৯২২ সনে সেখানকার গ্রামাঞ্চলের মুসলমানদেরকে (যারা হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিল) জোরপূর্বক হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্যে এক ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করে। এটিই ইতিহাসে 'শুদ্ধি আন্দোলন' নামে খ্যাত। এর প্রতিরোধকল্পে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জিহাদের ডাক দেন এবং আহমদীদের সেখানে গিয়ে ইসলামের স্বপক্ষে প্রচারণা ও অন্যান্য কর্মকান্ডে অংশ নিতে বলেন যাতে ধর্মত্যাগী মুসলমানরা আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসে।

প্র. হুযূর (রা.) কবে এবং কোন উপলক্ষে প্রথম লন্ডন যান?

উ. ধর্মীয় সম্মেলন উপলক্ষে তিনি ১৯২৪ সনে ইসলামের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রথম লন্ডনে যান। এ উপলক্ষে তিনি 'আহমদীয়াত' তথা প্রকৃত ইসলাম (Ahmadiyyat or True Islam) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেন– যা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি পাঠ করেন হযরত চৌধুরী স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.)। পথিমধ্যে তিনি মিসর, সিরিয়া এবং ফিলিস্তিনেও অবস্থান করেন।

প্র. হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ভারত উপমহাদেশের বাইরে কোন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর নিজ পবিত্র হাতে স্থাপন করেন?

উ. লন্ডনের 'মসজিদ ফযল'। ১৯২৪ সনে এর ভিত্তি রাখা হয় এবং ১৯২৬ সনে সম্পূর্ণ হয়। ১৯২৬ সনের ৩রা অক্টোবর স্যার আব্দুল কাদির লন্ডন মসজিদের উদ্বোধন করেন।

প্র. তাঁর দশটি পুস্তকের নাম লিখুন।

উ. ১) দাওয়াতুল আমীর, ২) তা'ল্লুক বিল্লাহ্, ৩) হাস্তিয়ে বারী তা'লা, ৪) মিনহ-াজুত্তালিবীন, ৫) ইসলাম কা ইকতেসাদী নেযাম, ৬) নেযামে নও, ৭) সীরাতে খায়রুর রুসূল, ৮) আয়নায়ে সাদাকাত, ৯) মালায়িকাতুল্লাহ্, ১০) যিকরে ইলাহী।

প্র. কখন সর্বপ্রথম আহমদী মহিলাদের জলসা সালানার সূচনা হয়?

উ. ডিসেম্বর ১৯২৬ সনে।

প্র. হুযূর (রা.)-এর তাহরীক অনুযায়ী সর্বপ্রথম কখন সমগ্র ভারত উপমহাদেশব্যাপী 'সীরাতুন নবী (সা.) দিবস' উদযাপন করা হয়?

উ. ১৭ জুন ১৯২৮ সনে।

প্র. মুসলমানরা কখন হুযূর (রা.)-কে কাশ্মীরের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত

'অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটি'-এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত করেন?

উ. ১৯৩১ সনের ১৫ জুলাই। এই সম্মেলনে আল্লামা ইকবাল, সৈয়দ মোহসিন শাহ, সৈয়দ হাবীব এবং খাজা হাসান নিজামীর মতো গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা ইকবাল সাহেব সভাপতি হিসেবে হুযূর (রা.)-এর নাম প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন।

প্র. পাকিস্তানের জাতির জনক কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'মসজিদ ফযল' লন্ডনে কখন বক্তৃতা দিয়েছিলেন?

উ. ২৩ এপ্রিল ১৯৩৩ সনে।

প্র. হুযূর (রা.) কত সালে তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন? এর মোতালেবাত (দাবি) কয়টি ছিল?

উ. ১৯৩৪ সনে। সর্বমোট ২৭টি মোতালেবাত ছিল। যেমন: সহজ-সরল, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন, ওয়াকারে আমল, ওয়াকফে জিন্দেগী ইত্যাদি।

প্র. তাহরীকে জাদীদের প্রথম বছর হুযূর (রা.) কত টাকা চাঁদা আদায় হবার জন্য তাহরীক করেন আর জামা'ত কত টাকা আদায় করেছিল?

উ. হুযূর (রা.) ২৭০০০/- (সাতাশ হাজার) টাকা চাঁদা আদায় করার জন্য তাহরীক করেন। কিন্তু খোদার প্রেমে বিভোর ইসলামের খাঁটি প্রেমিকরা এক লক্ষ চার হাজার টাকার ওয়াদা করে এবং পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা নগদ আদায় করে হুযূরের খেদমতে পেশ করে।

প্র. মসজিদে আকসা, কাদিয়ানে লাউড স্পিকারের মাধ্যমে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সর্বপ্রথম কখন খুতবা জুমু'আ প্রদান করেছিলেন?

উ. ৭ জানুয়ারি ১৯৩৮ সনে।

প্র. হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দু'টি উল্লেখযোগ্য তাহরীকের নাম বলুন?

উ. ১) ওয়াকফে জিন্দেগীর তাহরীক, ২) হিফ্যে কুরআনের তাহরীক।

প্র. কত সালে জামা'তে আহমদীয়ার ৫০ বছর পূর্তি এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর খিলাফত কালের ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়?

উ. ১৯৩৯ সনে।

প্র. 'লাওয়ায়ে আহমদীয়া'– অর্থাৎ, আহমদীয়াতের পতাকা কবে সর্বপ্রথম উড্ডীন করা হয়?

উ. হুযূর (রা.) ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে 'লাওয়ায়ে আহমদীয়া' উত্তোলন করেন। পতাকার কাপড়ের কার্পাশ এক সাহাবী নিজ জমিতে উৎপন্ন করেন। পুরুষ সাহাবাগণ এ থেকে তুলা বের করেন এবং মহিলা সাহাবীরা নিজ হাতে সুতা কাটেন। তারপর এ সুতা দিয়ে পুরুষ সাহাবীরা কাপড় তৈরী করেন। পতাকার কাপড়ের রং কালো, লম্বা ১৮ ফুট এবং প্রস্থ ৯ ফুট, মধ্যখানে শুভ্র রং-এর মিনারাতুল মসীহ্- এর একদিকে বদর (পূর্ণ চন্দ্র) এবং

অন্যদিকে হিলাল (দ্বিতীয়ার চাঁদ)।

লাওয়ায়ে আহমদীয়া (আহমদীয়াতের পতাকা)

প্র. 'লাওয়ায়ে খোদ্দামুল আহমদীয়া' কখন উত্তোলন করা হয়? এর আকৃতি ও নকশা কী?

উ. ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর লাওয়ায়ে আহমদীয়া উত্তোলন করার পর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) নিজ পবিত্র হাতে প্রথমবারের মতো 'লাওয়ায়ে খোদ্দামুল আহমদীয়া' উত্তোলন করেন। পতাকার দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট এবং প্রস্থ ৯ ফুট। এক-তৃতীয়াংশে লাওয়ায়ে আহমদীয়ার মতো নক্শা করা এবং বাকী অংশ তেরটি সাদাকালো রেখায় বিভক্ত। এর তেরটি রেখা ইসলামের তের শতাব্দীর প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে।
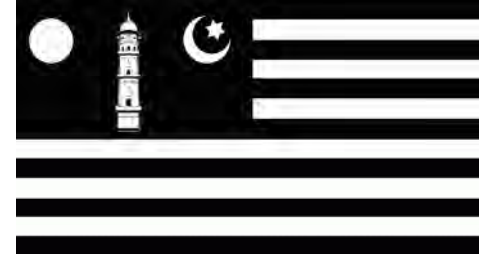
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার পতাকা

প্র. খোদ্দামুল আহমদীয়া পতাকার ডিজাইনার এর নাম কী?

উ. মোহতরম মালেক আতাউর রহমান সাহেব।

প্র. খোদ্দামুল আহমদীয়া যুব সংগঠনের প্রথম শহীদের নাম কী?

উ. এই যুব সংগঠনের প্রথম শহীদ হলেন হাফেয বশীর আহমদ সাহেব। তিনি ২রা মে ১৯৩৮ সালে শাহাদাত বরণ করেন।

প্র. হুযূর (রা.) কত সালে হিজরি শামসি সনের প্রবর্তন করেন?

উ. ১৯৪০ সনে।

প্র. খ্রিস্টিয় সন থেকে কিভাবে হিজরি শামসি সন বের করতে হয় ?

উ. খ্রিস্টিয় সন থেকে ৬২১ বছর বাদ দিলে হিজরি শামসি সন পাওয়া যাবে। যেমন : ২০১৩-৬২১ = ১৩৯২ হিজরি শামসি।

প্র. হুযূর (রা.)-এর মুসলেহ্ মাওউদ হবার দাবি সম্বন্ধে সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

উ. মহামহিম খোদা তা'লা ১৯৪৪ সনের ৫-৬ জানুয়ারির মধ্যবর্তী রাতে হুযূর (রা.)-কে 'মুসলেহ্ মাওউদ ' হওয়ার ব্যাপারে কাশ্‌ফ দেখান। এ সম্পর্কিত ইলহামটি হলো:

اَنَــاالْـمَسِيْـحُ الْـمَـوْعُـوْدُ مَثِيْـلُـهٗ وَخَلِيْفَتُـهٗ

(আনাল মাসীহুল মাওউদু মাসীলুহু ওয়া খালীফাতুহু)

অর্থাৎ- আমি মসীহ্ মাওউদের সদৃশ এবং তাঁর খলীফা।

২৮ জানুয়ারি কাদিয়ানে হুযূর (রা.) সর্বসাধারণের সামনে সর্বপ্রথম মুসলেহ্ মাওউদ হওয়ার ঘোষণা দেন। সেই বছরেই হুযূর (রা.) হুশিয়ারপুরে (২০ ফেব্রুয়ারি), লাহোরে (১১ মার্চ) এবং লুধিয়ানায় (২৩ মার্চ) তিনটি বিশেষ জলসায় তাঁর মুসলেহ্ মাওউদ দাবির ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন।

প্র. তালীমুল ইসলাম কলেজ, কাদিয়ান- এর উদ্বোধন কখন এবং কে করেছিলেন?

উ. ১৯৪৪ সনের ৪ জুন সৈয়দনা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)।

প্র. হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কাদিয়ান থেকে পাকিস্তানে কখন হিজরত করেন?

উ. ৩১ আগস্ট ১৯৪৭ সালে।

প্র. লাহোরে সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান কত সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উ. ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সনে।

প্র. পাকিস্তানের প্রথম মজলিসে শূরা কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সনে।

প্র. কে, কখন রাবওয়া শহরের গোড়াপত্তন করেন?

উ. হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) নিজের এক কাশফ (দিব্য দর্শন) এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী 'দাগে হিজরত' (হিজরতের চিহ্নাবলী)-কে পূর্ণ করার মানসে ১৯৪৮ সনের ২০ সেপ্টেম্বর রাবওয়া শহরের গোড়াপত্তন করেন।

প্র. তাহরীকে জাদীদের দ্বিতীয় দপ্তর কত সনে কায়েম হয়?

উ. ২৪ নভেম্বর ১৯৪৪ সনে।

প্র. বাংলা ভাষার ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ না করার জন্যে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) কী পরামর্শ দিয়েছিলেন?

উ. হুযূর (রা.) বলেছিলেন, "মাদারী যবান মেঁ তালীম দিই জায়ে, ইস সিলসিলে মেঁ মাশরেকি পাকিস্তান পার যোর না দি যায়ে কে ওহ যরুর উর্দূ কো যারিয়া তা'লীম বানায়ে, ওয়ারনা ওহ পাকিস্তান সে আলায়হিদা হো যায়েগা; কিঁউকে ওয়াহাঁকে বাসীন্দোঁ কো বাঙ্গালা যবান সে এক কিসিম কা ইশ্‌ক হ্যা।"

অর্থাৎ: "মাতৃভাষায় যেন শিক্ষা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানিদের যেন বাধ্য করা না হয় যে, অবশ্যই তারা উর্দূকে শিক্ষার মাধ্যম বানায়। নতুবা তারা পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা, সেখানকার অধিবাসীদের বাংলা ভাষার প্রতি এক অগাধ ভালোবাসা রয়েছে।" (তারিখে আহমদীয়াত, ১০ তম খন্ড, পৃ. ৪২২ এবং দৈনিক আল ফযল, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৪৭)।

প্র. হুযূর (রা.) কোন স্থানকে নিজের দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে উল্লেখ করেছেন?

উ. লাহোর-কে (দৈনিক আল্ ফযল, রাবওয়া, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৭)।

প্র. পাকিস্তানে জামা'তে আহমদীয়ার সালানা জলসা কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সনে লাহোরে।

প্র. রাবওয়াতে প্রথম জলসা সালানা কবে অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৫, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল ১৯৪৯ সনে।

প্র. কে, কখন রাবওয়াতে নিম্নোল্লিখিত বিভাগসমূহের কেন্দ্রীয় অফিসের ভিত্তি রাখেন?

১) 'কাসরে খিলাফত', ২) 'সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দপ্তর', ৩) 'তাহরীক জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার দপ্তর', ৪)'লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র দপ্তর'।

উ. হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯৫০ সনের ৩১ মে।

প্র. আহমদীয়াবিরোধী আন্দোলন চলাকালে হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরিফ আহমদ সাহেব (রা.) এবং হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)-কে কখন গ্রেফতার করা হয়?

উ. ১লা এপ্রিল ১৯৫৩ সনে।

প্র. হুযূর (রা.)-কে হত্যা করার জন্য কীভাবে হামলা চালানো হয়?

উ. ১৯৫৪ সনের ১০ মার্চ, বুধবার হুযূর (রা.) মসজিদ মোবারক, রাবওয়াতে আসরের নামায পড়াচ্ছিলেন। এমন সময় প্রথম কাতারে দাঁড়ানো আব্দুল হামিদ নামক এক ব্যক্তি হঠাৎ ছুরি দিয়ে তাঁর ঘাড়ে আঘাত করে। পরে প্রাথমিকভাবে হুযূর (রা.) এ আঘাত হতে সেরে উঠলেও তা তাঁর স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে।

প্র. হুযূর (রা.) প্রথমবার কখন ইউরোপ সফর করেন? এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

উ. হুযূর (রা.) ১৯২৪ সনের ১২ জুলাই প্রথমবারের মত ইউরোপ সফরে বের হন ।

- ১৯২৪ সনের ১৮ আগস্ট: হুযূর (রা.) ইটালীর প্রধানমন্ত্রী মুসোলিনীর সাথে সাক্ষাৎ করেন।
- ১৯২৪ সনের ২২ আগস্ট: হুযূর (রা.) প্রথম দফা লন্ডন সফর করেন।
- ১৯২৪ সনের ০৯ সেপ্টেম্বর: হুযূর (রা.) ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট ইউনিয়নে প্রথম ইংরেজিতে বক্তৃতা দেন।
- ১৯২৪ সনের ১৯ অক্টোবর: হুযূর (রা.) লন্ডন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

প্র. হুযূর (রা.) কবে, কখন দ্বিতীয়বার ইউরোপ সফরে যান?

উ. হুযূর (রা.) ২৯ এপ্রিল ১৯৫৫ সনে দ্বিতীয়বার ইউরোপ সফরের উদ্দেশ্যে করাচী থেকে যাত্রা করেন। জুরিখ, হামবুর্গ এবং লন্ডনে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তাঁর দেহে আঘাতের স্থান ভালভাবে পরীক্ষা করানো হয়। এ সফরে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন মিশন পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মিশনারীদের নিয়ে তিনি লন্ডনে কনফারেন্স করেন। এতে তিনি তাদের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দান করেন।

প্র. হুযূর (রা.) কখন জামা'তের কোন তিনজন বুযূর্গকে 'খালিদ' উপাধি প্রদান করেন?

উ. ১৯৫৬ সনের জলসা সালানার সময় নিম্নোক্ত তিনজন বুযূর্গকে 'খালিদ' উপাধি প্রদান করেছিলেন:

১) হযরত মাওলানা জালালুদ্দীন শামস্ সাহেব (রা.)।

২) হযরত মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব।

৩) মোকাররম মালিক আব্দুর রহমান খাদেম সাহেব।

প্র. ওয়াকফে জাদীদ-এর নেযাম কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ডিসেম্বর ১৯৫৭ সনে।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কবে ইন্তেকাল করেন?

উ. ১৯৬৫ সনের ৭-৮ নভেম্বর মধ্যবর্তী রাত ২:২০ মিনিটে রাবওয়া, পাকিস্তানে।

খলীফাতুল মসীহ্ সালেস
হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)

হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)

প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উ. ১৬ নভেম্বর ১৯০৯ সালে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন।
প্র. তাঁর (রাহে.) সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে কী ইলহাম হয়েছিল?
উ. ইলহাম: اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ نَافِلَةً لَّکَ
(ইন্না নুবাশ্শিরুকা বিগুলামীন নাফিলাতাল্লাকা) [হাকীকাতুল ওহী, পৃ. ৯৫]।
হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ ইলহামের অনুবাদ করেন, "আমি তোমাকে একজন পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, যে তোমার পৌত্র হবে।"
প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কবে কুরআন শরীফ সম্পূর্ণ হিফয (মুখস্ত) করেন?
উ. ১৭ এপ্রিল ১৯২২ সনে। তখন তাঁর (রাহে.) বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর।
প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) খিলাফতে সমাসীন হবার পূর্বে জামা'তের কোন-কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্বরত ছিলেন?
উ. • ১৯৩৯-১৯৪৪ ইং: প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, কাদিয়ান।
• ১৯৩৯-১৯৪৯ ইং: বিশ্ব সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া।
• ১৯৪৪-১৯৬৫ ইং: প্রিন্সিপাল, তালীমুল ইসলাম কলেজ, কাদিয়ান, লাহোর এবং রাবওয়া।
• ১৯৫৪-১৯৬৮ ইং: বিশ্ব সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্।
• ১৯৫৫-১৯৬৫ ইং: সদর, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়া, রাবওয়া।
প্র. তৃতীয় খলীফার নির্বাচন কবে হয়?
উ. ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ নভেম্বর হযরত সাহেবযাদা মির্যা আযিয আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 'মজলিসে ইন্তেখাবে খিলাফত'-এর সভায় হযরত সাহেবযাদা হাফেয মির্যা নাসের আহমদ এম.এ. (অক্সন) তৃতীয় খলীফা নির্বাচিত হন এবং নির্বাচনের পরপরই রাবওয়ার মসজিদে মোবারকে বয়াত নেয়া আরম্ভ করেন।
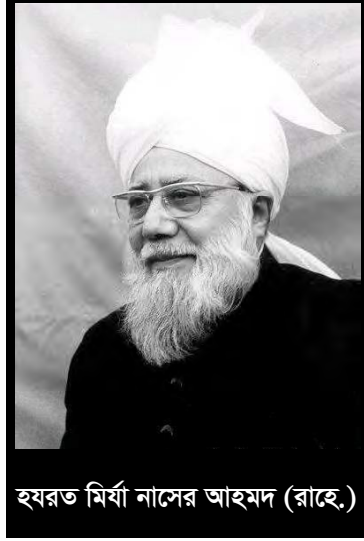
প্র. তৃতীয় খিলাফতের সর্বপ্রথম আর্থিক কুরবানীর তাহরীক কোনটি ছিল এবং কত টাকা চাঁদা আদায় করার টার্গেট দেয়া হয়েছিল?
উ. সর্বপ্রথম আর্থিক কুরবানীর তাহরীকটি ছিল 'ফযলে উমর ফাউন্ডেশন' এবং তিন বছরের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা চাঁদা আদায় করার টার্গেট দেয়া হয়েছিল। এ তাহরীকের উদ্দেশ্য ছিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর অসামান্য কার্যক্রমকে অব্যাহত গতিতে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলা।
প্র. কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আহমদী হয়েছিলেন এবং কোন ভবিষ্যদ্বাণীর বিকাশস্থল হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন?
উ. পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান আলহাজ্জ স্যার এফ.এম. স্যাঙ্গাটে (তিনি ১৯৬৩ সনে আহমদী হয়েছিলেন এবং ১৯৬৫ সনে রাষ্ট্রপ্রধান পদে আসীন হয়েছিলেন)। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এর নিকট বরকত ও কল্যাণ লাভের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র বস্ত্র লাভ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। এভাবে সেই ভবিষ্যদ্বাণী 'বাদশাহ তোমার বস্ত্র থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে' পূর্ণতা লাভ করে।
প্র. তাহরীকে জাদীদের তৃতীয় দপ্তর কখন, কে শুরু করেন?
উ. ২২ এপ্রিল ১৯৬৬ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তৃতীয় দপ্তরের ঘোষণা দেন এবং বলেন, "এই দপ্তর ১৯৬৫ সন থেকে শুরু হয়েছে বলে গণনা করা হবে, যাতে করে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর মোবারক সময়কাল এ দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত হয়।"
প্র. ওয়াকফে জাদীদ দপ্তর আতফাল কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ. ১৭ অক্টোবর ১৯৬৬ সনে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) আহমদী শিশু-কিশোরদেরকে ৫০ হাজার টাকা জমা করার টার্গেট প্রদান করেন।
প্র. রাবওয়ার মসজিদুল আকসার ভিত্তিস্থাপন ও উদ্বোধন কে করেন এবং কখন?
উ. সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর এ মসজিদের ভিত্তি রাখেন এবং ৩১ মার্চ ১৯৭২ সনে এ মসজিদের উদ্বোধন করেন।
প্র. হুযূর (রাহে.) কখন ইউরোপ সফর করেন এবং কোন-কোন দেশে সফর করেন?
উ. ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই তারিখে হুযূর (রাহে.) রাবওয়া হতে ইউরোপের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ২৪ আগস্ট প্রত্যাবর্তন করেন। এ বরকতময় সফরে তিনি জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, ডেনমার্ক এবং ইংল্যান্ড সফর করেন।
প্র. এ সফরে তিনি কোন মসজিদের উদ্বোধন করেন?
উ. ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই তিনি ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে 'মসজিদ নুসরত জাহাঁ'-র উদ্বোধন করেন।
প্র. হুযূর (রাহে.) কবে ইউরোপের মাটিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ

করেন?

উ. হুযূর (রাহে.) লন্ডনের ওয়ান্ডস ওয়ার্থ টাউন হলে ১৯৬৭ সনের ২৮ জুলাই এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। এতে তিনি পাশ্চাত্য জাতিসমূহকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। হুযূর (রাহে.) বলেন, তারা যদি ইসলামের ছায়াতলে না আসে তাহলে তাদের এ তথাকথিত সভ্যতা অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। হুযূর (রাহে.)-এর এ ঐতিহাসিক ভাষণ A message of peace and word of warning. (একটি শান্তির বাণী ও এক হুঁশিয়ারি) নামক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর বিশেষ-বিশেষ তাহরীকগুলো কী কী?

উ. ১) গরীব মিসকীনদের খাবার দেয়া, ২) ফযলে উমর ফাউন্ডেশন, ৩) তা'লীমুল কুরআন, ৪) ওয়াকফে আরযী, ৫) সিলসিলা ইলমী তাকারীর (মজলিসে ইরফান), ৬) মজলিসে মুসীয়ান, ৭) ওয়াকফে জাদীদের দায়িত্ব শিশুদের স্কন্ধে অর্পণ করার আশা পোষণ, ৮) বিশ্ব মুসলিম ঐক্য, ৯) আহমদী জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যায় তসবীহ্, তাহ্মীদ, দুরূদ শরীফ, ইস্তিগফার ইত্যাদি পাঠ করা, ১০) আধ্যাত্মিক শ্লোগানসমূহ, ১১) সূরা বাকারার প্রথম ১৭ আয়াত মুখস্থ করা, ১২) নুসরত জাহাঁ রিজার্ভ ফান্ড, ১৩) আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা, ১) বিশ্বব্যাপী আহমদীদের কলমী বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা, ১৫) সর্বদা হাসিখুশী থাকা, ১৬) বেশি-বেশি সালামের প্রচলন করা, ১৭) প্রতি মাসের শেষ সোমবার বা বৃহস্পতিবার নফল রোযা রাখা, ১৮) এশার নামাযের পর হতে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে দু রাকা'ত নফল নামায পড়ে ইসলামের বিজয়ের জন্য দোয়া করা, ১৯) "হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসীর"- এ দোয়া অধিক সংখ্যায় পাঠ করা, ২০) দৈনিক কমপক্ষে সাত বার সূরা ফাতিহা পাঠ করা এবং এর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রভৃতি।

প্র. হুযূর (রাহে.)-এর উপর নাযিল হয়েছে এমন দু'টি ইলহাম লিখুন।

উ. بُشْرٰی لَکُمْ (বুশরা লাকুম), অর্থঃ তোমাদের জন্য সুসংবাদ।

میں تینوّ اِنّ دیوانگا کہ تو راج جاویگا

(ম্যায় তিন্নু ইন্না দেওয়াঙ্গা কে তুঁ রাজ জাবেগা)

অর্থঃ আমি তোমাকে এত দেব যে, তুমি পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে।

প্র. রাবওয়ার 'খিলাফত লাইব্রেরি' ভবনের ভিত্তিস্থাপন ও উদ্বোধন কে, কখন করেন?

উ. ১৮ জানুয়ারি ১৯৭০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ভিত্তি রাখেন এবং ৩ অক্টোবর ১৯৭১ সনে হুযূর (রাহে.) এর উদ্বোধন করেন ।

প্র. ১৯৭০ সনের আফ্রিকা সফরের সময় হুযূর (রাহে.) কোন-কোন দেশের রাষ্ট্র ও

সরকার প্রধানদের সাথে সাক্ষাৎ করেন?

উ. নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান জনাব ইয়াকুবু গোবান, ঘানার রাষ্ট্রপ্রধান, লাইবেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান টাব্ মিন, গাম্বিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান দাউদ আজওয়ারা এবং সিয়েরালিওনের প্রধানমন্ত্রীর সাথে।

প্র. নুসরত জাহাঁ পরিকল্পনা কী?

উ. ২৪ মে ১৯৭০ সনে ঐতিহাসিক পশ্চিম আফ্রিকা সফর শেষে লন্ডন প্রত্যাবর্তনের পর ঐশী ইঙ্গিতে হুযূর (রাহে.) আফ্রিকার আর্ত-মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে মসজিদ ফযল, লন্ডনে 'নুসরত জাহাঁ স্কিম'-এর ঘোষণা দেন এবং ১২ জুন রাবওয়াতে নুসরাত জাহাঁ রিজার্ভ ফান্ডের তাহরীক করেন। এ পরিকল্পনার অধীনে আফ্রিকায় স্কুল, কলেজ, হাসপালতাল, হেলথ সেন্টার, চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। আহমদী সদস্য-সদস্যাগণ শিক্ষক, ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন।

প্র. এমন একটি ইলহামের উল্লেখ করুন– যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে।

উ. ইলহামঃ يَادَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰـکَ خَلِيفَةً فِی الاَرْضِ

(ইয়া দাউদু ইন্না জা'আলনাকা খালীফাতান্ ফিল্ আরযি)

অর্থঃ হে দাউদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি।

প্র. খোদ্দামুল আহমদীয়াকে কোন খলীফা, কখন 'রুমালের মতো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী' বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন?

উ. কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমা চলাকালীন ৫ অক্টোবর ১৯৭২ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)।

প্র. হুযূর (রাহে.) কত সনে 'আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা'-এর ঘোষণা দেন?

উ. ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সনে জলসা সালানা চলাকালীন সময়ে হুযূর (রাহে.) শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা পেশ করেন এবং ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সনে দোয়াসহ আধ্যাত্মিক কর্মসূচী পালনের তাহরীক উপস্থাপন করেন।

প্র. ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে জামা'তে আহমদীয়ার যে প্রতিনিধিদল গিয়েছিলেন তাদের নাম বলুন।

উ. ১) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ২) হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ৩) মোহতরম শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব ৪) মোহতরম মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব ৫) মোহতরম মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব।

প্র. ১৯৭৪ সনে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে জামা'তে আহমদীয়ার প্রতিনিধিবর্গ কতদিন পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনার সুযোগ পেয়েছিল?

উ. দুইদিন পর্যন্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) 'মাহযারনামা' (স্মারক লিপি) পাঠ করেন এবং তারপর ১১ দিন পর্যন্ত প্রশ্ন-উত্তরের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

প্র. হুযূর (রাহে.) আহমদী যুবকদের জন্য কী নীতি-বাক্য নির্ধারণ করেছেন?

উ. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইলহাম "তেরে আযেযানা রাহেঁ উসকো পাসান্দ আয়িঁ।"

অর্থ: তোমার বিনয়ীভাব তিনি পছন্দ করেছেন।

প্র. ১৯৭৪ সনে জামা'তে আহমদীয়াকে সংখ্যালঘু অমুসলিম সম্প্রদায় ঘোষণাকারী পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের সংসদীয় নেতা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে কবে, কোথায় ফাঁসি দেয়া হয়?

উ. ১৪ এপ্রিল ১৯৭৯ সনে কেন্দ্রীয় কারাগার, রাওয়ালপিন্ডি, পাকিস্তানে।

প্র. ঐতিহাসিক "কাসরে সলীব কনফারেন্স" (ক্রুশ ধ্বংস সম্মেলন) কবে, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

উ. ২, ৩ ও ৪ জুন ১৯৭৯ সনে লন্ডনে। এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) অংশগ্রহণ করেন এবং ৪ঠা জুন সমাপনী ভাষণ প্রদান করেন।

প্র. 'আতফালুল আহমদীয়া'-কে "বড় আতফাল" ও "ছোট আতফাল" হিসেবে কত সালে পৃথক করা হয়?

উ. ১৯৮০ সনে। ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সের বালকেরা বড় আতফাল হিসেবে পরিগণিত হবে এবং ৭ থেকে ১২ বছরের বালকেরা ছোট আতফাল রূপে বিবেচিত হবে।

প্র. ১৯৮০ সনে কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা কোন বিশেষ স্বাতন্ত্রের অধিকারী ছিল?

উ. এই ইজতেমা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ হিজরি শতাব্দীর মিলনস্থলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইজতেমার তিনদিনই হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ঈমান উদ্দীপক এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্র. স্পেনের "মসজিদে বাশারত" সম্পর্কে কি জানেন?

উ. এটি স্পেনে প্রায় ৭০০ বছর পরে নির্মিত প্রথম মসজিদ। এ মসজিদ নির্মাণের সৌভাগ্য জামা'তে আহমদীয়া লাভ করেছিল, আলহামদুলিল্লাহ। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ৯ অক্টোবর ১৯৮০ সনে এর ভিত্তি রাখেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সনে এ মসজিদের উদ্বোধন করেন।

প্র. হুযূর (রাহে.) এর কয়েকটি পুস্তকের নাম বলুন?

উ. কুরআনী আনওয়ার (কুরআনের জ্যোতি), তা'মিরে বায়তুল্লাহ্ কে তেইস আযিমুশ্শান মাকাসেদ (কাবাগৃহ নির্মাণের তেইশটি মহান উদ্দেশ্য), এক সাচ্চে অওর হাকিকী খাদেম কে বারাহ আওসাফ, (একজন সত্যিকার ও প্রকৃত সেবকের বারটি বৈশিষ্ট্য), হামারে আকায়েদ (আমাদের বিশ্বাস), আল মাসাবিহ, জলসা সালানা কি

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

দু'আয়েঁ (বার্ষিক সম্মেলনের দোয়াসমূহ), আমন কা পয়গাম অওর এক হরফে ইনতেবাহ, (একটি শান্তির বাণী ও এক হুঁশিয়ারি)।

প্র. জামা'তে আহমদীয়া সর্বপ্রথম কত সনে আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান শুরু করে?

উ. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ২৮ অক্টোবর ১৯৭৯ সালে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা দেন এবং সে অনুযায়ী ১৩ জুন ১৯৮০ সনে রাবওয়া, পাকিস্তানে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সর্বপ্রথম সনদপত্র ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর স্ত্রী হযরত সৈয়দা মনসুরা বেগম সাহেবা কবে মৃত্যুবরণ করেন?

উ. ৩ ডিসেম্বর ১৯৮১ সনে।

প্র. হুযূর (রাহে.) কখন, কার সাথে দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন?

উ. ১৯৮২ সনের এপ্রিল মাসে হযরত সৈয়দা তাহেরা সিদ্দিকা সাহেবার সাথে।

প্র. হুযূর (রাহে.)-এর বর্হিদেশে তরবিয়তী ও ইসলাম প্রচারমূলক সফরসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

• ১৯৬৭ [০৬ জুলাই-২৪ আগস্ট]: ইউরোপের ৫টি দেশ সফর এবং ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে মসজিদ নুসরত জাহাঁ-এর উদ্বোধন।

• ১৯৭০ [০৪ এপ্রিল-০৮ জুন]: হুযূর (রাহে.) পশ্চিম আফ্রিকার ৬টি দেশ নাইজেরিয়া, ঘানা, আইভরি কোস্ট, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া এবং সিয়েরালিওন সফর এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর করেন।

• ১৯৭৩ [১৩ জুলাই-২৬ সেপ্টেম্বর]: ইউরোপের ৬টি দেশ জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন ও ইংল্যান্ড সফর।

• ১৯৭৫ [০৫ আগস্ট-২৯ অক্টোবর]: ইউরোপের ৩টি দেশ ইংল্যান্ড, সুইডেন ও নরওয়ে সফর। সুইডেনের গোটেনবার্গে 'মসজিদ নাসের'-এর ভিত্তি স্থাপন।

• ১৯৭৬ [২০ জুলাই-২০অক্টোবর]: আমেরিকা ও কানাডায় তরবিয়তী ও তবলীগি সফর। ইউরোপের ৭টি দেশে সফর এবং সুইডেনের গোটেনবার্গে 'মসজিদ নাসের'-এর উদ্বোধন।

• ১৯৭৮ [০৮ মে-১১ অক্টোবর]: আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'কাসরে সলীব (ক্রুশ ধ্বংস) কনফারেন্সে' যোগদান উপলক্ষে ইংল্যান্ড গমন। ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফর।

• ১৯৮০ [২৬ জুন-২৬ অক্টোবর]: পাশ্চাত্য দেশসমূহে তরবিয়তী ও তবলীগি সফর। ঐতিহাসিক সফরে ইউরোপের ৯টি দেশ পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, হল্যান্ড ও স্পেন; আফ্রিকার নাইজেরিয়া, ঘানাসহ ১৩ টি রাষ্ট্র এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণ করেন। এ সফরকালে স্পেনে

প্রায় ৭০০ বছর পর পুনরায় 'মসজিদে বাশারত'-এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়।
প্র. হুযূর (রাহে.) মেধাশক্তি বৃদ্ধির জন্যে কী ব্যবহার করতে বলেছেন?
উ. সয়ালেসেথিন (Soy Lecithin) ব্যবহার করতে বলেছেন।
প্র. হুযূর (রাহে.) কবে, কখন ইন্তেকাল করেন?
উ. ১৯৮২ সনের ৮-৯ জুনের মধ্যবর্তী রাত পৌনে একটার সময় বায়তুল ফযল, ইসলামাবাদ, পাকিস্তানে হুযূর (রাহে.) ইন্তেকাল করেন।

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর পিতা-মাতার নাম বলুন।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)

উ. হযরত মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল, মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম: হযরত মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এবং মাতার নাম: হযরত সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দিকা সাহেবা।
প্র. হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর শিক্ষাজীবন সর্ম্পকে কী জানেন?
উ. • ১৯৪৪ সনে তিনি তালিমুল ইসলাম হাই স্কুল, কাদিয়ান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর গভর্নমেন্ট কলেজ, লাহোর থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং প্রাইভেটভাবে বি.এ. পরীক্ষায় পাশ করেন।
• ৭ ডিসেম্বর ১৯৪৯ সনে তিনি জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে ভর্তি হন এবং ১৯৫৩ সনে শাহেদ ডিগ্রি নিয়ে জামেয়া আহমদীয়া থেকে পাশ করেন।
• ১৯৫৫-১৯৫৭ সন পর্যন্ত লন্ডনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন।
প্র. হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর বিবাহ কার সাথে, কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?
উ. ১৯৫৭ সনের ৫ ডিসেম্বর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত সৈয়দা আসেফা
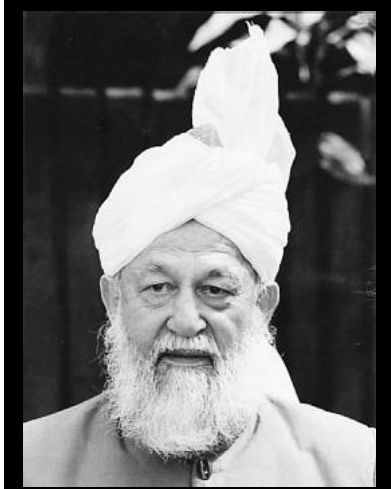
বেগম সাহেবা, পিতা : সাহেবযাদা মির্যা রশিদ আহমদ সাহেব-এর সাথে তাঁর বিয়ের এলান করেন এবং ১১ ডিসেম্বর ১৯৫৭ সনে তাঁর ওলীমা অনুষ্ঠিত হয়।
প্র. খিলাফতে আসীন হবার পূর্বে তিনি জামা'তী কি কি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন?
উ. • তিনি দীর্ঘদিন ওয়াকফে জাদীদের নাযেম ইরশাদ ছিলেন।
• বিশ্ব সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (১৯৬৬-১৯৬৯ ইং)।
• বিশ্ব সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্ (১৯৭৯- খিলাফতে আসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত)।
• এছাড়া তিনি তৃতীয় খলীফার আমলে দীর্ঘদিন নায়েব অফিসার জলসা সালানা ছিলেন।
প্র. হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) সর্বপ্রথম কখন, কোন বিষয়ে জলসা সালানায় বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন? খিলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে জলসায় প্রদত্ত তাঁর কয়েকটি বক্তৃতার নাম বলুন?
উ. তিনি ১৯৬০ সনে কেন্দ্রীয় জলসা সালানা, রাবওয়াতে "ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব" বিষয়ে সর্বপ্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। খিলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বক্তৃতা হচ্ছে - ১) মানব সৃষ্টি এবং আল্লাহ্ ত'লার অস্তিত্ব [১৯৬২], ২) আহমদীয়াত বিশ্বকে কী দিয়েছে? [১৯৬৪], ৩) হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কুরআন সেবা [১৯৭০], ৪) যুদ্ধে আঁ-হযরত (সা.)-এর উত্তম আচরণ [১৯৭৯-১৯৮১]।
প্র. হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) কবে, কোথায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন?
উ. ১০ জুন ১৯৮২ সনের রোজ বৃহস্পতিবার যোহরের নামাযের পর রাবওয়ার মসজিদে মোবারকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) কর্তৃক নির্ধারিত 'মজলিসে ইন্তেখাবে খিলাফত' (খিলাফতের নির্বাচক-মন্ডলী)-এর সভা সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ঐশী আকাঙ্ক্ষানুযায়ী হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ্ রাবে নির্বাচিত হন।
প্র. হুযূর রাবে (রাহে.) জামা'তের নামে সর্বপ্রথম কখন লিখিত বাণী প্রদান করেন এবং কী উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন?
উ. ১৩ জুন ১৯৮২ সনে প্রথম জামা'তের নামে লিখিত বাণী প্রদান করেছিলেন যেখানে তিনি ফিলিস্তিনের নির্যাতিত-নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য দোয়ার তাহরীক করেছিলেন।
প্র. হুযূর রাবে (রাহে.) খিলাফতে আসীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম কখন বিদেশ সফরে যান?
উ. ১৯৮২ সালের ২৮ জুলাই খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রথমবারের মত ইউরোপ যাত্রা করেন। এ সফরের সময় ১০ সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি স্পেনের কর্ডোভার নিকটে পেড্রোয়াবাদে 'মসজিদে বাশারত'-এর শুভ উদ্বোধন করেন। এছাড়া এ সফরে তিনি নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, লুক্সেমবার্গ, হল্যান্ড, ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে গমন করেন।

প্র. দুঃস্থ ও এতীমদের জন্য হুযূর রাবে (রাহে.) কোন স্কীমের ঘোষণা দেন?

উ. ১৯৮২ সনের ২৯ অক্টোবর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) 'বুয়ূতুল হামদ' স্কীমের তাহরীক করেন। এ স্কীমের অধীনে দুঃস্থ ও এতীমদের জন্য বাড়ি-ঘর নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এটি চতুর্থ খিলাফতের প্রথম আর্থিক তাহরীক ছিল।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কখন দপ্তর আউয়ালের (প্রথম পর্যায়ের, ১৯34-১৯৪৪) মুজাহেদীনদের কুরবানীকে চির জাগরূক রাখার জন্যে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি তাগিদপূর্ণ নসীহত করেন ?

উ. ১৯৮২ সনের ৫ নভেম্বর জুমু'আর খুতবায়।

প্র. কত সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাহ্রীকে জাদীদের তৃতীয় দপ্তরের (১৯৬৬-১৯৮৪) দায়িত্ব লাজনা ইমাইল্লাহ্র ওপরে ন্যস্ত করেন?

উ. ১৯৮২ সনের ৫ নভেম্বর জুমু'আর খুতবায়।

প্র. চতুর্থ খিলাফতের প্রথম সালানা জলসা কখন, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৯৮২ সনের ২৬-২৮ ডিসেম্বর চতুর্থ খিলাফতের অধীনে প্রথম সালানা জলসা রাবওয়া, পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় ২ লক্ষ ২০ হাজার লোক উপস্থিত হয়।

প্র. সারা বিশ্বের আহমদীদের দাঈ ইলাল্লাহতে পরিণত হবার জন্য হুযূর রাবে (রাহে.) কখন জোর তাগিদ দেন?

উ. ২৮ জানুয়ারি ১৯৮৩ সনে মসজিদুল আকসা, রাবওয়ায় খুতবার মাধ্যমে হুযূর রাবে (রাহে.) সারা বিশ্বের আহমদীদেরকে 'দা-ঈ ইলাল্লাহ্'তে পরিণত হওয়ার জোর তাগিদ দেন। এটা ছিল একটি ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী ঘোষণা। এর ফলশ্রুতিতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে তবলীগের ক্ষেত্রে এক নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়।

প্র. হুযূর রাবে (রাহে.) খেদমতে খালক এর ব্যাপারে কবে জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন?

উ. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৩ সনের ১২ জুলাই ঈদের খুতবায় খেদমতে খালক (সৃষ্টির সেবা) সম্পর্কে একটি তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা উপস্থাপন করেন। হুযূর (রাহে.) ঈদের আনন্দে নিজের গরীব ভাইদেরকে অংশীদার করার তাগিদ দেন এবং বলেন, ঈদের খুশি সত্যিকার অর্থে এটা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। বন্ধুগণ এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন।

প্র. আমেরিকায় জামা'তে আহমদীয়ার প্রথম শহীদের নাম এবং শাহাদাতের তারিখ বলুন?

উ. ৮ আগস্ট ১৯৮৩ সালে ডেট্রয়েট, আমেরিকাতে মোকাররম ডা. মোযাফ্ফর আহমদ সাহেবকে গুলি করে শহীদ করা হয়।

প্র. পাকিস্তানে কত তারিখে আহমদীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ? এর ফলশ্রুতিতে হুযূর রাবে (রাহে.) কবে ইংল্যান্ডে হিজরত করেন?

উ. ১৯৮৪ সনের ২৬ এপ্রিল পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক জামা'তে আহমদীয়ার উপরে বাধ্যবাধকতা আরোপ করার নিমিত্তে 'কাদিয়ানীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা অর্ডিন্যান্স' জারী করে। এ অন্যায় আইন জারীর কারণে যুগ-খলীফার পক্ষে সেই দেশ থেকে নিজ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয় বলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ২৯ এপ্রিল ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন।

প্র. হিজরতের পূর্বে রাবওয়াতে হুযূর (রাহে.) সর্বশেষ বক্তৃতা কখন প্রদান করেন?

উ. ২৮ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে এশার নামাযের পর মসজিদে মোবারক, রাবওয়া, পাকিস্তানে।

প্র. হুযূর রাবে (রাহে.) পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্র সম্পর্কিত ঐতিহাসিক ধারাবাহিক খুতবা কখন থেকে প্রদান করা শুরু করেন?

উ. ২০ জুলাই ১৯৮৪ থেকে। এই ধারাবাহিক খুতবা প্রদান ১৭ মে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে 'যাহাকাল বাতিল' নামে পুস্তক আকারে এটি প্রকাশিত হয়।

প্র. আন্তর্জাতিক মানের সুইমিংপুল রাবওয়াতে কখন নির্মাণ করা হয়?

উ. ৩১ জুলাই ১৯৮৪ সালে ভিত্তি রাখা হয় এবং ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সালে উদ্বোধন করা হয়।

প্র. ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, ইংল্যান্ড এবং নাসেরবাগ, জার্মানী সম্পর্কে কী জানেন?

উ. ১৮ মে ১৯৮৪ সনে হুযূর রাবে (রাহে.) ইংল্যান্ড ও জার্মানীতে দু'টি বড় মিশন হাউস নির্মাণ করার তাহরীক করেন। যার ফলশ্রুতিতে জার্মানীতে নাসেরবাগ এবং ইংল্যান্ডের টিলফোর্ডে ইসলামাবাদ নামে দু'টি মিশন হাউস নির্মাণ করা হয়।

প্র. তাহরীকে জাদীদ 'চতুর্থ দপ্তর'-এর যাত্রা কে, কবে থেকে শুরু করেন?

উ. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ২৫ অক্টোবর ১৯৮৫ সন থেকে।

প্র. বৃটেনে কখন যুগ খলীফার উপস্থিতিতে আহমদীয়া জামা'তের ঐতিহাসিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৯৮৫ সনের ৫-৭ এপ্রিল বৃটেনের টিলফোর্ডে যুক্তরাজ্য আহমদীয়া জামা'তের ঐতিহাসিক সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫টি মহাদেশের ৪৮টি দেশ থেকে হাজার-হাজার আহমদী যোগদান করেন।

প্র. হুযূর রাবে (রাহে.) কবে ওয়াকফে জাদীদকে সারা বিশ্বে বিস্তৃতি দান করেন?

উ. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে 'ওয়াকফে জাদীদ'-কে সারা বিশ্বে বিস্তৃতি দানের ঘোষণা দেন। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ওয়াকফে জাদীদের প্রবর্তন করেছিলেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। প্রাথমিক অবস্থায় এ স্কীম পাক-ভারত-বাংলাদেশের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। (দ্বীনি মা'লুমাত, ম.খো.আ. পাকিস্তান, পৃ. ৫৭)।

প্র. জামা'তের শাহাদত বরণকারীদের স্মৃতিকে চিরজাগরূক রাখার জন্য হুযূর রাবে

(রাহে.) কোন ফান্ডের প্রবর্তন করেন?
উ. ১৯৮৬ সনের ৪ঠা মার্চ হুযূর রাবে (রাহে.) জামা'তের শাহাদত বরণকারীদের স্মরণে 'সৈয়দনা বেলাল ফান্ড'-এর প্রবর্তন করেন।
প্র. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা আহমদীয়া বিরোধী অর্ডিন্যান্সকে মানবাধিকার লঙ্ঘন বলে ঘোষণা করেছে?
উ. জাতিসংঘ, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৬ সনে।
প্র. প্রথম আহমদী মহিলা শহীদের নাম কী?
উ. মোহতরমা রোখসানা সাহেবা। তাঁকে ৯ জুন ১৯৮৬ সনে পাকিস্তানে শহীদ করা হয়।
প্র. ধর্মের সেবার জন্য হুযূর রাবে (রাহে.) কখন ঐতিহাসিক ওয়াকফে নও তাহরীকের ঘোষণা দেন?
উ. ১৯৮৭ সনের ৩ এপ্রিল হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জুমু'আর খুতবায় জামা'তের বন্ধুগণকে ওয়াকফে নও-এর তাহরীক করে বলেন, নিজেদের ভাবী সন্তানদেরকে এখন থেকেই ধর্মের সেবার জন্যে উৎসর্গ করা উচিত। প্রথমে এ তাহরীক ছিল পাঁচ হাজার সন্তানের জন্য। কিন্তু এখন ৪৮ হাজারের অধিক ছেলে-মেয়ে এ তাহরীকে অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এ তাহরীক এখনও জারী আছে।
প্র. সারা বিশ্বে বন্দী 'আসীরানে রাহে মাওলা'-দের জন্য হুযূর রাবে (রাহে.) কখন দোয়ার তাহরীক করেন?
উ. ১৯৮৭ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) 'আসীরানে রাহে মাওলা' (আল্লাহর পথে বন্দী)-দের মুক্তির জন্য দোয়ার তাহরীক করেন।
প্র. রাবওয়াতে এতীমদের জন্য নির্মিত ভবনের নাম কী? কত সালে এর ভিত্তি রাখা হয়?
উ. ১৯৮৭ সালের ০৫ ডিসেম্বর 'দারুল ইয়াতামা' (এতীমদের ভবন)-এর ভিত্তি রাখা হয়। এর নামা রাখা হয় 'দারুল ইকরাম'।
প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কবে সারা বিশ্বে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন?
উ. ১৯৮৮ সনের ১০ জুন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জুমু'আর খুতবায় বিশ্বের সকল আহমদী জামা'তের বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি 'মুবাহালার' চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। এ আহ্বানের পরপরই ১৭ আগস্ট আল্লাহ্ তা'লা একটি অসাধারণ নিদর্শন দেখান। আহমদীয়া বিরোধী অর্ডিন্যান্স জারীকারী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক অলৌকিকভাবে সর্বাধুনিক বিমানে ১১ জন জেনারেলসহ বিমান বিস্ফোরিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। হুযূর (রাহে.) পুনরায় জানুয়ারি ১৯৯৭ সনে দ্বিতীয়বার এ মুবাহ-ালার চ্যালেঞ্জ দেন।
প্র. শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী কখন উদযাপন করা হয়?
উ. জামা'তে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা লাভের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সারা বিশ্বের সকল

আহমদী কর্তৃক আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়স্বরূপ শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ২৩ মার্চ ১৯৮৯ সনে উদযাপন করা হয়। বাংলাদেশ জামা'তও মহাসমারোহে এ উৎসব পালন করে। (অবশ্য পাকিস্তান সরকার রাবওয়া ও দেশের অন্যান্য শহরে জুবিলী উপলক্ষে যে কোন প্রকারের কর্মসূচীর ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এমনকি সে দেশে আলোকসজ্জা, মিষ্টি বিতরণ পর্যন্ত করতে দেয়া হয়নি)।
প্র. আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনালগ্নে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে কী মোবারক ইলহাম লাভ করেন?
উ. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমতুল্লাহ।
প্র. শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী উপলক্ষে কোন-কোন দেশ স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে?
উ. সিয়েরালিওন ও গায়ানা।
প্র. হুযূর রাবে (রাহে.) মানুষের কয়টি মৌলিক চরিত্রমূলক গুণের কথা বলেছেন? সেগুলো কী কী?
উ. পাঁচটি। সেগুলো হল- ১) সত্য বলার অভ্যাস, ২) নম্র ভাষণ, পাক ও অনিন্দ্য কথন এবং পরস্পর সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন, ৩) ধৈর্য ও সহনশীলতা, ৪) অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীলতা, ৫) দৃঢ়সংকল্প ও সাহসিকতা।
প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জুমু'আর খুতবা সরাসরি সম্প্রচারের কার্যক্রম কখন থেকে শুরু হয়?
উ. ২৪ মার্চ ১৯৮৯ সনে প্রথমবারের মতো টেলিফোন সিস্টেমের মাধ্যমে হুযূর রাবে (রাহে.)-এর জুমু'আর খুতবা সরাসরি শুনা গিয়েছিল।
প্র. ১৯৯১ সনে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যে সকল তাহরীক করেন সে সর্ম্পকে বলুন?
উ. • **জানুয়ারি :** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এ মাসে নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ তাহরীকগুলো করেন:
• ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ ও মুয়াল্লিমদের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ।
• বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তি এবং মুসলমানদের দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হওয়ার জন্যে দোয়ার তাহরীক।
• আফ্রিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের জন্যে সারা বিশ্বের আহমদীদের কাছে সাহায্যের আবেদন।
• উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হওয়ার জন্য আহমদীদের সদকা দেয়ার তাহরীক।
• **মার্চ :** হুযূর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এ মাসে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহরীকগুলো করেন:

• সফলতা লাভ করার জন্যে বিধর্মী রাজনীতি পরিত্যাগ করে ধর্মীয় রাজনীতির নীতিসমূহের আত্মীকরণের তাহরীক।
• অন্য দেশের প্রতি নির্ভরশীলতা, জ্ঞান ও কৌশলাদিতে উন্নতি করা আর উদ্দেশ্যকে স্বচ্ছ করে মানবতাকে সঞ্জীবিত করার তাহরীক।
• লাইবেরিয়ার মুহাজিরদের সাহায্যার্থে তাহরীক।
• মসনূন দোয়া পড়ার তাহরীক।
• **মে :** হুযূর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) এ মাসে নিম্নোক্ত তাহরীকগুলো করেন:
• জাপানে প্রথম আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণে যারা আর্থিক সাহায্য করেন তাদের জন্য দোয়ার তাহরীক।
• ওয়াকফে নও শিশুদের তরবিয়ত দেয়ার ব্যাপারে বিশেষ পদক্ষেপসমূহ গ্রহণের তাহরিক–যেন তারা অন্যদের চাইতে আলাদা বলে দৃশ্যমান হয়।
• সন্তান-সন্ততিকে সর্বদা খুতবা শুনার সাথে সম্পৃক্ত করার তাহরীক।
• আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে সংরক্ষণের তাহরীক।
• রাশিয়ায় তবলীগের কাজে বেশি-বেশি ওয়াকফে আরযী করার তাহরীক।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) সর্বপ্রথম কখন কাদিয়ান আগমন করেন?

উ. ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালে আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী জলসা সালানায়। এতে ৪৪ বছর পরে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যোগদান করেন। উপমহাদেশ বিভাগের পর কোন যুগ-খলীফার এটাই ছিল প্রথম কাদিয়ান গমন। উল্লেখ্য, প্রথম জলসা সালানা কাদিয়ানে ১৮৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

প্র. হুযূর রাবে (রাহে.) কবে কাদিয়ানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়-বাণিজ্য করার তাহরীক করেন?

উ. ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে হুযূর রাবে (রাহে.) সারা বিশ্বের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও সচ্ছল ব্যক্তিদেরকে কাদিয়ানে শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করার জন্য তাহরীক করেন।

প্র. কত সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জুমু'আর খুতবা ইউরোপে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখা ও শুনা গিয়েছিল?

উ. ৩১ জানুয়ারি ১৯৯২ সনে।

প্র. কত সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জুম'আর খুতবা ৪টি মহাদেশেই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রচার আরম্ভ হয়?

উ. ২১ আগস্ট ১৯৯২ সনে । এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী ভবিষ্যদ্বাণী 'আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পোঁছাব' পূর্ণতা লাভ করে যা জগতের অদ্বিতীয় এক ঘটনা বলে স্বীকৃত।

প্র. হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার (১৮৯৪-১৯৯৩)-এর মহান উল্লেখযোগ্য কর্ম কী?

উ. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর মিনানুর রহমান গ্রন্থে প্রমাণ করেছেন এবং বলেছেন, আরবি সকল ভাষার জননী। আর এ বুযুর্গ হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব প্রায় ৫০টি ভাষার ওপর গবেষণা করে এ বিষয়টিই প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে আরবিই সকল ভাষার জননী এবং মূল উৎস।

প্র. আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল কবে থেকে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়?

উ. ৩০ জুলাই ১৯৯৩ সনে যুক্তরাজ্যের জলসা সালানার সময় সাপ্তাহিক আল ফযল ইন্টান্যাশনাল-এর পরীক্ষামূলক কপি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রধান সম্পাদকরূপে জনাব রশিদ আহমদ চৌধুরীকে প্রথম দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এটি ৭ জানুয়ারি ১৯৯৭ সন থেকে নিয়মিতভাবে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হচ্ছে।

প্র. কখন প্রথম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়?

উ. ৩১ জুলাই ১৯৯৩ সনে যুক্তরাজ্যের ২৮'তম সালানা জলসার সময় ৮৪টি দেশের, ১১৫ টি জাতির ২ লক্ষ ৪ হাজার ৩০৮ জন লোক ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে হযরত খলীফ-াতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কাছে বয়াতের মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তর অন্তর্ভুক্ত হন এবং সমগ্র জামা'ত-এর মাধ্যমে পুনরায় বয়াত নবায়ন করে। বিশ্বের ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা। এদিন বয়াত নেবার সময় হুযূর (রাহে.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোট পরিহিত ছিলেন।

প্র. এমটিএ কবে থেকে ১২ ঘন্টার সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে?

উ. ১৯৯৪ সনের ০৭ জানুয়ারি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এমটিএ–তথা 'আহমদীয়া মুসলিম টেলিভিশন'-এর নিয়মিত দৈনিক ১২ ঘন্টা সম্প্রচার উদ্বোধন করেন।

প্র. চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের শতবার্ষিকী কত সালে পালিত হয়?

উ. ১৯৯৪ সনে।

প্র. ১৯৯৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কোন ইলহামী দোয়া অধিক পরিমাণে পাঠ করার জন্য তাহরীক করেন?

উ. اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَّسَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাসহিকা)

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে (আহমদীয়া জামা'তের শত্রুদের) সম্পূর্ণভাবে টুকরো-টুকরো কর এবং তাদের সমূলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও।

প্র. দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান সর্ম্পকে বলুন?

উ. ১৯৯৪ সনের ৩১ জুলাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, যুক্তরাজ্যের ২৯তম সালানা জলসা উপলক্ষে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৯৩টি দেশের ১৫৫

জাতির ১২০টি ভাষার ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ২শত ৬ জন ব্যক্তি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর পবিত্র হাতে এমটিএ -এর মাধ্যমে বয়াত হয়ে আহমদীয়া জামা'তে দাখিল হন।

১৯৯৫ সনের জুলাই মাসে জামা'তে আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ৩০তম সালানা জলসা 'ইসলামাবাদ'-এ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে এমটিএ -এর মাধ্যমে তৃতীয় আন্তর্জাতিক বয়াতে ৯৬টি দেশের ১৬২টি জাতির ১২০ ভাষার ৮,৪৫,২৯৪ জন ব্যক্তি হযরত খলীফ-াতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কাছে বয়াত হয়ে সিলসিলা জামা'তে আহমদীয়ায় দাখিল হন।

প্র. কবে থেকে এমটিএ ২৪ ঘন্টা সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে?

উ. ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা এপ্রিল এমটিএ -এর ২৪ ঘন্টা প্রোগ্রাম শুরু হয়। এ উপলক্ষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) মসজিদ ফযল, লন্ডনে এক ঈমানবর্ধক ভাষণ দেন।

প্র. 'ইসলামী উসূল কি ফিলাসফী' পুস্তকের একশ বছর পূর্তি কবে অনুষ্ঠিত হয় ?

উ. ১৯৯৬ সনে 'ইসলামী উসূল কি ফিলাসফী'(ইসলামী নীতি-দর্শন) পুস্তকের ১০০ বছর পূর্তি উদযাপিত হয়।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কয়েকটি ইংরেজি পুস্তকের নাম বলুন?

উ. ১. Islam's respons to the contemporary issues.

২. Christianty- A Journey from Facts to Fiction.

৩. Revelation, Rationality, Knowledge and Truth.

৪. Murder in the Name of Allah.

প্র. MTA International কখন থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যম সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে?

উ. ৫ জুলাই ১৯৯৬ সনে পাকিস্তান সময় অনুযায়ী ভোর চারটায়।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বংশে শাহাদাতের মর্যাদা লাভকারী সৌভাগ্যবান শহীদের নাম বলুন।

উ. মোকাররম সাহেবযাদা মির্যা গোলাম কাদের আহমদ সাহেব, পিতা: মোহতরম সাহেবযাদা মির্যা মজিদ আহমদ সাহেব। তিনি হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশির আহমদ এম.এ. (রা.)-এর পৌত্র এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্র ছিলেন। ১৪ এপ্রিল ১৯৯৯ সনে তাঁকে অপহরণ করার পর শহীদ করা হয়।

প্র. হুযূর রাবে (রাহে.) Friday the 10th উপলক্ষে জামা'তকে কী বিশেষ বাণী প্রদান করেন?

উ. ১০ অক্টোবর ১৯৯৭ সনে হুযূর রাবে (রাহে.) Friday the 10th উপলক্ষে জামা'তকে নামায পড়ার বিশেষ বাণী প্রদান করেন।

প্র. ১৯৯৮ সনে চতুর্থ খিলাফতকালীন সময়ে উল্লেখযোগ্য তাহরীক ও কার্যক্রম কী ছিল?

• ২রা জানুয়ারি: হুযূর রাবে (রাহে.) ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেন এবং সেই সাথে হুযূর প্রত্যেক জামা'তের সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদকে 'নও মোবাঈন' সদস্যদেরকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

• ২৮ মার্চ: লন্ডনের মসজিদ 'বায়তুল ফুতুহ্'-এর প্রস্তাবিত স্থানে হুযূর রাবে (রাহে.) ঈদুল আযহার নামায পড়ান। এতে ৮,৫০০ জন আহমদী যোগদান করেন।

• ০৫ জুন: হুযূর রাবে (রাহে.) কর্তৃক এলুমিনিয়ামের বাসন-কোসন ব্যবহার না করে স্টিলের বাসন-কোসন ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করেন।

• এ বছর হুযূর রাবে (রাহে.)-এর বিখ্যাত পুস্তক Revelation, Rationality, Knowledge and Truth প্রকাশিত হয়।

• ২রা আগস্ট: ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক বয়াতে ৯৩ টি দেশের ২২৩ জাতির ৫০ লক্ষ ৪ হাজার ৬ জন লোক অংশগ্রহণ করেন।

• ০৭ আগস্ট: হুযূর রাবে (রাহে.)-এর পক্ষ থেকে সকল দেশে, জামা'তে, বিভাগে এবং বাড়িতে "লাল খাতা" রাখার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পুস্তকের নাম বলুন।

উ. ১) যওকে ইবাদাত অওর আদাবে দোয়া (ইবাদতের স্বাদ এবং দোয়ার পদ্ধতি), ২) যাহাকাল বাতিল (মিথ্যার বিলুপ্তি), ৩) সীরাত ও সাওয়ানেহ ফযলে ওমর, ১ম ও ২য় খন্ড, ৪) মাযহাব কে নাম পার খুন (ধর্মের নামে রক্তপাত), ৫) ভিসালে ইবনে মরিয়ম (মরিয়মপুত্রের মৃত্যু), ৬) নিযামে জাহানে নও (নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাপনা)।

প্র. এমটিএ -এর কোন কোন প্রোগ্রামে হুযূর রাবে (রাহে.) বিশেষভাবে সশরীরে উপস্থিত থাকতেন?

উ. দরসুল কুরআন, মুলাকাত, লিকা মা'আল আরব, হোমিওপ্যাথি ক্লাস, চিলড্রেন ক্লাস, উর্দূ ক্লাস।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কখন, কোথায় সালাতুল কুসুফ (সূর্যগ্রহণের নামায) আদায় করেন?

উ. ১১ আগস্ট ১৯৯৯ সনে লন্ডনে সূর্যগ্রহণ হলে হুযূর রাবে (রাহে.) মসজিদ ফযল, লন্ডনে সালাতুল কুসুফ এর নামায আদায় করেন।

প্র. হুযূর রাবে (রাহে.) প্রথমবারের মতো কখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন।

উ. সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ সনে। হুযূর রাবে (রাহে.) অসুস্থতার কারণে দু'সপ্তাহের বিশ্রামের পরে ১০ সেপ্টেম্বর Friday the 10th-এর খুতবা দেন। হুযূর রাবে (রাহে.)-এর অসাধারণ স্বাস্থ্য লাভ খোদা তা'লার একটি বিশেষ নিদর্শনের রূপ ধারণ করে।

প্র. কত সনে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ -এর ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়?

উ. ১৯৯৯ সনের ১৯ অক্টোবর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) লন্ডনে 'বায়তুল ফুতুহ' মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন। এটি ইংল্যান্ডের মর্ডেনে অবস্থিত।
প্র. ২০০০ খিস্টাব্দে জামা'তের উল্লেখযোগ্য কী কী কাজ ছিল?
• ৪ ঠা মার্চ: খুতবা ইলহামিয়ার শতবার্ষিকী উদযাপন।
• ১৯ জুন-১১ জুলাই: হুযূর রাবে (রাহে.)-এর ঐতিহাসিক ইন্দোনেশিয়া সফর।
• ৩০ জুলাই: ৮ম আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৭০টি দেশের ৪, ১৩, ০৮, ৩৭৬ জন লোক বয়াত করেন। এবারকার জলসায় ৭৭টি দেশ থেকে উপস্থিত ছিল ২৩,৪০৭ জন।
• ১১-১২ আগষ্ট: ড. আলেকজান্ডার ডুই-এর পতনের শতবার্ষিকী পালিত হয়। উল্লেখ্য, এ তথাকথিত এলীয় নবী মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-কর্তৃক প্রদত্ত মুবাহালায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
• ২৯ ডিসেম্বর: হুযূর রাবে (রাহে.) এ শতাব্দী ও সহস্রাব্দের শেষ জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন।
• ৩১ ডিসেম্বর: নতুন শতাব্দীতে কেউ যেন বে-নামাযী হয়ে প্রবেশ না করে সেজন্য জামা'তের সদস্যদের শতকরা ১০০ ভাগ নামাযী হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত। দিবাগত রাত্রে বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ ও দোয়ার মাধ্যমে নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দকে স্বাগত জানানো হয়।
প্র. জামা'তে আহমদীয়ার অফিসিয়াল ওয়েবসাইট www.alislam.org কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ. জানুয়ারি ২০০১ সনে।
প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কখন থেকে আল্লাহ্ তা'লার সিফত বা গুণাবলীর ওপরে ধারাবাহিক খুতবা প্রদান শুরু করেন?
উ. ২০০১ সনের এপ্রিল মাস থেকে।
প্র. ২০০১ সনের আন্তর্জাতিক সালানা জলসা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উ. ২৪-২৬ আগস্ট জার্মানীর মেইনহেমে আন্তর্জাতিক সালানা জলসা ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, গরুর খুরা রোগের কারণে বৃটেন সরকার প্রতিবারের ন্যায় লন্ডনে এ জলসা করার অনুমতি দেয়নি। এ জলসায় প্রায় ৫০ হাজার নর-নারী অংশ নেন। ৫টি মহাদেশের ১৭৬টি দেশের কোটি-কোটি লোক স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এ জলসার কর্মসূচী দেখেন। এ জলসার আন্তর্জাতিক বয়াতে সর্বোচ্চসংখ্যক মোট ৮ কোটি ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৭২১ জন লোক বয়াত করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।
প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এমটিএ- এর কতটি ক্লাসে 'তরজমাতুল কুরআন' সম্পূর্ণ করেছিলেন?
উ. ৩০৫ টি ক্লাসে।
প্র. ২০০২ খ্রিস্টাব্দে জামা'তের কোন বিশিষ্ট কবি মৃত্যুবরণ করেন?

উ. ১৩ জানুয়ারি জামা'তের বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক মোহতরম সাকিব যিরভী মৃত্যুবরণ করেন।
প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কখন পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন?
উ. ২০০২ সালের ৫ জুলাই শুক্রবার খুতবা দেয়ার প্রাক্কালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) অসুস্থ হয়ে পড়েন।
প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর জীবনের শেষ জলসা সর্ম্পকে কিছু বলুন।
উ. ২০০২ সালের ২৬-২৮ জুলাই যুক্তরাজ্য জামা'তের ৩৬তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর বয়াত হয় ২ কোটি ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার। জলসার উপস্থিতি ছিল ১৯,৪০০ জন। এটাই হুযূর (রাহে.)-এর জীবনের শেষ জলসা ছিল।
প্র. কবে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর রক্তবাহী ধমণীর অপারেশন করা হয় এবং কবে হুযূর হাসপাতাল থেকে ফিরে আসেন?
উ. ২০০২ সনের ৩০ অক্টোবর লন্ডনের এক হাসপাতালে। অপারেশনের পরে হুযূর (রাহে.) ৭ নভেম্বর হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরে আসেন। উল্লেখ্য, হুযূর (রাহে.)-এর অসুখের সময় বিশ্ব জামা'ত সদকার মাধ্যমে হুযূর (রাহে.)-এর জন্য দোয়া করতে থাকে। এরপর হুযূর মোটামুটি সুস্থ হতে থাকেন আর আস্তে-আস্তে তিনি সব কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে থাকেন। এ যাত্রায় হুযূর অলৌকিকভাবে সুস্থতা লাভ করেন।
প্র. "A Man of God" পুস্তক সর্ম্পকে কি জানেন?
উ. "A Man of God" পুস্তকটি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ঘটনাবহুল জীবনী ও তাঁর মহান পূতপবিত্র চরিত্র সর্ম্পকিত। পুস্তকটি ইয়ান এডামসন নামক একজন খ্রিস্টান লেখক লিখেছেন। এর উর্দূ অনুবাদ 'এক মর্দে খোদা' নামে প্রকাশিত হয়েছে।
প্র. কত সালে 'মরিয়ম শাদী ফান্ড'-এর তাহরীক করা হয়?
উ. ২০০৩ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর শ্রদ্ধেয় মাতার স্মরণে 'মরিয়ম শাদী ফান্ড'-এর তাহরীক করেন। উদ্দেশ্য ছিল এ ফান্ড থেকে জামা'তের গরীব মেয়েদের বিয়েতে সাহায্য করা হবে যাতে তাদের পিতা-মাতা বিয়ের সময় তাদের কিছু উপহার সামগ্রী দিতে পারেন।
প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জীবনের শেষ জুমু'আর খুতবা কবে প্রদান করেন?
উ. ১৮ এপ্রিল ২০০৩ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জীবনের শেষ জুমু'আর খুতবা দেন ও মজলিসে ইরফানে যোগ দেন।
প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) কবে, কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?
উ. ১৯ এপ্রিল লন্ডন সময় সকাল ৯:৩০ মিনিটে হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) প্রায় ৭৫ বছর বয়সে হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইসলামাবাদ,

টিলফোর্ড, ইংল্যান্ডে তাঁর অনুসারীদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে তাঁর প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ্‌র কাছে চলে যান। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন)।
২২ এপ্রিল ২০০৩ লন্ডন সময় রাত্র ৯:৩০ মিনিটে টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে নবনির্বাচিত খলীফা তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং পরে সেখানকার কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর (রাহে.) জানাযায় প্রায় ২৫ হাজার লোক অংশগ্রহণ করেন। এভাবেই ইসলামের দ্বিতীয় বিকাশের চতুর্থ নিদর্শন দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কবে, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর পিতা-মাতার নাম কী?
উ. হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ১৯৫০ সনের ১৫ সেপ্টেম্বর রাবওয়া, পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহমদ সাহেব ও সম্মানিত মাতার নাম হযরত সাহেবযাদী নাসেরা বেগম সাহেবা। তিনি হযরত মির্যা শরীফ আহমদ (রা.)-এর পৌত্র এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রপৌত্র।
প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর শিক্ষা জীবন সর্ম্পকে বলুন?
উ. • তিনি রাবওয়ার তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং রাবওয়ার তা'লীমুল ইসলাম কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং বি.এ. পাশ করেন।
• ১৯৭৬ সনে তিনি ফয়সালাবাদ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি-অর্থনীতিতে এম.এস.সি. ডিগ্রী লাভ করেন।
প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কত বছর বয়সে নেযামে ওসীয়্যতে অন্তর্ভুক্ত হন?
উ. ১৯৬৭ সনে মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি ওসীয়্যত করেন।

প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর বিবাহ কার সাথে, কখন অনুষ্ঠিত হয়?
উ. হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) হযরত সাহেবযাদী আমাতুল হাকীম ও সৈয়দ দাউদ মুজাফ্ফর শাহ্ সাহেবের কন্যা মুকার্‌রমা হযরত সৈয়দা আমাতুস্ সাবূহ বেগম সাহেবার সাথে ১৯৭৭ সনের ৩১ জানুয়ারি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭৭ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি তাঁর ওলীমা অনুষ্ঠিত হয়।
প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সন্তানদের নাম বলুন?
উ. হুযূর (আই.)-এর একমাত্র মেয়ের নাম মুকার্‌রামা আমাতুল ওয়ারিস ফাতেহ সাহেবা। তাঁর স্বামী হলেন নওয়াবশাহ নিবাসী মুকাররম ফতেহ্ আহমদ দাহিরী সাহেব। হুযূর (আই.)-এর একমাত্র পুত্র হলেন সাহেবযাদা মির্যা ওয়াক্কাস আহমদ সাহেব।
প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কত সালে ইসলামের সেবার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন?
উ. তিনি (আই.) আগস্ট ১৯৭৭ সালে জীবন উৎসর্গ করেন এবং নুসরত জাহাঁ স্কীম-এর অধীনে ঘানা চলে যান।
প্র. খিলাফতে আসীন হওয়ার পূর্বে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) যে সমস্ত জামা'তী দায়িত্বে কর্মরত ছিলেন তার বিবরণ দিন।
উ. ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৫ :
• আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুলের প্রিন্সিপাল।
• দুই বছরের জন্য ইসারচার আহমদীয়া সেকেন্ডারী স্কুলের প্রিন্সিপাল।
• দুই বছরের জন্য উত্তর ঘানার আহমদীয়া কৃষি খামারের ম্যানেজার ছিলেন। এ সময়ে তিনি সফলতার সাথে প্রথমবারের মত ঘানায় গমের চাষ করেন।
• ১৯৮৫ সনে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন এবং ১৯৮৫ সনের ১৭ মার্চ থেকে Department Incharge of Financial Affairs- নিযুক্ত হন।
• তিনি কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোহতামীম সেহতে জিসমানী (১৯৭৬-৭৭), মোহতামীম তাজনীদ (১৯৮৪-১৯৮৫), মোহতামীম মজলিস বেইরুন বা বহির্দেশ বিষয়ক ১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৮৮-৮৯ এবং ১৯৮৯ থেকে ৯০ পর্যন্ত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার নায়েব সদর ছিলেন।
• ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত তিনি কাযা বোর্ডের সদস্য ছিলেন।
• ১৯৮৮ সনের আগস্টে তিনি 'মজলিসে কারপরদায বেহেশতি মাকবেরার' সদর নিযুক্ত হন।
• ১৯৯৪ সনের ১৮ জুন তিনি নাযের তা'লীম নিযুক্ত হন।
• ১৯৯৯ সনে তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ্ পাকিস্তানের কায়েদ সেহ্তে জিসমানী ছিলেন

এবং ১৯৯৫-১৯৯৭ পর্যন্ত কায়েদ তা'লীমুল কুরআন ছিলেন ।
• ১৯৯৪ সন থেকে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত তিনি 'নাসের ফাউন্ডেশন'-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। একই সময়ে তিনি রাবওয়াকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার দায়িত্বে নিয়োজিত কমিটির প্রধান ছিলেন। তিনি 'গুলশানে আহমদ' নার্সারীর উদ্যোক্তা এবং তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় রাবওয়া সবুজ-শ্যামল শহরে পরিণত হয়।
• ১৯৯৭ সনের ১০ ডিসেম্বর তিনি নাযেরে আ'লা ও আমীর মোকামী নিযুক্ত হন। খলীফা নির্বাচিত হবার আগ পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।
• নাযেরে আলা থাকাকালে তিনি নাযের যিয়াফত ও নাযের যিরায়াত-এর দায়িত্বও পালন করেন।
প্র. হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) কবে আসীরানে রাহে মাওলা (আল্লাহর পথে বন্দী) হন?
উ. ১৯৯৯ সনের ৩০ এপ্রিল তিনি আল্লাহ্‌র পথে বন্দী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন এবং ১০ মে মুক্তি লাভ করেন।
প্র. হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চম খলীফা হিসেবে কবে নির্বাচিত হন?
উ. ২০০৩ সনের ২২ এপ্রিল মসজিদ ফযল, লন্ডনে নামায মাগরিব ও এশার পর 'মজলিসে ইন্তেখাবে খিলাফত' (খিলাফতের নির্বাচকমন্ডলী)-এর সভা মোহতরম চৌধুরী হামিদ উল্লাহ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ঐশী আকাঙ্ক্ষানুযায়ী হযরত সাহেবযাদা মির্যা মাসরূর আহমদ-কে খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস ঘোষণা করা হয়। খিলাফতের মহান পদে অধিষ্ঠিত হবার সময়ে তাঁর বয়স ছিল ৫৩ বছর।
আমরা দোয়া করি আল্লাহ্ তাঁর হাতকে শক্তিশালী করুন এবং জামা'তকে পরিচালনা করার সফল ও দীর্ঘ জীবন তাঁকে দান করুন। আর তাঁর পরিচালনাধীনে আল্লাহ্ জামা'তের ওপরে আশিস বর্ষণ করতে থাকুন এবং একে ফুলে-ফলে সুশোভিত করুন, (আমীন)।
প্র. ২০০৩ সনে হুযূর (আই.) কর্তৃক তাহরীকগুলোর বর্ণনা দিন।
উ. তিনি (আই.) ২০০৩ সনে নিম্নোক্ত তাহরীকগুলো করেছেন:
• ২২ এপ্রিল: হুযূর (আই.) তাঁর প্রথম বক্তৃতায় জামা'তকে সর্বপ্রথম দোয়ার তাহরীক করেন। হুযূর বলেন, 'অনেক দোয়া করুন, অনেক দোয়া করুন, অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা নিজ থেকে সাহায্য ও সমর্থন করুন যেন আহমদীয়াতের এ কাফেলা উন্নতির ধাপ অতিক্রম করে দ্রুত সামনে অগ্রসর হতে থাকে।'
• ২৫ এপ্রিল : আমি আবারও দোয়ার আহ্বান জানাচ্ছি, আমার জন্য বেশি-বেশি দোয়া করুন। বেশি-বেশি দোয়া করুন। বেশি করে দোয়া করুন খোদা তা'লা যেন আমার মাঝ এমন সব গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেন যার মাধ্যমে আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-

এর প্রিয় জামা'তের সেবা করতে পারি। আর আমরা যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারি, আমীন।
• সেপ্টেম্বর : আহমদী ডাক্তারদের সাময়িক উৎসর্গের তাহরীক।
• মানবমণ্ডলীর প্রতি সহানুভূতি পোষণ করার তাহরীক এবং অধিক সংখ্যায় দুরূদ শরীফ পাঠ করার তাহরীক করেন।
• ১০ ডিসেম্বর : ইরানের ভয়াবহ ভূমিকম্পে আক্রান্ত লোকদের সাহায্যের জন্যে তাহরীক।
প্র. হুযূর (আই.) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের কমপক্ষে কতটুকু পর্যন্ত পড়াশুনা করার জন্য তাহরীক করেন?
উ. ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত।
প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কখন 'তাহের ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন?
উ. ২৬ জুলাই ২০০৩ সনে।
প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর খিলাফতকালের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক জলসা কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
উ. এ জলসা ২৫-২৭ জুলাই ২০০৩ সালে ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। ৯৮ দেশের ২২৯ জাতির ৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৪০৩ জন বয়াত নেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২৫ হাজারের অধিক লোক এ জলসায় অংশ নেয়।
প্র. হুযূর (আই.) সর্বপ্রথম কবে, কখন, কোন দেশ সফর করেন এবং কবে ফিরত আসেন?
উ. হুযূর আনোয়ার (আই.) ১৯ আগস্ট ২০০৩ সনে জার্মানীর উদ্দেশ্যে প্রথম সফর করেন এবং ৮ সেপ্টেম্বর ফ্রান্স থেকে লন্ডন ফেরত আসেন।
প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর সর্বপ্রথম সফরে কোন-কোন দেশে সফরে যান?
উ. বেলজিয়াম, জার্মানী, হল্যান্ড, ফ্রান্স।
প্র. জামেয়া আহমদীয়া, কানাডার উদ্বোধন কখন হয়?
উ. ২০০৩ সনের ৭ সেপ্টেম্বর।
প্র. পশ্চিম ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদ 'বায়তুল ফুতুহ'-র ভিত্তি কে, কখন রাখেন এবং এর উদ্বোধন কে, কখন করেন?
উ. হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ১৯৯৯ সনের ১৯ অক্টোবর লন্ডনে মসজিদে মোবারক, কাদিয়ানের ইট দিয়ে এ মসজিদের ভিত্তি রাখেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আই.) ৩ অক্টোবর ২০০৩ সনে জুমু'আ নামায আদায় করার মাধ্যমে এর শুভ উদ্বোধন করেন।
প্র. ২০০৪ সনে হুযূর (আই.) কর্তৃক তাহরীকগুলোর বর্ণনা দিন।

উ. তিনি (আই.) ২০০৪ সনে নিম্নোক্ত তাহরীকগুলো করেছেন:

• ২৩ জানুয়ারি: এতীম ও দরিদ্রদের সাথে সদাচারণ করার তাহরীক। শর্তানুযায়ী যাকাত আদায় করার তাহরীক।

• মার্চ: বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে দোয়ার তাহরীক। এ দোয়াটি বেশি-বেশি পাঠ করতে বলেছেন–**"রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান- ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।"** (সূরা আল ইমরান : ৯)।

• এপ্রিল: শিশুদের উন্নত মানের শিক্ষা প্রদানের তাহরীক।

• মে: শর্তানুযায়ী চাঁদা দেয়ার তাহরীক।

• জুন: আফ্রিকার মসজিদ, মিশন হাউস, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সেবার জন্যে আহমদী আর্কিটেক্ট ও প্রকৌশলীদের সামনে এগিয়ে আসার তাহরীক।

• লাযেমী চাঁদাগুলো আদায়ে যত্নবান হওয়ার তাহরীক।

• আগস্ট: নেযামে ওসীয়্যতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাহরীক। বর্তমান বছরে যেন ১৫,০০০ নতুন ওসীয়্যতকারী হন। ২০০৮ সনের মধ্যে সারা বিশ্বে প্রত্যেক জামা'তে যেন ৫০% চাঁদা দাতা ওসীয়্যতের অন্তর্ভুক্ত হন। আনসারুল্লাহ্‌র সফে দওম সদস্যরা যেন এতে বেশি অংশ নেন।

• ৩ সেপ্টেম্বর: প্রত্যেক আহমদীকে ইসলামের শান্তির বাণী সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার তাহরীক করেন।

• সেপ্টেম্বর: নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াতের তাহরীক।

• ৫ নভেম্বর: নওমোবাঈনদেরকেও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অন্তর্ভুক্তির তাহরীক।

প্র. রাবওয়াতে অবস্থিত টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. ৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সনে।

প্র. হুযূর (আই.) পশ্চিম আফ্রিকাতে কখন সর্বপ্রথম সফরে যান এবং কোন-কোন দেশ সফর করেন?

উ. ১৩ মার্চ ২০০৪ থেকে ১৩ এপ্রিল ২০০৪ পর্যন্ত তিনি পশ্চিম আফ্রিকা সফর করেন। এ সফরে তিনি ঘানা, বুরকিনাফাসু, বেনিন, নাইজেরিয়া সফর করেন।

প্র. এ সফরে এমন দু'টি দেশের নাম বলুন যেখানে কোন যুগ খলীফা সর্বপ্রথম সফর করেন?

উ. বুরকিনাফাসু এবং বেনিন।

প্র. এমটিএ-২ কবে থেকে যাত্রা শুরু করে?

উ. ২২ এপ্রিল ২০০৪ সনে।

প্র. হুযূর (আই.) সর্বপ্রথম কখন কানাডা সফর করেন?

উ. ২১ জুন থেকে ০৫ জুলাই ২০০৪ সালে হুযূর (আই.) সর্বপ্রথম কানাডা সফর করেন।

প্র. হুযূর (আই.) তাহরীকে জাদীদের পঞ্চম দপ্তরের ঘোষণা কবে প্রদান করেন?

উ. ২০০৪ সনের ৫ নভেম্বর।

প্র. ২০০৫ সনে হুযূর (আই.) কর্তৃক তাহরীকগুলোর বর্ণনা দিন।

উ. তিনি (আই.) ২০০৫ সনে নিম্নোক্ত তাহরীকগুলো করেছেন:

• ১৮ ফেব্রুয়ারি : নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আরোপিত ঘৃণ্য আপত্তিসমূহের জবাব দেয়ার জন্যে খোদ্দাম ও লাজনার বিশেষ টিম গঠনের তাহরীক।

• ২৭ মে : শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলী উপলক্ষে জামা'তের বন্ধুগণের প্রতি নিম্নোক্ত দোয়া ও ইবাদতসমূহ পালন করার তাহরীক:

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখা।

২. প্রত্যেক দিন দু'রাকা'ত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত– অথবা যোহরের নামাযের পর) আদায়।

৩. সূরা ফাতিহা প্রত্যহ কমপক্ষে ৭ বার পাঠ করা এবং এর ওপর গভীরভাবে চিন্তা করা।

৪. **রাব্বানা আফরিগ আলায়না সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন।** (সূরা বাকারা : ২৫১) [প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করা]।

৫. **রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইযা হাদায়তানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব।** (সূরা আলে ইমরান : ৯) [প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করা]।

৬. **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআ'লুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম। (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)** [প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করা]।

৭. **আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলায়হি।** [প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করা]।

৮. **সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ।** [প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করা]।

৯. দুরূদ শরীফ (নামাযে যেটি পাঠ করা হয়) [প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করা]।

• ৩রা জুন: 'তাহের হার্ট ফাউন্ডেশনে'র জন্যে আর্থিক কুরবানীর তাহরীক। খোদ্দাম, আনসারুল্লাহ্ সফে দওম এবং লাজনা ইমাইল্লাহ যেন বেশি-বেশি এতে অংশ নেয়।

• হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কর্তৃক প্রবর্তিত 'মরিয়ম শাদী' ফান্ডে জামা'ত যেন বেশি-বেশি করে অংশগ্রহণ করে এ জন্য তাহরীক।

• সেপ্টেম্বর: বৃটেনে ২০৮ একর বিস্তৃত জায়গা ক্রয় করার জন্যে তাহরীক। পরবর্তীতে এ জায়গা ক্রয় করা হয়। বর্তমানে এখানে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ জায়গার নাম হল 'হাদীকাতুল মাহদী'।

• ২৩ সেপ্টেম্বর: নরওয়েতে মসজিদ নির্মাণের জন্যে তাহরীক।

প্র. হুযূর (আই.) কবে, স্পেনের কোন শহরে দ্বিতীয় আহমদীয়া মসজিদ নির্মাণের

তাহরীক করেছেন?
উ. জানুয়ারি ২০০৫ সনে স্পেনের বিখ্যাত শহর ভ্যালেন্সিয়ায়।
প্র. তাহের হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল কখন, কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ. ১৭ এপ্রিল ২০০৫ সনে, রাবওয়া, পাকিস্তানে।
প্র. নূরুল আইন কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের নাম?
উ. এটি পাকিস্তানের রাবওয়াতে অবস্থিত জামা'তের সর্বপ্রথম Eye Bank Hospital এবং Blood Bank -এর নাম।
প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.) পূর্ব আফ্রিকাতে কখন সর্বপ্রথম সফর করেন এবং কোন-কোন দেশে সফর করেন?
উ. ২৬ এপ্রিল ২০০৫ থেকে ২৫ মে ২০০৫ পর্যন্ত পূর্ব আফ্রিকায় সর্বপ্রথম সফর করেন। এ সফরে তিনি কেনিয়া, তানজানিয়া এবং উগান্ডায় যান।
প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.) সর্বপ্রথম কখন কাদিয়ানের পবিত্র মাটিতে সফর করেন?
উ. ১৫ ডিসেম্বর ২০০৫ সনে।
প্র. হুযূর (আই.) সর্বপ্রথম কবে দূরপ্রাচ্যে সফর করেন? এ সফরে তিনি কোন-কোন দেশ সফর করেন?
উ. হুযূর (আই.) ৪ঠা এপ্রিল ২০০৬ থেকে ১৫ মে ২০০৬ পর্যন্ত সিঙ্গাপুর, অস্ট্রেলিয়া, ফিজি, নিউজিল্যান্ড এবং জাপান সফর করেন।
প্র. হুযূর (আই.) কখন শিশু ও নব-দীক্ষিতগণকে ওয়াকফে জাদীদের অন্তর্ভুক্ত করার তাহরীক করেন?
উ. ২০০৬ সালের ০৬ জানুয়ারি।
প্র. পৃথিবীর এক প্রান্ত (ফিজি) থেকে কখন হুযূর (আই.) সরাসরি জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন?
উ. ২৮ এপ্রিল ২০০৬ সনে। এর মাধ্যমে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তওহীদের বাণী উচ্চকিত হবার ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার নিদর্শন পৃথিবীবাসী পুনরায় দেখতে পায়।
প্র. আরবি ভাষাভাষীদের মাঝে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য কোন চ্যানেল উদ্বোধন করা হয়?
উ. এমটিএ আল আরাবিয়া। ২৩ মার্চ ২০০৭ সনে এ চ্যানেলের উদ্বোধন করা হয়।
প্র. হযরত সাহেবযাদা মির্যা ওয়াসিম আহমদ সাহেব কবে ইন্তেকাল করেন?
উ. ২৯ এপ্রিল ২০০৭ সনে। দেশ বিভাগের পর তিনি কাদিয়ানেই অবস্থান করেন এবং মৃত্যু অবধি নাযেরে আলা এবং আমীরে মোকামী কাদিয়ান হিসেবে গুরুদায়িত্ব পালন করেন। হুযূর (আই.) তাঁর প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন, তিনি আমার সত্যিকার 'সুলতানে নাসির' ছিলেন।

প্র. হুযূর (আই.) কবে ঘানা সফর করেন? এ সফরের সময় সে দেশের রাষ্ট্রপতি হুযূর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, তার নাম কী?
উ. হুযূর আনোয়ার (আই.) ১৫-২২ এপ্রিল ২০০৮ সনে ঘানা সফর করেন। এ সফরে সে দেশের রাষ্ট্রপতি Nana Addo Danouah Akufo Addo হুযূর (আই.)-র সাথে সাক্ষাৎ করেন।
প্র. ১৩ এপ্রিল ২০০৮ সনে বেনিনের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং রেডিওতে কী ঘোষণা দেয়া হয়।
উ. বেনিন সরকারের তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন এবং রেডিওতে এ ঘোষণা দেন, "বেনিন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এ ঘোষণা করছে যে, নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া সম্প্রদায়ের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ২৩ এপ্রিল ২০০৮ সনে বেনিন সফর করবেন। এ সম্মানিত অতিথি দেশের রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদা লাভ করবেন।"
প্র. ২৪ এপ্রিল ২০০৮ সনে বেনিনের রাষ্ট্রপতি হুযূর (আই.)-এর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন, তার নাম কী?
উ. রাষ্ট্রপতির নাম হল Hon Thomas Yayi Boui.
প্র. নাইজেরিয়া সফরে হুযূর (আই.) সে দেশের নতুন জলসাগাহের উদ্বোধন করেন। জলসাগাহের নাম ও উদ্বোধনের তারিখ বলুন।
উ. 'হাদিকায়ে আহমদ' (আহমদের বাগান) । ২রা মে ২০০৮ সনে উদ্বোধন করা হয়।
প্র. ২৭ মে ২০০৮ সনে হুযূর (আই.) লন্ডনের কোন স্থান থেকে খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলীর ঈমান উদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন?
উ. লন্ডনের এক্সেল সেন্টার থেকে।
প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.) সকল আহমদী সদস্যদের কাছ থেকে খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন তা বলুন।
উ. **খিলাফত আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলীর অঙ্গীকারনামা:**
আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।
আজ খেলাফাতে এ্যাহমাদীয়া কে সও সাল পুরে হোনে পার হাম আল্লাহ্ তা'লা কি কাসাম খা কার ইস বাত কা এ্যাহেদ কারতে হ্যাঁয় কে হাম ইসলাম অওর এ্যাহমাদীয়াত কি ইশায়াত অওর মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কা নাম দুনিয়া কে কিনারোঁ তাক পঁহচানে কে লিয়ে আপনি জিন্দেগীওঁ কে আখেরী লামহা তাক কোশিশ কারতে চালে জায়েঙ্গে। অওর ইস মোকাদ্দাস ফারিযে কি তাকমিল কে লিয়ে হামেশা আপনি জিন্দেগীয়াঁ খোদা অওর উসকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কে লিয়ে ওয়াক্ফ রাক্খেঙ্গে, অওর

হার বাড়ী সে বাড়ী কুরবানী পেশ কার কে কেয়ামাত তাক ইসলাম কে ঝান্ডে কো দুনিয়া কে হার মুলক্ মে উঁচা রাক্খেঙ্গে। হাম ইস বাত কা ভি ইকরার কারতে হ্যাঁয় কে হাম নেযামে খেলাফাত কি হেফাযাত অওর ইস কে ইসতেকাম কে লিয়ে আখেরী দাম তাক জিদ্দো-জুহদ কারতে রাহেঙ্গে। অওর আপনি আওলাদ দার আওলাদ কো হামেশা খেলাফাত সে ওয়াবাসতা র্যাহনে অওর উসকি বারাকাত সে মুসতাফিয হোনে কি তালকিন কারতে রাহেঙ্গে। তা কে কেয়ামাত তাক খেলাফাতে এ্যাহমাদীয়া মাহফুয চালি জায়ে। অওর কেয়ামাত তাক সিলসিলায়ে এ্যাহমাদীয়া কে যারিয়ে ইসলাম কি ইশায়াত হোতি রাহে। অওর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কা ঝান্ডা দুনিয়া কে তামাম ঝান্ডোঁ সে উঁচা ল্যাহরানে লাগে। এ্যায় খোদা তু হামে ইস এ্যাহেদ কো পুরা কারনে কি তৌফিক আতা ফারমা। আল্লাহুম্মা আমীন। আল্লাহুম্মা আমীন। আল্লাহুম্মা আমীন।

অনুবাদঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। আজ আহমদীয়া খিলাফতের শত বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা আল্লাহ্র নামে শপথ করে এই অঙ্গীকার করছি, আমরা ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রসার আর হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছানোর জন্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব। এই পবিত্র দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে সর্বদা আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর জন্য আমাদের জীবন উৎসর্গ করে রাখব এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের পতাকাকে বিশ্বের প্রতিটি দেশে সমুন্নত রাখব। আমরা আরও অঙ্গীকার করছি, খিলাফত ব্যবস্থার সুরক্ষা ও এর দৃঢ়তার লক্ষ্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরাম চেষ্টা করে যাব, অধিকন্তু বংশ পরম্পরায় নিজ সন্তান-সন্ততিদের খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকা ও এর কল্যাণরাজি অর্জনের বিষয়ে সচেষ্ট থাকার নসিহত করে যাব যেন কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া খিলাফত সুরক্ষিত থাকে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আহমদীয়া জামা'তের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকে। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পতাকা যেন অন্য সব পতাকার ঊর্ধ্বে থাকে। হে খোদা! তুমি আমাদেরকে এই অঙ্গীকার পূর্ণ করার সামর্থ্য দাও। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর।

প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.) কবে জামেয়া আহমদীয়া, জার্মানীর উদ্বোধন করেন?

উ. ২০ আগস্ট ২০০৮ সনে।

প্র. ২৪ জুন ২০০৮ সনে হুযূর (আই.) যখন ওয়াশিংটন থেকে টরোন্টো, কানাডার উদ্দেশ্যে রওনা দেন তখন কোন ফ্লাইটে রওনা দেন এবং তার বোর্ডিং কার্ডে কী লেখা ছিল?

উ. কন্টিনেন্টাল এয়ারলাইন। বোর্ডিং কার্ডের মধ্যে খিলাফত আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী ২০০৮ এর লোগো সংযুক্ত ছিল এবং এর একদিকে মিনারাতুল মসীহ্র ছবি ছিল।

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

কার্ডের ওপর লিখা ছিল Khilafat Flight এবং আরেকটি অংশে Ahmadiyya Community এবং নীচের অংশে Khilafat Centenary Celebrations লেখা ছিল।

প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.) কবে জার্মানীতে 'মসজিদে খাদিজা'-এর শুভ উদ্বোধন করেন?

উ. ১৭ অক্টোবর ২০০৮ সনে জুমআর খুতবার মাধ্যমে।

প্র. মসজিদে খাদিজার উদ্বোধনী জুমআর খুতবায় হুযূর (আই.) বাংলাদেশের কোন কৃতী সন্তানের অবদানের কথা তুলে ধরেন?

উ. জার্মানীর প্রথম মোবাল্লেগ খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী বাঙালির।

প্র. মসজিদ খাদীজা উদ্বোধনীর সময় কোন-কোন দেশের প্রেস ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন? কতটি টিভি চ্যানেল মসজিদ উদ্বোধনের খবর সম্প্রচার করে?

উ. ৮টি দেশের প্রেস ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন। দেশগুলো হলো- জাপান, চেক রিপাবলিক, পোল্যান্ড, হল্যান্ড, ইটালী, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স এবং সুইডেন। আর নয়টি টিভি চ্যানেল মসজিদ উদ্বোধনের খবর সম্প্রচার করে।

প্র. কত তারিখে হুযূর আনোয়ার (আই.) যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট ভবনে সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতির উপর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন?

উ. ২২ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে।

প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.) দ্বিতীয়বার কখন ভারত সফর করেন?

উ. ২৩ নভেম্বর ২০০৮ সনে হুযূর আনোয়ার (আই.) দ্বিতীয়বারের মতো ভারতে আসেন। এ সফরে তিনি ২৪ নভেম্বর চেন্নাইয়ে মসজিদে হাদীর উদ্বোধন করেন। এরঃপর কেরালাতে ২৫ নভেম্বর মসজিদ বায়তুল কুদ্দুস এবং ২৮ নভেম্বর বায়তুল আফিয়াত, বায়তুল হাদী, মসজিদে মাহমুদ, মসজিদে নাসের, মসজিদে উমর এর উদ্বোধন করেন।

প্র. হুযূর (আই.) কবে জামেয়া আহমদীয়া, জার্মানীর একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনের ভিত্তি রাখেন?

উ. ১৫ ডিসেম্বর ২০০৯ সালে।

প্র. ইটালীর মাটি থেকে সর্বপ্রথম হুযূর (আই.)-এর জুমু'আর খুতবা কখন সম্প্রচারিত হয়?

উ. ১৬ এপ্রিল ২০১০ সালে।

প্র. হুযূর (আই.) কখন, কোথায় মসীহ্ নাসেরী হযরত ঈসা (আ.)-এর কাফন দেখার জন্য গিয়েছিলেন?

উ. হুযূর (আই.) ৩০ এপ্রিল ২০১০ সালে ইটালীর বিখ্যাত শহর তুরিনে মসীহ্ নাসেরী হযরত ঈসা (আ.)-এর কাফন দেখার জন্য গিয়েছিলেন।

প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.) স্পেন সফরের সময় কবে, কোথায় দেশের দ্বিতীয় আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি রাখেন?
উ. ১১ এপ্রিল ২০১০ সালে স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া শহরে মসজিদ 'বায়তুর রহমান'-এর।
প্র. আয়ারল্যান্ডের মাটিতে সর্বপ্রথম আহমদীয়া মসজিদের ভিত্তি কে, কখন রাখেন? মসজিদের নাম কী?
উ. আয়ারল্যান্ডে জামা'তের সর্বপ্রথম মসজিদের নাম হল 'মসজিদে মরিয়ম'। হুযূর আনোয়ার (আই.) ১৭ অক্টোবর ২০১০ শুক্রবার গ্যালওয়ে (Galway) শহরে এ মসজিদের ভিত্তি রাখেন।
প্র. কানাডার প্রধানমন্ত্রী হুযূর আনোয়ার (আই.)-কে কোন উপাধিতে ভূষিত করে?
উ. Champion of Peace. (শান্তির শিরোপাধারী)।
প্র. হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত শ্বশুর হযরত সৈয়দ দাউদ মুজাফফর শাহ্ সাহেব কবে ইন্তেকাল করেন?
উ. ০৮ মার্চ ২০১১ সনে ৯১ বছর বয়সে।
প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর পরম শ্রদ্ধেয় সম্মানিতা মাতা মোহতরমা সাহেবযাদী নাসেরা বেগম সাহেবা কখন ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?
উ. ২৯ জুলাই ২০১১ সনে। তাঁকে বেহেশতি মাকবেরা, রাবওয়াতে সমাহিত করা হয়।
প্র. স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সর্ববৃহৎ মসজিদ কবে, কে উদ্বোধন করেন?
উ. ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১১ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) নরওয়ের অসলোতে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহের সর্ববৃহৎ মসজিদ 'বায়তুন্ নাসর'-এর উদ্বোধন করেন। এ মসজিদে একসাথে ৪,৫০০ জন মুসল্লি নামায পড়তে পারেন।
প্র. কবে হুযূর (আই.) পোপকে চিঠি পাঠান? এ চিঠি পাঠানো সর্ম্পকে কী জানেন?
উ. ইসরাঈলের কাবাবির জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ শরীফ ওদেহ সাহেবের আবেদনের প্রেক্ষিতে হুযূর (আই.) পোপ ষোড়শ বেনেডিক্টের কাছে ধর্মীয় সহনশীলতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তার প্রভাবকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানিয়ে চিঠি পাঠান। ১০ নভেম্বর ২০১১ সনে ভ্যাটিকান সফরের সময় মুহাম্মদ শরীফ ওদেহ সাহেব সরাসরি পোপের হাতে হুযূরের (আই.) চিঠি ও ইটালিয়ান ভাষায় কুরআনের অনুবাদ উপহারস্বরূপ তুলে দেন।
প্র. কবে হুযূর (আই.) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠান? এর বিষয়বস্তু কী ছিল?
উ. হুযূর (আই.) ৫ মার্চ ২০১২ সনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনয়ামিন নেতানিয়াহুর নামে চিঠি পাঠান। এতে হুযূর (আই.) তাকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনার পথ সৃষ্টি না করার জন্য এবং এর ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে সতর্ক করেন।
প্র. কবে হুযূর (আই.) বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠি পাঠান? এ চিঠিগুলোর বিষয়বস্তু কী

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

ছিল?
উ. ২৫ মার্চ ২০১২ সনে হুযূর (আই.) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হার্পার ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদের কাছে পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি উল্লেখ করে এবং এর প্রতিরোধে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে চিঠি প্রেরণ করেন।
প্র. সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতির কোন ফতোয়ার বিরুদ্ধে, কবে হুযূর (আই.) কঠোর সমালোচনা করে বক্তব্য প্রদান করেন?
উ. ৮ এপ্রিল ২০১২ সনে হুযূর (আই.) সৌদি গ্র্যান্ড মুফতি আব্দুল আযীয আল শায়খ-এর সৌদি আরবসহ আরব দেশগুলোতে অবস্থিত গীর্জাসমূহ ধ্বংস করার ফতোয়ার কঠোর সমালোচনা করেন এবং এর বিরুদ্ধে কুরআনের দলিল পেশ করেন।
প্র. হুযূর (আই.) কখন তাঁর ঐতিহাসিক উত্তর আমেরিকা সফর সম্পন্ন করেন?
উ. হুযূর (আই.) জুন-জুলাই ২০১২ সনে উত্তর আমেরিকায় তাঁর ঐতিহাসিক সফর সম্পন্ন করেন।
প্র. কবে হুযূর (আই.) আমেরিকার ক্যাপিটল হিলে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন? এর সম্বন্ধে কী জানেন?
উ. ২৭ জুন ২০১২ সনে হুযূর (আই.) আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত মার্কিন পার্লামেন্ট ক্যাপিটল হিলে এক ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন। হুযূর (আই.) তাঁর বক্তব্যে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় কুরআনের শিক্ষা তথা প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এতে মার্কিন সিনেট ও কংগ্রেসের ৩০জন সদস্যসহ ১১৯ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
প্র. ২০১১-২০১২ সনে যে নতুন দু'টি দেশে আহমদীয়াত পৌঁছেছে সেগুলির নাম কী?
উ. ২০১১-২০১২ সনে যে নতুন দু'টি দেশে আহমদীয়া পৌঁছেছে সেগুলোর নাম হল পানামা সিটি ও আমেরিকান সামাবা।
প্র. ২০১৩ সন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে কতটি দেশে আহমদীয়াত প্রবেশ করেছে? ২০১২-২০১৩ সনে যে নতুন দু'টি দেশে আহমদীয়াত পৌঁছেছে সেগুলির নাম কী?
উ. ২০৪টি দেশে। নতুন দু'টি দেশের নাম হল কোস্টারিকা ও মন্টিনিগ্রো।
প্র. ২০১২-২০১৩ সনে কতজন ব্যক্তি বয়াত করে আহমদীয়া সিলসিলায় প্রবেশ করেছে?
উ. ৫ লক্ষ ৪০ হাজারের অধিক ব্যক্তি বয়াত করে আহমদীয়া জামা'তে প্রবেশ করেছে।
প্র. হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে অবমাননাকর চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে হুযূর আনোয়ার (আই.) কত তারিখে ঐতিহাসিক জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন?
উ. লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে ২১ সেপ্টেম্বর ২০১২ সনে হুযূর (আই.) ঐতিহাসিক জুমু'আর খুতবা প্রদান করেন।
প্র. কবে হুযূর (আই.)-কে লন্ডনের মেয়র লন্ডনস্থ সিটি হলে আমন্ত্রণ জানান?

উ. ১৯ নভেম্বর, ২০১২ তারিখে লন্ডনের মেয়র মিঃ বরিস জনসন হুযূর (আই.)-কে সিটি হলে আমন্ত্রণ জানান। ৪৫ মিনিটের সাক্ষাতকারে হুযূর এবং মেয়র মহোদয় বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠাসহ ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষাসমূহ, চরমপন্থা দূরীকরণে আহমদীয়া জামা'তের প্রচেষ্টাসমূহ এবং কতিপয় দেশে এ জামা'তের নির্যাতিত হবার বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেন।

প্র. কখন হুযূর আনোয়ার (আই.) ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন?

উ. ৪ঠা ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে হুযূর আনোয়ার (আই.) ব্রাসেল্সের ইউরোপীয় পার্লামেন্টে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী ৩৫০ এরও অধিক অতিথির উপস্থিতিতে এক ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন।

প্র. ২০১৩ সনে কোন দু'টি দেশ নিজ-নিজ দেশে আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে?

উ. বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ড। হুযূর (আই.) বাংলাদেশ জামা'তের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সনে বাংলাদেশের ৮৯তম সালানা জলসায় এম.টি.এ.-এর মাধ্যমে সরাসরি ঐতিহাসিক বক্তব্য প্রদান করেন।

প্র. কত তারিখে হুযূর (আই.) কানাডার বৃটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের ভ্যানকুভার শহরে জামা'তের নব-নির্মিত মসজিদ উদ্বোধন করেন? এবং মসজিদটির নাম কী?

উ. ১৮ মে ২০১৩ সনে। মসজিদের নাম হলো-"বায়তুর রহমান"।

বিবিধ (২)

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মা ও বাবা কখন মারা যান?

উ. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়স যখন ৩৩ বছর– অর্থাৎ, ১৮৬৮ সনে তাঁর মা মারা যান এবং যখন তাঁর বয়স ৪১ বছর তখন– অর্থাৎ, ১৮৭৬ সনে তাঁর বাবা মারা যান।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রথম স্ত্রীর নাম কী?

উ. হুরমত বিবি। এ স্ত্রীর গর্ভে হযরত সাহেবযাদা মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব ও সাহেবযাদা মির্যা ফযল আহমদ সাহেব জন্মগ্রহণ করে। হযরত সাহেবযাদা মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব পরবর্তীতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্ মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর হাতে বয়াত নেন।

প্র. ২৩ মার্চ এবং ২০ ফেব্রুয়ারি আহমদীয়াতের ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?

উ. ১৮৮৯ খিস্টাব্দের ২৩ মার্চ তারিখে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লুধিয়ানা নিবাসী সূফী আহমদ জান সাহেবের মহল্লা জাদীদস্থ বাড়ীতে প্রথম বয়াত নেয়া আরম্ভ করেন। এ বয়াত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ জামা'তের সূচনা হয়।

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি (আ.) 'মুসলেহ্ মাওউদ' সংক্রান্ত ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেন। যাতে প্রতিশ্রুত পুত্রের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে।

প্র. কাদিয়ানে প্রথম রেলগাড়ি চলাচল কবে আরম্ভ হয়?

উ. ১৯২৮ সনের ১লা ডিসেম্বর।

প্র. কাদিয়ানে প্রথম টেলিফোন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হয় কবে?

উ. ১৯৩৬ সনের ১৪ ডিসেম্বর। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সর্বপ্রথম হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফর উল্লাহ্ খান (রা.) সাহেবের সাথে কথা বলেন।

প্র. হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্বন্ধে একজন গয়ের আহমদী মাওলানার ফতোয়া উল্লেখ করুন।

উ. ১৯৪২ সনের ১১ মে মিশরের আল্ আজহার ইউনিভার্সিটির রেক্টর আল্লামা মাহমুদ সালতুত ফতোয়া দেন, "পবিত্র কুরআন অনুসারে হযরত ঈসা (আ.) এ পৃথিবীতেই স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন"।

প্র. কাদিয়ানের দরবেশ কারা?

উ. ১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের সময় কাদিয়ান হতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর হিজরতের পর যেসব আহমদী কাদিয়ানে রয়ে গিয়েছিলেন তারাই 'কাদিয়ানের দরবেশ' নামে পরিচিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) তাদেরকে কাদিয়ানের হেফাযতের জন্য রেখে যান। এতে সাতজন বাঙালি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্র. হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর কাদিয়ান হতে পাকিস্তানে হিজরত সম্বন্ধে কী

জানেন?

উ. হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ১৯৪১ সনের ১২ ডিসেম্বর তাঁর দেখা এক স্বপ্নের বর্ণনায় বলেন, তাঁকে হিজরত করতে হবে এবং এক পাহাড়ী এলাকায় নতুন কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। পরে দেশ বিভাগের সময় ১৯৪৭ সনে হুযূর (রা.) কাদিয়ান হতে পাকিস্তানের লাহোরে হিজরত করেন। পরে লাহোর হতে ৯৫ মাইল দূরে একটি জনমানবহীন কংকরময় পাহাড়ী অঞ্চলে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ স্থানই রাবওয়া নামে খ্যাত। ১৯৪৮ সনের ৫ আগস্ট জামা'ত পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে রাবওয়ার ভূমি ক্রয় করে নেয় এবং ২০ সেপ্টেম্বর হুযূর (রা.) রাবওয়ার উদ্বোধন করেন।

প্র. জামা'তে আহমদীয়ার মহিলাগণ কর্তৃক বহির্দেশে কোন-কোন মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়?

উ. (১) মসজিদ ফযল: লন্ডন (২) মসজিদ মুবারক: হেগ, হল্যান্ড (৩) মসজিদে নুসরাত জাঁহা: কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক (৪) মসজিদ খাদীজা: বার্লিন, জার্মানী।

প্র. পাঞ্জাব দাঙ্গা কী?

উ. ১৯৫৩ সনে মৌলভী আবুল আলা মওদুদী ও অন্যান্য গোঁড়া মোল্লাদের প্ররোচনায় পাকিস্তানের কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষত পাঞ্জাবে আহমদীদের বিরুদ্ধে যে কুখ্যাত দাঙ্গা-হাঙ্গামা পরিচালনা করা হয় তা-ই 'পাঞ্জাব দাঙ্গা' নামে পরিচিত। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে জামা'ত এ সময় অসাধারণ সংযম প্রদর্শন করে অল্প সময়ের মাঝেই সব সাময়িক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠে।

প্র. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাস লেখার জন্য কাকে নিযুক্ত করেছিলেন?

উ. জামা'তের ইতিহাসবিদ মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেবকে (১৯৫৫ সনে)।

প্র. ১৯৭৪ সনে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পাশকৃত 'নট-মুসলিম' আইন সম্বন্ধে উল্লেখ করুন।

উ. ১৯৭৩ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কর্তৃক শতবার্ষিকী জুবিলী পরিকল্পনা ঘোষণার পর পাকিস্তানের গোঁড়া মোল্লারা আহমদীয়াতের অগ্রযাত্রা বন্ধ করার জন্য সুদূরপ্রসারী ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এ ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে রাবওয়া রেলস্টেশনে মোল্লাসমর্থক ছাত্রদের হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে আহমদী বিরোধী রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হয়। অসংখ্য নিরীহ আহমদীদের ঘর-বাড়ি, দোকানপাট লুট করা হয়। আহমদীদের ওপর দৈহিকভাবেও অত্যাচার চালানো হয়। মোল্লারা পাকিস্তানের ভুট্টো সরকারের সাথে অবৈধ যোগসাজশ করে সংসদে আহমদীদের বিরুদ্ধে 'নট-মুসলিম' বিল উত্থাপন করে। সংসদে আহমদীদের প্রতিনিধিত্ব করেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)। তাঁকে সহযোগিতা করেন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফ-াতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.), মাওলানা আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব, শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেব এবং মাওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব। অজ্ঞাত কারণে সংসদের

উল্লেখিত সময়ের কার্যবিবরণী জনসমক্ষে প্রকাশিত হতে দেয়া হয়নি। পরিশেষে ১৯৭৪ সনের ৭ সেপ্টেম্বর এক সাজানো নাটকের মাধ্যমে আহমদীদেরকে 'নট-মুসলিম' ঘোষণা করা হয়।

প্র. প্রথম কখন যুগ খলীফা ইংল্যান্ডের সালানা জলসায় অংশ নেন?

উ. ১৯৭৫ সনের ২৪-২৫ আগস্ট হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ইংল্যান্ডের ১১তম সালানা জলসায় অংশ নেন।

প্র. প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক কখন পাকিস্তানে আহমদী বিরোধী কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স জারী করে?

উ. ১৯৮৪ সনের ২৬ এপ্রিল। এ অর্ডিন্যান্স জারীর মাধ্যমে আহমদীদের নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়া, সালাম দেয়া, আযান দেয়া এবং ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করা প্রভৃতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

প্র. আহমদীদের সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রীম কোর্ট কী রায় প্রদান করে?

উ. ১৯৮৫ সনের ডিসেম্বর মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার সুপ্রিম কোর্ট রায় প্রদান করে বলে, **"আহমদীরা মুসলমান এবং তারা মসজিদে নামায আদায়ের ও মুসলমানদের কবরে সমাহিত হওয়ার অধিকার রাখে।"**

প্র. বহির্দেশে তবলীগ করতে গিয়ে যে সকল মুরুব্বী ইন্তেকাল করেছেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম লিখুন?

উ. ১) হযরত মাওলানা নযীর আহমদ আলী সাহেব (সিয়েরালিওন), ২) হযরত হাফেয ওবায়দুল্লাহ্ সাহেব (মরিশাস), ৩) হযরত আব্দুর রহমান খান বাঙালি সাহেব (আমেরিকা), ৪) হযরত মাওলানা আবু বকর আইয়ুব সাহেব (হল্যান্ড), ৫) মোকাররম মাওলানা মোবাশশের আহমদ চৌধুরী সাহেব (নাইজেরিয়া)।

প্র. **"আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানে এমন উৎকর্ষতা অর্জন করবেন যে, স্বীয় সত্যতার জ্যোতি, দলিল-প্রমাণ ও নিদর্শনে অন্য সকলের মুখ বন্ধ করে দিবে"**– হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার সত্যায়নের অধিকারী দুইজন আহমদীর নাম বলুন।

উ. ১) হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব (রা.), ২) মোহতরম ড. আব্দুস সালাম সাহেব।

প্র. হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.)-এর জন্ম-মৃত্যু তারিখ এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াতের তারিখ বলুন?

উ. জন্মঃ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩, মৃত্যুঃ ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৫। তিনি ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৭ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত নেন।

প্র. হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান সাহেব জাগতিক কোন-কোন উল্লেখযোগ্য পদে আসীন ছিলেন?

উ. • পাঞ্জাব আইনসভার সদস্য
• সভাপতি, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ, ১৯৩১
• সদস্য, গোল টেবিল বৈঠক, লন্ডন
• বিচারপতি, সুপ্রিম কোর্ট , ভারত
• রেলমন্ত্রী, ভারত
• পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী
• সহকারী প্রধান বিচারপতি এবং প্রধান বিচারপতি, আন্তর্জাতিক আদালত
• জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট

প্র. কর্মজীবনে হযরত চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান (রা.)-এর একটি বিরল কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করুন।

উ. এখন পর্যন্ত তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি একাধারে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট ছিলেন (১৯৬২) এবং আন্তর্জাতিক আদালতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন (১৯৭০-৭৩)।

প্র. নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম মুসলমান বিজ্ঞানীর নাম কী? কত সালে কোন বিষয়ের উপর তিনি এ পুরস্কার লাভ করেন? তাঁর আবিষ্কারের মূল বিষয় কী ছিল?

উ. প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম। ১৯৭৯ সালে তিনি তাঁর মর্যাদাপূর্ণ গবেষণামূলক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজে ভূষিত হন। তিনি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বল ও দুর্বল পারমাণবিক বল-এ দুটো বলকে অভিন্ন প্রমাণ করেন। এটা আইনস্টাইনও প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একজন আহমদী মুসলমান এবং সারা বিশ্বে প্রথম কাতারের আহমদী হিসাবে পরিচিত।

প্র. প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম সাহেবের জন্ম-মৃত্যু তারিখ বলুন। তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

উ. জন্মঃ ২৯ জানুয়ারি ১৯২৬, মৃত্যুঃ ২১ নভেম্বর ১৯৯৬ সনে তিনি অক্সফোর্ডে ইন্তেকাল করেন। ২৫ নভেম্বর ১৯৯৬ সনে তাঁকে বেহেশতি মাকবেরা, রাবওয়াতে সমাহিত করা হয়।

প্র. ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকের শতবার্ষিকী কীভাবে উদযাপন করা হয়?

উ. ১৯৯৬ সনে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিখ্যাত পুস্তক 'ইসলামী নীতি দর্শন'-এর শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এ পুস্তকের এক লক্ষ কপি প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন ভাষায় এ পুস্তক অনুবাদ করা হয় এবং হুযূর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) সকল আহমদীকে এ পুস্তক পাঠ করার তাহরীক করেন। জামা'তের বিভিন্ন পত্রিকা এ পুস্তকের শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে।

প্র. ১৯৯৭ সনে কোন অসাধারণ নিদর্শনের শতবার্ষিকী পূর্ণ হয়?

উ. রসূল আকরাম (সা.)-কে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজকারী আর্য সমাজী নেতা পণ্ডিত লেখরাম পেশওয়ারীর ঐশী শাস্তিস্বরূপ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর শতবর্ষ পূর্ণ হয় যা– ৬ মার্চ ১৮৯৭ সনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক সংঘটিত হয়েছিল।

প্র. কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়ার মুখপত্র 'মাসিক খালিদ' কবে থেকে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়?

উ. অক্টোবর ১৯৫২ থেকে।

প্র. রাবওয়া থেকে প্রকাশিত কেন্দ্রীয় পত্রিকা-ম্যাগাজিনের নাম বলুন।

উ. • মাসিক খালিদ : মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া
• মাসিক তাশহীযুল আযহান : মজলিস আতফালুল আহমদীয়া
• মাসিক আনসারুল্লাহ্ : মজলিস আনসারুল্লাহ্
• মাসিক মিসবাহ : লাজনা ইমাইল্লাহ্
• মাসিক তাহরীকে জাদীদ : আঞ্জুমানে তাহরীকে জাদীদ।

প্র. লন্ডন থেকে প্রকাশিত আহমদী পত্র-পত্রিকার নাম বলুন।

উ. • Monthly Review of Religions
• সাপ্তাহিক আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল
• মাসিক তাকওয়া (আরবি)
• মাসিক আখবারে আহমদীয়া (আহমদীয়া সংবাদ)

প্র. ১৯৯৭ সনের জার্মানীর জলসা সালানার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

উ. হুযূর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশে এ জলসার সময় বসনিয়ান, আলবেনিয়ান এবং আরববাসীদের পৃথক-পৃথকভাবে প্রথমবারের মতো জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

প্র. ২০০৫ সনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য কী?

উ. এ বছর নেযামে ওসীয়তের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। সেই সাথে খিলাফতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার ১০০ হিজরি শতাব্দীও পূর্ণ হয়।

প্র. আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী বছর ২০০৮ সনে আল্লাহ্‌র পথে শহীদ আহমদী সদস্যদের নাম বলুন।

উ. ১) মোকাররম শহীদ ডা. আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেব, আমীর, জেলা: মিরপুর খাস, পাকিস্তান। (৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮)।

২) মোকাররম শহীদ শেঠ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব, আমীর, জেলা: নওয়াব শাহ, পাকিস্তান। (৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮)।

৩) মোকররম শহীদ শেখ সাঈদ আহমদ সাহেব, করাচী, পাকিস্তান। (১৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

প্র. জামা'তে আহমদীয়া ইংল্যান্ডের তত্ত্বাবধানে মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, লন্ডনে কবে শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ২১ মার্চ ২০০৯ সনে।

প্র. প্রথম বৃটিশ আহমদী সদস্যর নাম বলুন যাকে ইংল্যান্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ 'হাউজ অব লর্ডস'- এর 'লর্ড' হিসেবে মনোনোয়ন দান করেছেন?

উ. মোকাররম লর্ড তারেক আহমদ বিটি সাহেব।

প্র. প্রথম আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার (Ahmadiyya Peace Award) কাকে এবং কখন দেয়া হয়?

উ. লর্ড এরিক এভবারী (Lord Eric Avebury)-কে ২০ মার্চ ২০১০ সনের শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানে।

প্র. ২০১০ সনের কোন তারিখ জামা'তে আহমদীয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দিন? এ দিন কী ঘটেছিল?

উ. ২৮ মে ২০১০ ইং। এ দিন পাকিস্তানের লাহোরে অবস্থিত দু'টি আহমদীয়া মসজিদ গাড়হী শাহুর মসজিদ 'দারুয্ যিক্‌র' এবং মসজিদ বায়তুন্ নূর, মডেল টাউন, লাহোরের ওপর আততায়ীদের হামলায় আল্লাহ্‌র রাস্তায় ৮৬ জন নিষ্ঠাবান আহমদী শাহাদাত বরণ করেন।

প্র. এমন একজন আহমদী সদস্যের নাম লিখুন যিনি নিজ মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন?

উ. মোকাররম শহীদ মেজর আফযাল আহমদ সাহেব। (পাকিস্তান)।

প্র. কবে, কি উপলক্ষে লন্ডনে অবস্থিত পাকিস্তানের হাই কমিশন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তকে প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের জাতীয় পতাকা উপহারস্বরূপ প্রদান করে?

উ. জুলাই ২০১০ সনে অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্য জামা'তের ৪৪তম সালানা জলসায় পতাকা উত্তোলনের জন্য।

প্র. কোন ব্যক্তিকে দ্বিতীয় 'আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার' প্রদান করা হয়?

উ. পাকিস্তানের বিখ্যাত সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনাব আব্দুস সাত্তার ইদি সাহেব।

প্র. কোন প্রতিষ্ঠানকে যুক্তরাজ্যের সালানা জলসা ২০১২-তে তৃতীয় 'আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার' লাভকারী বলে ঘোষণা করা হয়?

উ. তৃতীয় 'আহমদীয়া শান্তি পুরস্কার' লাভ করে প্রথমবারের মতো কোনো প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটির নাম হলো SOS Children's Villages UK. প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেন এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ডেম মেরী রিচার্ডসন উইউ.

প্র. চতুর্থ 'আহমদীয়া মুসলিম শান্তি পুরস্কার' কে লাভ করেন?

উ. ড. ওহেনেবা বোয়াচি-আদজেই। তিনি তাঁর যুগান্তকারী চিকিৎসা কর্মের জন্য পুরস্কৃত হন।

প্র. আহমদীয়া জামা'তের website- এর ঠিকানা কী কী ?

উ. • আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের website- এর ঠিকানা হচ্ছে : www.alislam.org

• এমটিএ-এর website- এর ঠিকানা হচ্ছে : www.mta.tv

• জামা'তে আহমদীয়ার www.alislam.org এর বাংলা সংস্করণ website- এর ঠিকানা হচ্ছে : www.ahmadiyyabangla.org

• মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের website- এর ঠিকানা হচ্ছে : www.mkabd.org

তথ্যসূত্রঃ

১) দ্বীনি মা'লুমাত. মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।

২) খিলাফত আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী স্মরণিকা, তাহরীকে জাদীদ, আঞ্জুমানে আহমদীয়া, পাকিস্তান।

নবম পরিচ্ছেদ
জামাতে আহমদীয়া ও এর প্রধান তিন অঙ্গ-সংগঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

হযরত রাসুলে করিম (সা.) ধর্ম জগতের সূর্য এবং তাঁর অনুবর্তীতে আবির্ভূত হযরত মসিহ মাওউদ (আ.) ধর্ম জগতের চন্দ্র। তিনি বিভিন্ন ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ এবং শেষ যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠা করার ইমামুজ্জামান। ফলে ইসলামের বিশ্ব বিজয়ের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ঐশী নির্দেশে তিনি ২৩ মার্চ ১৮৮৯ তারিখ থেকে বয়াত গ্রহণ শুরু করেন। এর ফলে তাঁর অনুগত শিষ্য সৃষ্টির প্রবাহ শুরু হয়। আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রেরিত মামুর হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন-"আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে-প্রান্তে পৌঁছে দেব"। (ইলহাম)। আর এরই ফলশ্রুতিতে প্রতিশ্রুতি মসিহ্-র খেলাফতের অধিনে জামাতে আহমদীয়া আজ পৃথিবীর প্রায় সবকটি দেশে ক্রমবর্ধমান হারে সুবিস্তৃতিলাভ করছে।

বঙ্গদেশে জামাতে আহমদীয়া

প্র. বঙ্গদেশে জামাতে আহমদীয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলুন?

উ. ১৯০৪-১৯০৫ সালে বঙ্গমাতার এক সোনার সন্তান যুগ-ইমামের আবির্ভাবের সত্যতা উপলব্ধি করে তাঁর দীক্ষা গ্রহণে মনস্তুষ্টি লাভ করেন এবং ঐশী নিয়ামতের অংশীদার হন। বাংলার সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি হলেন, হযরত আহমদ কবির নুর মোহাম্মদ (রা.)। তিনি কাদিয়ানে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণের মাধ্যমে সাহাবির মর্যাদা লাভকারী প্রথম বাঙালি। দ্বিতীয় বাঙালি আহমদী ব্যক্তি হলেন, হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.)। তাঁর জন্মভূমি বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার অন্তর্গত নাগেরগাঁও গ্রামে। তিনি বার্মায় ডাক বিভাগে কর্মরত অবস্থায় হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা উপলব্ধি করে ১৯০৬ সালে কাদিয়ান চলে যান এবং হযরত আকদাস (আ.)-এর হাতে বয়াত করে সাহাবি হওয়ার বিরল সম্মান লাভ করেন। তৃতীয় বাঙালি আহমদী হলেন, হযরত রইস উদ্দিন খাঁ (রা.)-এর সহধর্মিণী সৈয়দা আজিজাতুন্নেসা সাহেবা। ১৯০৭ সালে স্বপ্নযোগে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা নিশ্চিত হয়ে হযরত মসিহ মাওউদ (আ.)-এর বরাবরে পত্র মারফত বয়াতের আবেদন করে তিনি প্রথম বাঙালি আহমদী মহিলা হিসেবে অক্ষয় হয়ে আছেন।

১৯১২ সানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রখ্যাত আলেম হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.) ৩জন সফরসঙ্গীসহ কাদিয়ান গমন করে হযরত খলিফাতুল মসিহ

আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে এসে ২৫ নভেম্বর ১৯১২ তারিখ থেকে বয়াত গ্রহণ শুরু করেন। ১৯১৩ সালে হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল (রা.) বিশিষ্ট সাহাবি (পরবর্তীতে আমেরিকার মিশনারি) হযরত ড. মুফতি মোহাম্মদ সাদেক (রা.)-কে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রেরণ করেন। তাঁর তাহরিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর ও আশেপাশের গ্রামের আহমদীদের নিয়ে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়া গঠিত হয়। এ নবগঠিত জামাতের প্রেসিডেন্ট হন হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)। তখন মাওলানা সাহেবের পূর্বে যারা আহমদী হয়েছিলেন এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিলেন তারাও এ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন।

১৯১৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বা-কায়দা আমারত প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক আমির নিযুক্ত হন হযরত মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)। তিনি প্রথম বাঙালি মোবাল্লেগও ছিলেন বটে।

বঙ্গদেশ ও তৎপরবর্তি পূর্ব পাকিস্তান এবং সর্বপরে স্বাধীন বাংলাদেশে জামাতে আহমদীয়ার আমিরদের (দেশীয় প্রধান) একটি তালিকা নিম্নে তুলে ধরা হল:

ক্র.	নাম	পদবী	সময়কাল
১.	মোহতরম মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)	প্রেসিডেন্ট	১৯১৩-১৯১৬
২.	মোহতরম মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ (রহ.)	আমির	১৯১৬-১৯২৬
৩.	মোহতরম প্রফেসর আব্দুল লতিফ	আমির	১৯২৬-১৯৩১
৪.	মোহতরম হেকিম আবু তাহের মাহমুদ আহমদ	আমির	১৯৩১-১৯৩৪
৫.	মোহতরম খান বাহাদুর আবুল হাশেম খান চৌধুরী	আমির	১৯৩৪-১৯৪০
৬.	মোহতরম খান সাহেব মৌলভি মোবারক আলী	আমির	১৯৪০-১৯৪৯
৭.	মোহতরম মৌলভি মোহাম্মদ সাহেব	আমির	১৯৪৯-১৯৫৫
৮.	মোহতরম ক্যাপ্টেন চৌধুরী খোরশেদ আহমদ বাজওয়া	আমির	১৯৫৫-১৯৫৭
৯.	মোহতরম শেখ মাহমুদুল হাসান	আমির	১৯৫৭-১৯৬২
১০.	মোহতরম মৌলভি মোহাম্মদ সাহেব	আমির	১৯৬২-১৯৮৭
১১.	মোহতরম মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	আমির	১৯৮৭-১৯৯৫
১২.	মোহতরম আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী	আমির	১৯৯৫-১৯৯৭
১৩.	মোহতরম আলহাজ মীর মোহাম্মদ আলী	আমির	১৯৯৭-২০০৩
১৪.	মোহতরম মোবাশশের উর রহমান	আমির	২০০৩- বর্তমান

লাজনা ইমাইল্লাহ

c. jvRbv BgvBjvni msw¶ß BwZnvm ejb?
D. nhiZ LjxdvZj gmxn mvbx (iv.) 15 wW‡m¤i 1922 m‡b G msMVb Kv‡qg K‡ib| Gi A_ n‡"Q Avjvni `vmx‡`i msMVb| jvRbv BgvBjvni m`m¨MY nhiZ Av¤§vRvb ^mq`v bmivZ Rvnv †eMg mv‡nev (iv.)-‡K mfvcwZi Avmb AjsKZ Kivi Rb¨ Ab‡iva K‡ib| d‡j G msMV‡bi mec_g m‡¤§jb nhiZ Av¤§vRv‡bi †gveviK Dcw¯wZ I mfvcwZ‡Z hvÎv ïi" K‡i| m‡¤§jb PjvKvjxb mg‡qB nhiZ Av¤§vRvb nhiZ gvng`v †eMg mv‡nev‡K [nhiZ LjxdvZj gmxn mvbx (iv.)-Gi c_g ¯x I nhiZ wghv bv‡mi Avng` (iv‡n.)-Gi gv] mfvcwZi Avm‡b emvb Avi wZwb G `wqZ AZ¨š wbôv I AvšwiKZvi mv‡_ 1922 †_‡K 1941 mvj chš cvjb K‡ib| G mg‡q nhiZ AvgvZj nvB †eMg mv‡nev [nhiZ LwjdvZj gmxn mvbx (iv.)-Gi ¯x], nhiZ mv‡jnv †eMg mv‡nev [nhiZ gxi †gvnv¤§` BmnvK (iv.)-Gi ¯x], nhiZ ^mq`v mviv †eMg mv‡nev [nhiZ LwjdvZj gmxn mvbx (iv.)- Gi ¯x], Ges nhiZ ^mq`v gwiqg wmÏxKv mv‡nev [nhiZ LwjdvZj gmxn mvbx (iv.)-Gi ¯x Ges nhiZ wghv Zv‡ni Avnvg` (iv‡n.)-Gi gv] †Rbv‡ij †m‡µUvixi `wqZ AZ¨š Kg`¶Zvi mv‡_ cvjb K‡ib| 1940-41 m‡b nhiZ gvng`v †eMg mv‡nev `xN¯vqx Am¯Zvi Kvi‡b QwU wb‡j nhiZ ^mq`v gwiqg wmÏxKv mv‡nev m`i wbewPZ nb Ges nhiZ ^mq`v D‡¤§ gwZb mv‡nev †Rbv‡ij †m‡µUvixi `wqZ cvjb K‡ib| 1944 m‡bi gvP gv‡m nhiZ ^mq`v gwiqg wmÏxKv mv‡nev gZ¨ eib Ki‡j cbivq nhiZ gvng`v †eMg mv‡nev m`i wbewPZ nb Ges gZ¨ Aewa Z_v 31 RjvB 1958 mb chš G `wqZ cvjb K‡ib| AvM÷ 1958 mb †_‡K nhiZ D‡¤§ gwZb mv‡nev mfvcwZi c‡` AvgZ¨ Avmxb wQ‡jb| D‡jL¨, 1989 mb n‡Z LjxdvZj gmxn wek m`‡ii cwie‡Z †`kxq m`i ceZb K‡ib| ZvB nhiZ ^mq`v D‡¤§ gwZb mv‡nev 1989 mb n‡Z 1997 mb chš cwK¯v‡bi m`i wn‡m‡e `wqZ cvjb K‡ib| Gici 1997 ‡_‡K b‡f¤i 2005 chš †gvnZigv mv‡nehv`x AvgvZj KÏm mv‡nev cwK¯v‡bi jvRbv Bgvjvni m`‡ii `wq‡Z Avmxb wQ‡jb| 2005 mb †_‡K eZgvb Aewa mv‡nehv`x AvgvZj Avjxg BmgZ mv‡nev cwK¯v‡bi jvRbv BgvBjvn-Gi m`‡ii `wqZ cvjb K‡i hv‡"Qb| 1928 m‡b bv‡mivZj Avng`xqv msMVb cwZwôZ nq Ges Gi mwweK Z`viwK jvRbv BgvBjvn Gi Dci b¨v¯ nq|

jvRbv BgvBjvni cZvKv

বঙ্গদেশে লাজনা ইমাইল্লাহ

অবিভক্ত বাংলায় ত্রিশ কিংবা চল্লিশ দশকে সর্বপ্রথম লাজনা ইমাইল্লাহ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের মোট মজলিস সংখ্যা ১০৩ টি। বাংলাদেশে ১৯৪৮ সন থেকে বর্তমান অবধি দায়িত্ব পালনকারী সংগঠন প্রধানদের নাম নিম্নে তুলে ধরা হল:

ক্র.	নাম	পদবী	সময়কাল
১.	মোহতরমা রাশিদা বেগম ফরহাত জাহান (মোহতরম চৌ. মোজাফ্ফর উদ্দিন সাহেবের স্ত্রী)	প্রেসিডেন্ট	১৯৪৮---
২.	মোহতরমা বেগম খলীফা তাকিহউদ্দিন	প্রেসিডেন্ট	
৩.	মোহতরমা হুরুননেসা বেগম	প্রেসিডেন্ট	
৪.	মোহতরমা আপা আমাতুন নাসির (মোহতরম মির্যা জাফর আহমদ সাহেবের স্ত্রী)	প্রেসিডেন্ট	
৫.	মোহতরমা বেগম মোসলেমা সালাম	প্রেসিডেন্ট	১৯৭১-১৯৭৩
৬.	মোহতরমা মাসুদা সামাদ খান চৌধুরী	প্রেসিডেন্ট	১৯৭৩-১৯৮৮
৭.	মোহতরমা মাসুদা সামাদ খান চৌধুরী	সদর	১৯৮৯-১৯৯৬
৮.	মোহতরমা মাকসুদা রহমান	সদর	১৯৯৭-২০০৪
৯.	মোহতরমা হোসনে আরা তাসাদ্দক	সদর	২০০৪-২০০৫
১০.	মোহতরমা ইশরাত জাহান	সদর	২০০৫-২০১২
১১.	মোহতরমা রওশন জাহান	সদর	২০১২-বর্তমান

* উপরোক্ত তালিকা মোহতরমা মাকসুদা রহমান সাহেবা হতে সংগৃহিত। যিনি ১৯৭১ সনে লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের সেক্রেটারী নাসেরাত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তিতে সদর নির্বাচিত হন।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া

প্র. খোদ্দামুল আহমদীয়া সংগঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলুন?
উ. হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর অনুমতিক্রমে ধর্মীয় চেতনায় উদ্ভাসিত একদল যুবকের মাধ্যমে ১৯৩৮ সনের ৩১ জানুয়ারি একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যার নাম হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ সনে 'মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া' রাখেন। এর অর্থ হচ্ছে আহমদী সেবকদের সংগঠন।
১৫ থেকে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত অধিকারী যুবকগণ এই মজলিসের সদস্য হয়ে থাকেন। মোহতরম শেখ মাহবুব আলম খালিদ এম.এ. এ সংগঠনের প্রথম আহ্বায়ক ছিলেন।

কিছুদিন পরই এক বছরের জন্য সর্বপ্রথম সদররূপে হুযূর (রা.) মোকাররম মাওলানা কমরউদ্দিন সাহেবকে অনুমোদন দান করেন। ১৯৩৮ *(১৩১৭ হি. শা) সনে হুযূর (রা.) মজলিস আতফালুল আহমদীয়া কায়েম করেন এবং এর সার্বিক তদারকি খোদ্দামুল আহমদীয়ার ওপর ন্যস্ত করেন। একজন মোহতামীম আতফাল কর্তৃক এ মজলিসের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

* (ইতোপূর্বে আমাদের প্রচলিত ভুল ধারনা ছিল আতফালুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা সাল ১৯৪০। সংশোধিত ১৯৩৮ সালের রেফারেন্স: www.alislam.org/majlis-atfal-ul-ahmadiyya/usa; www.atfal.org.uk; website: Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat/khuddam.in/atfal.)

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৮৯-৯০ পর্যন্ত সদর হিসেবে দায়িত্বপালনকারী বিশ্ব সদরদের নাম ও সময়কাল নিম্নে তুলে ধরা হল :

১) মোকাররম মাওলানা কমর উদ্দিন সাহেব: [১৯৩৮-১৯৩৯]।

২) হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (রাহে.): [১৯৩৯-৪০ থেকে ৩১ অক্টোবর ১৯৪৯]।

৩) সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.): [৩১ অক্টোবর ১৯৪৯-১৯৫৯-৬০] (এই সময় হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) ৩১ অক্টোবর ১৯৪৯-১৯৫৪ পর্যন্ত এবং মোকাররম মির্যা মনোয়ার আহমদ সাহেব ১৯৫৪-৫৫ থেকে ১৯৫৯-৬০ সন পর্যন্ত নায়েব সদর- ১ রূপে দায়িত্ব পালন করেন)।

৪) মোকাররম সৈয়দ মীর দাউদ আহমদ সাহেব: [১৯৬০-৬১ থেকে ১৯৬১-১৯৬২]।

৫) মোকাররম সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব: [১৯৬২-৬৩ থেকে ১৯৬৫-৬৬]।

৬) হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.): [১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৮-৬৯]।

৭) মোকাররম চৌধুরী হামিদ উল্লাহ সাহেব: [১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭২-৭৩]।

৮) মোকাররম আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব: [১৯৭৩-৭৪ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫] (তিনি সদররূপে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় ইসলাম প্রচারের জন্য এ সময় জাপান গমন করেন)।

৯) মোকাররম সাহেবযাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব: [ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮-৭৯]।

১০) মোকাররম মাহমুদ আহমদ, শাহেদ, বাঙালি: [১৯৭৯-৮০ থেকে ১৯৮৮-১৯৮৯ পর্যন্ত]।

এরপর হুযূর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কেন্দ্রীয় বিশ্ব সদর পদ বিলুপ্ত করে প্রত্যেক দেশে 'দেশীয় সদর' পদ কায়েম করেন। উল্লেখ্য সর্বশেষ বিশ্ব সদর মোহতরম মাহমুদ আহমদ বাঙালি সাহেব বাংলাদেশেরই কৃতী সন্তান।

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ায় ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জরূপে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

বঙ্গদেশে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া

অবিভক্ত বাংলায় ১৯৩৮ সনের ১৫ এপ্রিল মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের স্থানীয় মজলিস ১০৭টি, জেলা মজলিস ১৭টি ও রিজিওনাল মজলিস ৬টি।

বঙ্গদেশের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বর্তমান অবধি দায়িত্ব পালনকারী সংগঠন প্রধানদের নাম নিম্নে তুলে ধরা হল:

ক্রম.	নাম	পদবী	সময়কাল
১	মোহতরম সৈয়দ সাঈদ আহমদ	প্রথম প্রেসিডেন্ট	১৯৩৮-১৯৪০
২	মোহতরম ইসহাক লস্কর	প্রথম কায়েদ	১৯৪০*
৩	মোহতরম ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী	১ম রিজিওনাল কায়েদ	১৯৫৫-১৯৫৮
৪	মোহতরম শাহ মুহাম্মদ সোলায়মান	রিজিওনাল কায়েদ	১৯৫৮-১৯৬১
৫	মোহতরম আহমদ তৌফিক চৌধুরী	রিজিওনাল কায়েদ	১৯৬১-১৯৬৪
৬	মোহতরম অধ্যক্ষ মোসলেহ উদ্দিন খাদেম	রিজিওনাল কায়েদ-২	১৯৬৭-১৯৭২
৭	মোহতরম অধ্যাপক মুহাম্মদ আব্দুল খালেদ	রিজিওনাল কায়েদ-১	১৯৬৭-১৯৭২
৮	মোহতরম মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	প্রথম নায়েব সদর	১৯৭২-১৯৮০
৯	মোহতরম মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	নায়েব সদর-১	১৯৮০-১৯৮১
১০	মোহতরম মুহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্	নায়েব সদর-২	১৯৮০-১৯৮১
১১	মোহতরম মুহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্	প্রথম ন্যাশনাল কায়েদ	১৯৮১-১৯৮৬
১২	মোহতরম মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	ন্যাশনাল কায়েদ	১৯৮৬-১৯৮৯
১৩	মোহতরম মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	প্রথম দেশীয় সদর	১৯৮৯-১৯৯৩
১৪	মোহতরম কে. এম. মাহমুদুল হাসান	সদর	১৯৯৩-১৯৯৫
১৫	মোহতরম ডা. মুহাম্মদ সেলিম খান	সদর	১৯৯৫-২০০০
১৬	মোহতরম মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ	সদর	২০০০-২০০১
১৭	মোহতরম মাহবুবুর রহমান	সদর	২০০১-২০০৭
১৮	মোহতরম আবু নঈম আল মাহমুদ	সদর	২০০৭-২০১১
১৯	মোহতরম মুহাম্মদ আব্দুল মোমেন	সদর	২০১১-বর্তমান

* ১৯৪০-১৯৫৫ সন পর্যন্ত এ দেশের মজলিস কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

মজলিস আনসারুল্লাহ্

আনসারুল্লাহর পতাকা

প্র. মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখুন?

উ. সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ২৬ জুলাই ১৯৪০ সনে ৪০ বছর থেকে তদুর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য 'মজলিস আনসারুল্লাহ্' সংগঠন কায়েম করেন। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সাহায্যকারীদের সংগঠন। হযরত মাওলানা শের আলী (রা.) এ সংগঠনের প্রথম সদর ছিলেন। ১৯৪০ সন থেকে ১৯৮৯-৯০ পর্যন্ত মজলিস আনসারুল্লাহর বিশ্ব সদর হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী সংগঠন প্রধানদের নাম ও সময়কাল নিম্নে উল্লেখ করা হল:
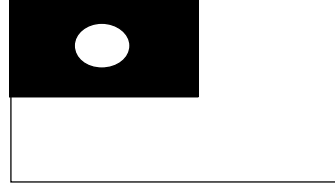
১) হযরত মাওলানা শের আলী সাহেব (রা.): [১৯৪০-১৯৪৭]।
২) হযরত চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল সাহেব (রা.): [১৯৪৭- নভেম্বর ১৯৫০]।
৩) হযরত সাহেবযাদা মির্যা আযিয আহমদ সাহেব: [নভেম্বর ১৯৫০-১৯৫৪]।
৪) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.): [১৯৫৪ - ১৯৫৮]।
(এ সময় হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) নায়েব সদররূপে দায়িত্ব পালন করেন)
৫) হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেব (রাহে.): [১৯৫৯-১৯৬৮]।
৬) মোকাররম সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব: [১৯৬৮-১৯৭৮]।
৭) হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.): [১৯৭৯-১৯৮২]।
৮) মোকাররম চৌধুরী হামিদ উল্লাহ সাহেব: [জুন ১৯৮২-১৯৮৯]।

১৯৮৯-৯০ ইং সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বিশ্ব সদর পদ বিলুপ্ত করে প্রত্যেক দেশে 'দেশীয় সদর' পদ সৃষ্টি করেন।

বঙ্গদেশে মজলিস আনসারুল্লাহ্

এ যাবত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ ১৯৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সে মোতাবেক তখন থেকে বর্তমান অবধি দায়িত্ব পালনকারী সংগঠন প্রধানদের নাম নিম্নে তুলে ধরা হল:

ক্র.	নাম	পদবী	সময়কাল
১	মোহতরম শামসুর রহমান, বার. এট 'ল	নাযেমে আলা	১৯৬৭-১৯৬৯
২	মোহতরম মকবুল আহমদ খান	নাযেমে আলা	১৯৬৯-১৯৭১
৩	মোহতরম এ.টি.এম. হক সাহেব	নাযেমে আলা	১৯৭১-১৯৭৩
৪	মোহতরম আলী কাশেম খান চৌধুরী	নাযেমে আলা	১৯৭৪-১৯৭৭
৫	মোহতরম ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া	নাযেমে আলা	১৯৭৭-১৯৮১
৬	মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ	নাযেমে আলা	১৯৮১-১৯৮২
৭	মোহতরম ওবায়দুর রহমান ভূঁইয়া	নাযেমে আলা	১৯৮২-
৮	মোহতরম ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী	নাযেমে আলা	১৯৮২-১৯৮৯
৯	মোহতরম ডা. আব্দুস সামাদ খান চৌধুরী	১ম দেশীয় সদর	১৯৮৯-১৯৯৩
১০	মোহতরম নজির আহমদ ভূঁইয়া	সদর	১৯৯৩-১৯৯৭
১১	মোহতরম তাসাদ্দক হোসেন	সদর	১৯৯৮-২০০১
১২	মোহতরম মোবাশশের উর রহমান	সদর	২০০১-২০০৩
১৩	মোহতরম আহমদ তবশীর চৌধুরী	সদর	২০০৩-২০০৯
১৪	মোহতরম মুহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্	সদর	২০০৯-বর্তমান

তথ্যসূত্র:

১) আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, লেখক: জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল।
২) দ্বীনি মা'লুমাত, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, পাকিস্তান।
৩) বাংলাদেশে আহমদীয়াত-১, লেখক : আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

দশম পরিচ্ছেদ

তুলনামূলক ধর্মীয় শিক্ষা

প্র. ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক কে?

উ. হযরত মূসা (আ.)। তিনি বনী ইসরাঈলদের বিখ্যাত নবী ছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর ৫০০ বছর পরে এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর ১৪০০ বছর পূর্বে তিনি আবির্ভূত হন।

প্র. হযরত মূসা (আ.) কোথায় আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদেশ পান?

উ. মিশরের 'সিনাই' পর্বতে।

প্র. 'সাব্বাত' কি?

উ. ইহুদীদের কাছে সপ্তাহের গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো শনিবার। শনিবারকে 'সাব্বাত' বলা হয়। 'সাব্বাত' অর্থ বিরতি বা বিশ্রাম।

প্র. ইহুদীদের জন্য হযরত মূসা (আ.) কী আসমানী কিতাব পেয়েছিলেন?

উ. ইহুদীদের জন্যে হযরত মূসা (আ.) তওরাত কিতাব পেয়েছিলেন। তওরাত অর্থ শিক্ষা।

প্র. ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুসা (আ.)-এর হাদীস গ্রন্থের নাম কী?

উ. তালমুদ ।

প্র. হযরত মূসা (আ.)-এর জন্মের সময় কে মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন?

উ. ফেরাউন দ্বিতীয় রামেসিস।

প্র. ফেরাউন সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. নীল নদের উপত্যকা ও আলেকজান্দ্রিয়ার তৎকালীন সম্রাটদের 'ফেরাউন' বলা হতো।

প্র. হযরত মূসা (আ.) কোন ফেরাউনের সময়ে মিশর থেকে হিজরত করেছিলেন?

উ. দ্বিতীয় মেরেনেপতাহ্ ফেরাউন-এর শাসনামলে হযরত মূসা (আ.) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর থেকে কেনানের উদ্দেশ্যে হিজরত করেন।

প্র. যখন হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা একত্রে মিশর হতে হিজরত করেছিলেন, তখন ফেরাউন মেরেনেপতাহ্ যে হযরত মূসা (আ.)-এর পিছু-পিছু যাচ্ছিল, তার কী পরিণতি ঘটেছিল?

উ. হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীরা যখন কেনানের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের পিছনে ধাবমান ফেরাউন সঙ্গী-সাথীসহ লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল। ফেরাউন নিজে সাগরে ডুবে মরেনি, বরং আল্লাহ তা'লার ইচ্ছানুযায়ী সে পরে মৃত্যুর শিকারে পরিণত হয়।

প্র. বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক কে? তিনি কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উ. হযরত সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ (আ.)। তিনি ৫৬৩ খ্রিষ্টপূর্বে ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী কপিলাবস্তু নগরের লুম্বিনী নামক স্থানে জন্মগ্রহন করেন। তিনি ৪৮৩ খ্রিস্টপূর্বে মারা যান।

প্র. বৌদ্ধ ধর্মের ধর্মগ্রন্থের নাম কি?

উ. ত্রিপিটক। এর অর্থ হল তিনটি ঝুড়ি। অর্থাৎ, এ পবিত্র গ্রন্থটি তিনটি গ্রন্থ– যথা বিনয় পিটক, সুত্তপিটক এবং অভিধম্ম পিটক-এর সমন্বয়ে গঠিত।

প্র. বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান দু'টি ফের্কার নাম কি?

উ. হীনযান ও মহাযান।

প্র. হযরত সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ (আ.) কি আল্লাহ্, রূহ, ফেরেশতা, কিয়ামত এবং পুনরুত্থান সম্বন্ধে বিশ্বাসী ছিলেন?

উ. হ্যাঁ, হযরত সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ (আ.) আল্লাহ্, রূহ, ফেরেশতা, কিয়ামত এবং পুনরুত্থান এর ওপর বিশ্বাসী ছিলেন।

প্র. যীশু খ্রিস্টের [হযরত ঈসা (আ.)] অনুসারীদের কী বলা হয়?

উ. খ্রিস্টান বলা হয়।

প্র. তাদেরকে খ্রিস্টান নাম কে দিয়েছিল?

উ. যীশুখ্রিস্ট মারা যাবার বহুদিন পর তারা নিজেদের জন্য খ্রিস্টান নাম পছন্দ করে।

প্র. যীশু কোথায় জন্মগ্রহন করেন?

উ. দু' হাজার বছর পূর্বে ফিলিস্তিনের নাযারাথ হতে সত্তর মাইল দূরে বেথেলহেমে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র. যীশুর পিতা সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. যীশুর কোন পিতা ছিল না। তিনি বিনা পিতায় আল্লাহ্র কুদরতে জন্মগ্রহণ করেন।

প্র. বিনা পিতায় কোন শিশুর জন্ম নেয়া কি সম্ভব?

উ. হ্যাঁ, বাইবেলে এ ধরনের ঘটনার বর্ণনা আছে। তাছাড়া বিনা পিতায় কিছু শিশুর জন্ম সম্ভব হয়েছে এ রকম প্রমাণ চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়ক সাময়িকীতে দেখা যায়, যদিও এটি খুবই দুর্লভ ঘটনা।

প্র. যীশু কি খোদার পুত্র ছিলেন?

উ. মুসলমানরা বিশ্বাস করে যীশু আল্লাহ্র নবী ছিলেন, আল্লাহ্র পুত্র ছিলেন না। আল্লাহ্র কোন পুত্র বা কন্যার প্রয়োজন নেই।

প্র. বাইবেলে কি কেবল যীশুর জন্যই 'খোদার পুত্র' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে?

উ. 'খোদার পুত্র' কথাটি বাইবেলে শুধুমাত্র যীশুর জন্য ব্যবহৃত হয়নি বরং অন্যান্যদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে এটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্র. বাইবেল থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিন যেখানে যীশু ছাড়া অন্য কারও জন্য 'খোদার পুত্র'

কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে।

উ. 'ইস্রায়েল আমার পুত্র, আমার প্রথম জাত।' (যাত্রাপুস্তক, ৪ : ২২)।

উ. যীশুর জন্ম তারিখ সম্বন্ধে কুরআন মজীদে কী বর্ণিত হয়েছে?

উ. যীশুর জন্ম সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনে কোন সুনির্দিষ্ট তারিখ বর্ণিত হয়নি। কিন্তু বলা হয়েছে, যীশু যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন জুড়েই নগরীতে খেজুর গাছে তাজা খেজুর পাওয়া যাচ্ছিল। এটা নির্দেশ করে যে, যীশু আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বরে কোন এক সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং ২৫ ডিসেম্বর যীশুর জন্মদিন নয়। যদিও সে দিনটি সারা পৃথিবীতে তাঁর জন্ম দিবস হিসেবে উদযাপিত হচ্ছে।

প্র. যীশু কি নতুন শরীয়ত এনেছিলেন?

উ. না, তিনি কোন নতুন শরীয়ত আনেননি। তিনি মূসায়ী শরীয়ত অনুসরণ করেছিলেন। যেমন তিনি বলেছেন, 'মনে করো না যে, আমি ব্যবস্থাকে লোপ করতে এসেছি; আমি লোপ করতে আসিনি, বরং পূর্ণ করতে এসেছি।' (মথি, ৫ : ১৭)

প্র. বেদ সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. বেদ হিন্দুদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। বেদের চারটি ভাগ, এ ভাগগুলোর নাম হল (১) ঋগ বেদ, (২) যজু বেদ, (৩) সাম বেদ, (৪) অথর্ব বেদ । এক সময়ে বেদ যখন বিশুদ্ধ অবস্থায় ছিল তখন তাতে হিন্দুদের জন্য ঐশী নির্দেশনা ছিল কিন্তু পরবর্তীতে বেদে এত প্রক্ষেপণ বা পরিবর্তন হয়েছে যে, এখন সেগুলোর বৈধতা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে।

প্র. কৃষ্ণ সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. তিনি হিন্দুদের একজন মহান অবতার বা নবী ছিলেন।

প্র. কে এ মর্মে ইলহাম পেয়েছিলেন, ''হে কৃষ্ণ রুদ্র গোপাল! তোমার মহিমা গীতায় লিপিবদ্ধ আছে''?

উ. প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) উর্দূতে এ ইলহাম পেয়েছিলেন। যেমন তিনি দাবি করেছেন, তিনি হিন্দুদের জন্য কৃষ্ণের মত একজন অবতার, মুসলমানদের জন্য প্রতিশ্রুতি মাহদী ও খ্রিস্টানদের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ্।

প্র. মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কয়েকটি বইয়ের নাম লিখুন যেগুলোতে তিনি বিশেষভাবে হিন্দুদের সম্বোধন করেছেন।

উ. ১) সুরমা চশমায়ে আরিয়া (উর্দূ)

২) আরিয়া ধরম (উর্দূ)

৩) শাহানায়ে হক (উর্দূ)

প্র. 'গ্রন্থ সাহেব' সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. গ্রন্থ সাহেব শিখদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। এটি গুরু নানকের বাণী ও বক্তৃতার সংকলন। এতে ইসলামের মৌলিক কর্তব্যসমূহ, যেমন: দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোযা, যাকাত এবং মক্কা গিয়ে হজ্জ পালন করার জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। যারা এ দায়িত্বসমূহ পালন

করতে ব্যর্থ হবে তাদের জন্য রয়েছে গুরু নানকের কঠোর তিরস্কার।

প্র. 'চোলা' সম্বন্ধে কি জানেন?

উ. 'চোলা' হল গুরুনানকের পবিত্র পোশাক। শিখেরা চোলাকে তাদের গুরুর পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে গণ্য করে। এ পোশাকে পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াত এবং ইসলামী কলেমা লিখিত আছে।

প্র. চোলাতে কী লিখিত ছিল তা দেখার জন্য হযরত আহমদ (আ.) কতজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন?

উ. হযরত আহমদ (আ.) চারজনকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন (১) হযরত মির্যা ইয়াকুব বেগ, (২) হযরত মুন্সী তাজউদ্দীন, (৩) হযরত খাজা কামাল উদ্দীন এবং (৪) হযরত মিঞা আব্দুর রহমান।

প্র. এ প্রতিনিধিরা কী বিবরণ দিয়েছিলেন?

উ. তাঁরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর নিকট বিবরণ দিয়েছেন যে, চোলায় কুরআনের ক্ষুদ্রতম সূরা ইখলাস, আয়াতুল কুরসী এবং সূরা আল্ ইমরানের ২০ নং আয়াত ও কলেমা লিখিত আছে।

প্র. হযরত আহমদ (আ.) কখন নিজে স্বয়ং চোলাটি দেখতে গিয়েছিলেন?

উ. ডেরা বাবা নানক নামক স্থানে হযরত আহমদ (আ.) নিজে স্বয়ং ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫ তারিখে চোলা দেখতে গিয়েছিলেন ।

প্র. হিন্দুরা গুরু নানকের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করেছিল তা খন্ডন করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন বই লিখেছিলেন?

উ. 'সৎ বচন' নামক বই লিখেছিলেন।

প্র. কেমন করে প্রমাণ করবেন যে, গুরু নানক একজন মুসলমান সাধক ছিলেন?

উ. শিখ ধর্ম গ্রন্থ হতে আমরা জানতে পারি বাবা নানক একদল মুসলিম সাধকদের সাথে সর্বদা থাকতেন এবং বিভিন্ন জায়গায় চিল্লায় (মুসলমানদের আধ্যাত্মিক শোধনপ্রণালী) গিয়েছিলেন। তিনি মুসলমানদের জামা'তে নামাযে যোগদান করতেন। এছাড়া তিনি মক্কায় গিয়ে হজ্জ করেছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে আহমদীয়াত

প্র. বাংলার মনস্তুষ্টি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি এবং এ ইলহাম অবতীর্ণ হবার তারিখ বলুন?
উ. হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ সনে এবং জুলাই ১৯০৬ সনে এ ইলহাম অবতীর্ণ হয়-

”پہلے بنگالہ کی نسبت جو کچھ حکم جاری کیا گیا تھا اب ان کی دل جوئی ہوگی۔“

(প্যাহলে বাঙ্গালা কি নিসবত জো কুছ হুকুম জারী কিয়া গিয়া থা আব উনকি দিলজুয়ি হোগি)
অর্থ: ইতোপূর্বে বাংলা সম্বন্ধে যে আদেশ জারী করা হয়েছিল এখন তাদের মনস্তুষ্টি করা হবে।
প্র. কোন দুইজন বাঙালি হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়াত করার মাধ্যমে সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন?
উ. (১) প্রথম বাঙালি আহমদী হলেন চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানা নিবাসী হযরত আহমদ কবীর নূর মুহাম্মদ (রা.), (২) বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার অন্তর্গত নাগেরগাঁও গ্রামের হযরত রইস উদ্দিন খান (রা.)।
প্র. প্রথম বাঙালি মহিলা আহমদীর নাম কি?
উ. হযরত সৈয়দা আজিজাতুন নেসা সাহেবা। স্বামী: হযরত রইস উদ্দিন খান (রা.)। এ পুণ্যাত্মা মহিলা ১৯০৭ সনে পত্রের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়াত নেন।
প্র. বাংলাদেশে আহমদীয়াতের বার্তা কিভাবে সর্বপ্রথম এসেছে?
উ. লাহোর থেকে কবিরাজ হযরত হেকিম মুহাম্মদ কুরাইশী সাহেব (রা.) 'মুফাররাহে আম্বারী' নামক এক কৌটা ঔষধ পার্সেল করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তৎকালীন প্রখ্যাত উকিল মুন্সি দৌলত আহমদ খান সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। হাকিম সাহেব সে ঔষধের কৌটার ভিতরে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আর্বিভূত হওয়া সর্ম্পকে কয়েকটি উর্দূ বিজ্ঞাপন পাঠান। আর এভাবে বাংলাদেশে আহমদীয়াতের বার্তা প্রবেশ করে।
প্র. "আপনার লেখার মধ্যে সাধুতা ও সৌভাগ্যের সুগন্ধ অনুভব করছি"– এ উক্তিটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন বাঙালি বুযূর্গকে সম্বোধন করে লিখেছিলেন?
উ. হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবকে।
প্র. হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব সর্ম্পকে কী জানেন?
উ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া নিবাসী পরম শ্রদ্ধেয় এ বুযূর্গ ১৯০২ সনে আহমদীয়াতের সংবাদ পান

এবং দীর্ঘদিন যাবৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে পত্রালাপ অব্যাহত রাখেন। অবশেষে তিনি ১৯১২ সনে ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ, কথোপকথন এবং দীর্ঘ সফর করার পর কাদিয়ানে এসে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পবিত্র হাতে বয়াত করার মাধ্যমে আহমদীয়াতের ছায়াতলে আশ্রয় নেন।
প্র. আঞ্জুমানে আহমদীয়ার যাত্রা বাংলাদেশে কখন থেকে শুরু হয় এবং কত সালে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ. হযরত মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব ১৯১২ সনে কাদিয়ান থেকে দেশে ফিরে এসে ২৫ নভেম্বর ১৯১২ সনে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক বয়াত নেয়া শুরু করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে অবিভক্ত বাংলার প্রথম আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা সাহেব জামা'তের প্রথম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৯১৬ সনে বঙ্গীয় আঞ্জুমানে আহমদীয়ার এমারত প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা সাহেব এমারত প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও আঞ্জুমানের প্রথম আমীর নিযুক্ত হন।
প্র. বাংলাদেশের প্রথম আহমদীয়া মসজিদের নাম কি? এটি কোথায় অবস্থিত?
উ. 'মসজিদুল মাহদী'। এটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মৌলভীপাড়ায় অবস্থিত।
প্র. অবিভক্ত বাংলায় সর্বপ্রথম সালানা জলসা কত সনে অনুষ্ঠিত হয়?
উ. ১৯১৭ সনের অক্টোবর মাসে (বাংলা আশ্বিন মাসে) ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সর্বপ্রথম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়।
প্র. বাংলার মাটিতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে সকল পুণ্যবান সাহাবীর পদধূলি পড়েছে তাদের মধ্যে থেকে পাঁচজনের নাম বলুন?
উ. ১) হযরত ডা. মুফতি মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.)।
২) হযরত মাওলানা চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাইয়াল (রা.)।
৩) হযরত মাওলানা সৈয়দ সারওয়ার শাহ সাহেব (রা.)।
৪) হযরত মাওলানা গোলাম রসূল রাজেকী (রা.)।
৫) হযরত মাওলানা হাফেয রওশন আলী (রা.)।
প্র. অবিভক্ত বাংলার প্রথম এমারতকালে কতজন লোক বয়াত করেন এবং কতটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়?
উ. ১৯১২-১৯২৩ সন পর্যন্ত যে সকল ব্যক্তি হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের হাতে বয়াত করে জামা'তে আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন সে রেজিস্টার অনুযায়ী বয়াতগ্রহণকারীর সংখ্যা হল ১০১৬ জন এবং এ সময়ে ২৬টি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়।
প্র. বাংলার প্রাচীনতম পত্রিকা "আহমদী" কখন থেকে প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়?
উ. ১৯২২ সনের জানুয়ারি মাসে 'আহমদীয়া বুলেটিন' নামে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এ পত্রিকা মাসিক এবং তারপর মাসিক থেকে আলহামদুলিল্লাহ্ আজ পর্যন্ত

পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন মোহতরম গোলাম সামদানী খাদেম সাহেব।

প্র. বাংলায় সর্বপ্রথম আহমদী মহিলারা কখন ঈদের নামায আদায় করেন?

উ. ১৯২২ সনে ঈদ-উল-আযহার নামায আদায় করেন।

প্র. কোন বাংলাদেশি আহমদী জার্মানীর প্রথম মোবাল্লেগ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন?

উ. বগুড়া জেলা নিবাসী মোহতরম খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী । তিনি ১৯০৯ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর পবিত্র হাতে বয়াত করেন। পরবর্তীতে তিনি ইসলামের সেবার জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেন এবং জার্মানীর প্রথম মোবাল্লেগ হবার সৌভাগ্যের অধিকারী হন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জুমানে আমদীয়ার পঞ্চম এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম আমীর হন।

প্র. ১৯২২ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কর্তৃক কুরআন শরীফের দরসের পরীক্ষায় কোন বাঙালি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন?

উ. প্রফেসর মোহতরম আব্দুল লতীফ খান সাহেব। তিনি বাংলার দ্বিতীয় আমীর ছিলেন।

প্র. কাদিয়ানে 'মিনারাতুল মসীহ্' নির্মাণে ১০০ বা ততোধিক টাকা চাঁদা প্রদানকারীর ২৯৮ জন সৌভাগ্যশালীদের মধ্যে একমাত্র বাঙালি কে ছিলেন?

উ. প্রফেসর মোহতরম আব্দুল লতীফ খান সাহেব।

প্র. হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যে সকল পবিত্র বংশধর বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন তাদের কয়েকজনের নাম লিখুন?

উ. ১) হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.)
২) হযরত সাহেবযাদা মির্যা জাফর আহমদ সাহেব
৩) হযরত সাহেবযাদা মির্যা মোবারক আহমদ সাহেব
৪) হযরত সাহেবযাদা মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) এবং,
৫) হযরত সাহেবযাদা মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) খিলাফতে আসীন হবার পূর্বে বাংলাদেশে আগমন করেছিলেন।

প্র. মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? মজলিসের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

উ. ১৯৩৮ সনের ১৫ এপ্রিল বাদ জুমু'আ মাওলানা জিল্লুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের ০৮ জন সদস্য নিয়ে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মজলিসের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন মোহতরম সৈয়দ সাঈদ আহমদ সাহেব।

প্র. মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ইজতেমা কত সনে অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৯৬২ সনের ০৫ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোকনাথ ট্যাংকের পাড়ে। এ ইজতেমায়

তৎকালীন বিশ্ব সদর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সাহেবযাদা মির্যা রফি আহমদ সাহেব যোগদান করেন।

প্র. মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের প্রথম কেন্দ্রীয় সম্মেলন কখন, কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

উ. ১৪ মে ১৯৭২ সনে দারুত তবলীগ মসজিদ কমপ্লেক্স, ঢাকায়।

প্র. বাংলাদেশের যে সকল কৃতী সন্তান বহির্বিশ্বে ইসলামের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদের কয়েকজনের নাম লিখুন?

উ. ১) মোহতরম সুফি মতিউর রহমান বাঙালি সাহেব।
২) মোহতরম আব্দুর রহমান খান বাঙালি সাহেব।
৩) মোহতরম খান সাহেব মৌলভী মোবারক আলী সাহেব।
৪) মোহতরম মাওলানা আনিসুর রহমান সাহেব।
৫) মোহতরম মাওলানা মাহমুদ আহমদ বাঙালি। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়া জামাতের ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জরূপে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।
৬) মোহতরম মাওলানা ফিরোজ আলম সাহেব। বর্তমানে তিনি লন্ডনে কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক দপ্তরের ইনচার্জরূপে দায়িত্ব পালন করছেন।
৭) মোহতরম মৌলভী আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেব। বর্তমানে তিনিও লন্ডনে কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক দপ্তরের দায়িত্ব পালন করছেন।

প্র. বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আহমদীয়াতের জন্য শাহাদাতবরণকারীদের নাম কী ? তারা কোন-কোন সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন?

উ. ১৯৬৩ সনের ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আহমদীয়া জামা'তের বার্ষিক জলসায় উগ্রপন্থী মোল্লাদের অতর্কিত আক্রমণে মোকাররম ওসমান গণী সাহেব এবং মোকাররম আব্দুর রহিম সাহেব মারাত্মকভাবে আহত হন এবং পরদিন ৪ঠা নভেম্বর সর্বপ্রথম মোহতরম ওসমান গণী সাহেব শাহাদাতের পেয়ালা পান করেন। তিনি বাংলাদেশের এবং মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের প্রথম শহীদ। তারপর মোহতরম আব্দুর রহিম সাহেব শাহাদাত বরণ করেন। তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশের প্রথম শহীদ হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন।

প্র. ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আহমদীয়া মসজিদ মোল্লারা কবে জোরপূর্বক দখল করে নেয়?

উ. ১৯৮৭ সনের ২৭ এপ্রিল।

প্র. মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া কোন বছর গোল্ডেন জুবিলী (৫০ বছর পূর্তি) পালন করে?

উ. ১৯৮৮ সনে।

প্র. বাংলাদেশে আহমদী শহীদদের নাম বলুন?

উ. ১৯৯৯ সনের ৮ অক্টোবর খুলনা 'দারুল ফযল' আহমদীয়া মসজিদে টাইম বোমা

বিস্ফোরণে সাতজন আহমদী শাহাদত বরণ করেন। এরা হলেন:
১) শহীদ ডা. আব্দুল মাজেদ সাহেব (৪২)।
২) শহীদ সোবহান আলী মোড়ল সাহেব (৬৫)।
৩) শহীদ জি.এম মহিবুল্লাহ সাহেব (৩৫)।
৪) শহীদ নূর উদ্দিন আহমদ সাহেব (৩০)।
৫) শহীদ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন সাহেব (২৪)।
৬) শহীদ জি.এম. আলী আকবর সাহেব (৩৯)।
৭) শহীদ জি.এম. মমতাজ উদ্দিন সাহেব (৫৫)।
এছাড়া শহীদ মোস্তফা আলী নান্নু সাহেব এবং শহীদ এ.টি.এম. হক সাহেব জামা'তী দায়িত্ব পালনকালে সড়ক দুর্ঘটনায় ১৯৯৫ সনের ২১ মে শাহাদাত বরণ করেন।
সর্বশেষ ২০০৩ সনের ৩১ অক্টোবর শুক্রবার ঝিকরগাছার রঘুনাথপুর বাগ গ্রামের স্থানীয় আহমদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট ও ইমাম মোকাররম শাহ্ আলম সাহেবকে প্রকাশ্য দিবালোকে পিটিয়ে শহীদ করা হয়।
প্র. দেশ বিভাগের সময় কাদিয়ানে অবস্থানকারী বাঙালি দরবেশদের নাম বলুন?
উ. ১) মোহতরম দরবেশ তৈয়ব আলী বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বর: ৪১)। তিনি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখনও জীবিত আছেন। বর্তমানে তিনি কাদিয়ানে বসবাস করছেন।
২) মোহতরম দরবেশ ওসমান আলী বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বরঃ ১৬৭)। তিনি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখনও জীবিত আছেন। বর্তমানে তিনি নারায়ণগঞ্জে বসবাস করছেন।
৩) মোহতরম দরবেশ ওবায়দুর রহমান ফানী বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বর: ১৬৮)।
৪) মোহতরম দরবেশ মোতহার আলী বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বরঃ ১৭০)।
৫) মোহতরম মাওলানা দরবেশ ওমর আলী বাঙালি সাহেব । (দরবেশ নম্বরঃ ১৭১)।
৬) মোহতরম দরবেশ আব্দুস সালাম বাঙালি সাহেব । (দরবেশ নম্বরঃ ১৭২)।
৭) মোহতরম দরবেশ আব্দুল মোতালেব বাঙালি সাহেব। (দরবেশ নম্বরঃ ১৭৩)।
[তারিখে আহমদীয়াত, খন্ডঃ ১০, প্রকাশকাল: ২০০৭, পৃঃ ৩৭১-৩৮৭]।
প্র. আহমদীয়া জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক কখন, কী উপলক্ষে কুরআন মজীদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়?
উ. আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষে ১৯৮৯ সনের জুন মাসে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় পবিত্র কুরআনের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়।
প্র. কত তারিখে বকশীবাজারস্থ আহমদীয়া জামা'তের কেন্দ্রীয় মসজিদ ও মিশন হাউস উগ্রপন্থী মোল্লাদের আক্রমণের শিকার হয়?
উ. ১৯৯২ সনের ২৯ অক্টোবর। এতে প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়।

ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত

প্র. কত তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মতো এমটিএ-এর মাধ্যমে নসীহতমূলক ভাষণ প্রদান করেন?
উ. ১৯৯৩ সনের ১০-১২ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের ৬৯তম সালানা জলসার তৃতীয় দিনে হুযূর রাবে (রাহে.) এমটিএ-এর মাধ্যমে জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে প্রথমবারের মত নসীহতমূলক ভাষণ দেন।
প্র. কত তারিখে সাত বছর মেয়াদী (শাহেদ কোর্স) জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশের শুভ উদ্বোধন হয়?
উ. ৩রা নভেম্বর ২০০৬ সনে।
প্র. খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ কর্তৃক কোন মসজিদ নির্মিত হয় এবং কত তারিখে উদ্বোধন করা হয়?
উ. ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লায় 'মসজিদ নূর'। ২০০৯ সনের ২২ মে এ মসজিদের উদ্বোধন হয়।
প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.) বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে কবে সর্বপ্রথম এমটিএ-তে ভাষণ প্রদান করেন?
উ. ২০০৯ সনের ১৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার বাংলাদেশ জামা'তের ৮৫তম সালানা জলসার তৃতীয় দিনের সমাপ্তি অধিবেশনে লন্ডন থেকে সরাসরি এমটিএ-এর মাধ্যমে ঈমান উদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেন।
প্র. জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশের বার্ষিক সাময়িকীর নাম কি?
উ. নূরুদ্দীন।
প্র. মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্রের নাম কি?
উ. মাসিক আহ্বান।
প্র. হুযূর আনোয়ার (আই.) বাংলা ভাষাভাষী লোকদের মাঝে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য এমটিএ-তে সরাসরি প্রশ্ন-উত্তর পূর্বক কোন অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ প্রদান করে দিয়েছেন?
উ. সত্যের সন্ধানে।
প্র. জামা'তে আহমদীয়া, বাংলাদেশ কর্তৃক কখন 'মাদ্রাসাতুল হিফযুল কুরআন'-এর শুভ উদ্বোধন হয়?
উ. ৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ সনে।
প্র. আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী পূর্তি (১৯১৩-২০১৩) অনুষ্ঠান কত তারিখে বা-জামাত তাহাজ্জুদের মাধ্যমে শুরু হয়?
উ. ২৫ নভেম্বর ২০১২ সনে।
প্র. মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ কোন বছর প্লাটিনাম জুবিলী (৭৫ বছর পূর্তি) উদযাপন করেছে ?

উ. ২০১৩ সালে।

তথ্যসূত্র :

১) আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী স্মরণিকা, আ.মু.জা. বাংলাদেশ।
২) বাংলাদেশে আহমদীয়াত ১ ও ২, লেখক : আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী।
৩) পূর্ব পাকিস্তানে আহমদীয়াত, বক্তৃতা : মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব।
৪) আহমদীয়াতের ইতিহাসে বাংলার স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, লেখক : মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা

বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন

স্বামী শোগান চন্দ্র ১৮৯৬ সনের ২৬, ২৭ এবং ২৮ ডিসেম্বর তারিখে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলোর এক সম্মেলনের প্রস্তাব করেন। সম্মেলনে প্রত্যেক বক্তাকে নিম্নের পাঁচটি মৌলিক প্রশ্নের উপর নিজ ধর্মীয় শিক্ষা অনুসারে বক্তব্য রাখতে বলা হয়-

১. মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা কী?

২. মানব জীবনের পারলৌকিক অবস্থা কী?

৩. ইহলোকে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কী এবং সেই উদ্দেশ্য কী উপায়ে অর্জিত হতে পারে?

৪. ইহলোকে ও পরলোকে মানব জীবনের কর্মের ফল কী?

৫. আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের উপায় কী?

এ বিখ্যাত সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে "ইসলামী উসূল কী ফিলাসফী" বা ইসলামী নীতি-দর্শন নামক প্রবন্ধ লিখেন এবং তা বিশ্বজুড়ে খ্যাতি লাভ করেছে। বহু ভাষায় প্রকাশিত হয়ে প্রবন্ধটি অনেক মানুষের হেদায়াতের কারণ হয়েছে এবং হতে থাকবে (ইনশাআল্লাহ)। লাহোরে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সিয়ালকোটি সাহেব (রা.)। শ্রোতারা পিনপতন নিস্তব্ধতায় গভীর মনোযোগের সাথে তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করেন। নির্ধারিত সময়ে বক্তৃতার প্রথম প্রশ্নের উত্তরও শেষ হয়নি। পরবর্তীতে শ্রোতাদের উপর্যুপরি অনুরোধের প্রেক্ষিতে সেই দিন বক্তৃতার সময় আরও বৃদ্ধি করা হয় এবং সম্মেলনের সময় আরও একদিন বর্ধিত করে সেই দিনও এ বক্তৃতার জন্য রাখা হয়। এ প্রবন্ধ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের নিদর্শন

মহাবিশ্বে লক্ষ-কোটি জ্যোতিষ্ক নিজ-নিজ কক্ষপথে প্রতিনিয়ত বিচরণ করছে। চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী এরূপ তিনটি জ্যোতিষ্ক যারা আমাদের সৌর পরিবারের অন্তর্গত। ঘূর্ণন পরিক্রমায় চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী যখন এক সরলরেখা বরাবর অবস্থান নেয়, তখনই চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয়। যখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে চাঁদ অবস্থান করে তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীর ওপর যে অঞ্চলে পড়ে সেখান থেকে সূর্যকে দেখা যায় না। একে বলে সূর্যগ্রহণ। আর যখন সূর্য ও চাঁদের মাঝে পৃথিবী অবস্থান নেয় তখন পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর

পড়ে। ফলে চাঁদকে দেখা যায় না। একে বলে চন্দ্রগ্রহণ। এক ব্যতিক্রমধর্মী চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ঘটেছিল ১৮৯৪-৯৫ সনে যথাক্রমে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে। এটি হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার এক জ্বলন্ত নিদর্শন হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে। এ সম্পর্কে হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, **"আমার মাহদীর সত্যতার এমন দু'টি লক্ষণ আছে-যা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি অন্য কারও সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ প্রদর্শিত হয়নি। (তা হলো) একই রমযান মাসে (চন্দ্রগ্রহণের নির্ধারিত রাতের) প্রথম রাতে চন্দ্রগ্রহণ হবে এবং (সূর্যগ্রহণের নির্ধারিত দিনের) মধ্যম দিনে সূর্যগ্রহণ হবে।"** (দারকুতনী, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮৮)।

সাধারণত একই আরবি মাসে চন্দ্রগ্রহণ-সূর্যগ্রহণ হলে এ দু'গ্রহণের মাঝে ব্যবধান থাকে ১৪ দিন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ একই রমযানে এ দু'টি গ্রহণের ব্যবধান হবে ১৫ দিন। আর এ গ্রহণের বৈশিষ্ট্য এতেই নিহিত। আঁ-হযরত (সা.)-এর উপরোক্ত মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে পূর্ব গোলার্ধে ইংরেজি ১৮৯৪ সনের ২১ মার্চে [তথা ১৩১১ হিজরির ১৩ রমযানে] সন্ধ্যা ৭:৩০ মি. থেকে রাত ৯:৩০মি. পর্যন্ত চন্দ্রগ্রহণ এবং ৬ এপ্রিল [২৮ রমযান] সকাল ৯:০০টা থেকে ১১:০০টা পর্যন্ত সূর্যগ্রহণের মাধ্যমে। ১৮৯৫ সনে পশ্চিম গোলার্ধে অনুরূপভাবে একই রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ঘটে।

কাসরে সলীব (ক্রুশ ধ্বংস) কনফারেন্স

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অন্যতম আরাধ্য কাজ ছিল ক্রুশ ধ্বংস করা। বাস্তবিকপক্ষেই তিনি (আ.) কুরআন, হাদীস, বাইবেল ও ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু প্রমাণ করে ক্রুশীয় বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত খ্রিস্টধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করে গেছেন। এ বিষয়ে জামা'তে আহমদীয়া ১৯৭৮ সনের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লন্ডনে এক কনফারেন্সের আয়োজন করে। এতে মুসলমান, ইহুদী ও খ্রিস্টধর্মের পন্ডিতরাও উপস্থিত ছিলেন। এ কনফারেন্সে বৃটিশ কন্সাল অব চার্চকে আমন্ত্রণ ও চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। ৪ঠা জুন কনফারেন্সের সমাপ্তি অধিবেশনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) অত্যন্ত সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর কাশ্মীরে হিজরত ও সেখানে মৃত্যুবরণ ইত্যাদি বিষয়ে কনফারেন্সে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ কনফারেন্সের ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা বিশ্বে আহমদীয়াত সম্বন্ধে বেশ আগ্রহের সৃষ্টি হয়-যার ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত বিরাজমান আছে।

স্পেনে ইসলাম- অতীত ও বর্তমান

৭১১ সনে মহাবীর তারিক বিন যিয়াদ ৭০০০ (মতান্তরে ৮০০০) সৈন্য নিয়ে স্পেনে অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানে স্পেনের রাজা রডারিক তাঁর বিরাট বাহিনীসহ পরাজিত হন এবং তিনি নিজে নিরুদ্দেশ হন। এভাবে স্পেনে মুসলিম সাম্রাজ্য কায়েম হয়। উমাইয়া বংশীয় মুসলিম বীর আব্দুর রহমানের শাসনামলে স্পেনে ব্যাপকভাবে সড়ক, সেতু, হাম্মামখানা, ইমারত ও মসজিদ নির্মাণ, পানি সরবরাহ প্রভৃতি জনহিতৈষী প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। বিখ্যাত কর্ডোভা মসজিদটি তিনিই নির্মাণ করেন। বস্তুত স্পেনে মুসলিম শাসনামল ছিল জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগ। এ প্রসঙ্গে যোসেফ হিল এর এ উক্তিটিই অধিক উপযুক্ত, যেমনটি তিনি বলেছেন,"ইউরোপের অন্ধকারে কর্ডোভা লাইট হাউসের মত আলো বিতরণ করছিল।" বিশ্বখ্যাত কর্ডাভা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছেই ছিল ৪ লক্ষ পুস্তকসমৃদ্ধ রাজকীয় লাইব্রেরী। ইউরোপসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে উচ্চ শিক্ষার জন্যে ছাত্ররা কর্ডোভায় ভীড় করতো। আত্মকলহের কারণে মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা শিথিল হতে আরম্ভ করে। এ সুযোগে খ্রিস্টানরা শক্তি সঞ্চয় করে মুসলমানদের উৎখাতের নানা প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। পরিশেষে ১৪৯২ সনের ২রা জানুয়ারি শেষ মুসলিম শাসক আবু আব্দুল্লাহ্‌র পরাজয়ের মাধ্যমে গ্রানাডা তথা স্পেনের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। গ্রানাডার পতনের পর অকল্পনীয় নির্যাতন চালিয়ে লক্ষ-লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করা হয় ও অমানবিক অত্যাচার করে জোরপূর্বক খ্রিস্টান বানানো হয়।

স্পেন থেকে উৎখাতের দীর্ঘদিন পরে আবার সেখানে ইসলামের শাশ্বত বাণী প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশক্রমে মোহতরম মাওলানা করম এলাহী জাফর সাহেব ১৯৪৫ সনে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের বার্তা নিয়ে স্পেন পৌঁছেন। সে সময় স্পেনে ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস ছাড়া অন্য সব ধর্মবিশ্বাসের প্রচারণা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই তাঁকে নানা বাধা-নিষেধের মাঝে প্রচারণা চালাতে হয়। এ সময় তিনি সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় করে জীবিকা চালান। ব্যবসায় অর্জিত লাভের অর্থে তিনি ১৯৪৮ সনে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) রচিত "ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা" পুস্তকটির ৩০০০ কপি ছাপেন। পরবর্তীতে "ইসলামী উসূল কি ফিলাসফী" বইটি স্পেনিশ ভাষায় প্রকাশ করেন, কিন্তু ক্যাথলিক চার্চের প্রতিবাদের কারণে এটির সব কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরবর্তীতে অনুমতি পেলে তিনি সর্বস্তরে বইটি ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। এভাবে ইসলামের মহাবীর জেনারেল এ পুণ্যাত্মা অবিরাম প্রচেষ্টা ও দোয়ার মাধ্যমে তাঁর কার্যক্রম চালিয়ে যান।

১৯৭০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) স্পেন সফরে যান। গ্রানাডায় আল্ হামরা হোটেলে অবস্থানকালে তাঁর ওপর ইলহাম হয়, **"যে আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর জন্য আল্লাহ্ যথেষ্ট। আল্লাহ্ নিশ্চয় তাঁর উদ্দেশ্য সফল**

করবেন। আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিসের জন্যই একটি উপায় নির্ধারণ করে রেখেছেন।" এরপর স্পেনে মসজিদের জন্য জমি খোঁজা হয় এবং ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে পেড্রোয়াবাদে মসজিদের জায়গা নির্ধারণ করা হয়। ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে কর্ডোভার পতনের সুদীর্ঘ ৭৪৪ বছর পরে ১৯৮০ সনের ৯ অক্টোবর তারিখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কর্ডোভায় 'মসজিদে বাশারত'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে ১৯৮২ সনের ১০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) স্পেনে ইসলামের পুনর্জাগরণের প্রতীক 'মসজিদে বাশারত' উদ্বোধন করেন। ১০ জন স্থপতি ৮ মাসের প্রচেষ্টায় এ মসজিদ নির্মাণ করেন। ইনশা'আল্লাহ্ সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন স্পেনে ইসলামের পতাকা আবার পত্‌পত্ করে উড়বে। (কে. এম. মাহমুদুল হাসান রচিত 'দেশে দেশে আহমদীয়াত' পুস্তক হতে সংকলিত ও সংক্ষেপিত)।

১১ এপ্রিল ২০১০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ভ্যালেন্সিয়া নামক স্থানে স্পেনের দ্বিতীয় আহমদীয়া মসজিদ 'বায়তুর রহমান'-এর ভিত্তি রাখেন এবং ৩রা এপ্রিল ২০১৩ সনে এর শুভ উদ্বোধন করেন।

মুসলিম ক্যালেন্ডার

"তারা তোমাকে নতুন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (হে নবী!) তুমি বল, এটা লোকদের (সাধারণ কাজের) জন্যে এবং হজ্জের জন্যে সময় নির্ণয়ের উপকরণ স্বরূপ।" (সূরা বাকারা: ১৯০)।

মুসলিম ক্যালেন্ডার চাঁদের পরিক্রমার ওপর নির্ভরশীল এবং সৌর বছরের তুলনায় ১১ দিনে কমে ৩৫৪ দিনে চান্দ্র বছর শেষ হয়। চান্দ্র বছরে (হিজরি কামরি) একটি নতুন চাঁদ হতে আরেক নতুন চাঁদ ওঠা পর্যন্ত সময়কে এক মাস বলে গণ্য করা হয়। চান্দ্র মাস তাই ২৯ বা ৩০ দিনে হয়। ধর্মীয় উৎসব বা দিনক্ষণ নির্ধারণে চাঁদ দেখা তাই গুরুত্বপূর্ণ। হিজরি কামরি সনের প্রবর্তন করেন হযরত উমর ফারুক (রা.)। বস্তুত ৬২২ খ্রিস্টাব্দে আঁ-হযরত (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের সময়কাল হতে হিজরি কামরি সন গণনা করা হয়ে থাকে।

হিজরি কামরি সনের অন্তর্ভুক্ত মাসগুলোর নাম:

মুহর্‌রম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানি, রজব, শা'বান, রমযান, শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ। এর মাঝে মুহার্‌রম, রজব, যিলকদ এবং যিলহজ্জ মাসকে পবিত্র মাস বলে গণ্য করা হয়। এ মাসগুলোতে যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বস্তুত ইসলাম সময় পরিমাপের জন্য চান্দ্র ও সৌর উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করে। যেখানে দিনের বিভিন্ন সময় নামায পড়ার হুকুম এসেছে সেখানে সময় গণনায় সৌর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার সময় নির্ধারণ এবং রমযান মাসে প্রতিদিন রোযা আরম্ভ করা ও সমাপ্ত করার ব্যাপারে সৌর পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। আবার যখন কোনও ধর্ম-কর্মের সম্পাদন, মাস বা মাসের অংশ-বিশেষের জন্য নির্ধারিত করা হয়, তখন চান্দ্র পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যথা: রোযা রাখার মাস বা হজ্জ পালনের তারিখ নির্ধারণে। অতএব ইসলাম উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করে, উভয় পদ্ধতিকেই ইসলামসম্মত মনে করা হয়।

খ্রিস্টিয় সৌর সনের সাথে হিজরি কামরি সনের সম্পর্ক:

ধরা যাক, স = খ্রিস্টীয় সৌর সন; ক = হিজরি সন,

তাহলে খ্রিস্টিয় সৌর সন ও হিজরি কামরি সনের সম্পর্ক নিম্নরূপ:

$$স = ক - \frac{৩ \times ক}{১০০} + ৬২২$$

$$ক = স + \frac{স - ৬২২}{৩২} - ৬২২$$

তাহলে খ্রিস্টীয় ১৯৮৩ সৌর সনের সমতুল্য হিজরি কামরি সন হল

$$ক = ১৯৮৩ + \frac{১৯৮৩ - ৬২২}{৩২} - ৬২২ \text{ (এখানে স = ১৯৮৩)}$$

= ১৯৮৩-৬২২+৪২ (পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে)

= ১৩৬১+৪২

= ১৪০৩ হিজরি কামরি

[Muslims Festivals and Ceremonies - Rashid Ahmad Chaudhury]

হিজরি শামসি (হিজরি সৌর) সন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে হিজরি শামসি সনের প্রবর্তন করেন যেন এ ইসলামী বর্ষপঞ্জী খ্রিস্টিয় সৌর বর্ষপঞ্জীর পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। হিজরি শামসি সনের মাসগুলোর নাম হলো:

১. সুলাহ্ (জানুয়ারি) : এ মাসে আঁ-হযরত (সা.) মক্কাবাসীদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি

স্থাপন করেন।

২. তবলীগ (ফেব্রুয়ারি) : ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হুযূর (সা.) এ মাসে বাদশাহ্দের নামে তবলীগি পত্র প্রেরণ করেন।

৩. আমান (মার্চ) : এ মাসে বিদায় হজ্জের সময় রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.) মানুষদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার ঘোষণা দেন।

৪. শাহাদত (এপ্রিল) : এ মাসে ইসলামের শত্রুরা ধোঁকাবাজি এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে 'রাজী' এবং 'বির মাউনা' নামকস্থানে ৭৭ জন সাহাবীকে শহীদ করে দেয়। এ দুই স্থানের অধিবাসীরা ইসলামী শিক্ষা লাভের জন্যে আঁ-হযরত (সা.)-এর কাছে মুয়াল্লিম (শিক্ষক) চেয়ে আবেদন করেছিল। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে হুযূর (সা.) এ সকল সাহাবাদের প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা সকল সাহাবাদের নির্মমভাবে শহীদ করে। বির মাউনায় শাহাদাতপ্রাপ্ত ৬৯ জন সাহাবী (রা.) কুরআন করিমের হাফিয ছিলেন। (দ্বীনি মা'লুমাত, ম.খো.আ.পাকিস্তান, পৃ.৫২)।

৫. হিজরত (মে) : এ মাসে আঁ-হযরত (সা.) প্রিয় জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন।

৬. ইহসান (জুন) : দয়ার সাগর নবী আকরাম (সা.) বানু ত্বাঈ-এর ইহুদীদের বিখ্যাত দানশীল হাতেম ত্বাঈ-এর সম্মানার্থে মুক্ত করে দেন।

৭. ওফা (জুলাই) : এ মাসে 'যাতুর রিকা'-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে দীর্ঘ সফর এবং যানবাহন কম থাকার জন্যে সাহাবীদের পা ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল। অনেকের পা থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল, তবুও সাহাবারা (রা.) সততা এবং বিশ্বস্ততার অনন্য, অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন।

৮. যহুর (আগস্ট) : এ মাসে আল্লাহ্ তা'লা মূতার যুদ্ধের মাধ্যমে আরবের বাইরে ইসলাম প্রচারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

৯. তাবুক (সেপ্টেম্বর) : এ মাসে তাবুক যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

১০. ইখা (অক্টোবর) : দু'জাহানের আশিস (সা.) এ মাসে মক্কার মুহাজির এবং মদীনার আনসারদের মাঝে মুয়াখাত (ভ্রাতৃত্ববন্ধন) স্থাপন করেন।

১১. নবুওয়ত (নভেম্বর) : এ মাসে আল্লাহ্ তা'লা আঁ-হযরত (সা.)-কে নবুওয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন।

১২. ফাতাহ্ (ডিসেম্বর) : এ মাসে মক্কা বিজয় হয় এবং হুযূর (সা.) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

খ্রিস্টিয় সন ও হিজরি শামসি সনের সম্পর্ক

খ্রিস্টিয় সৌর সন হতে ৬২১ বছর বাদ দিলে হিজরি শামসি সন পাওয়া যায়। ২০১৩ খ্রিস্টিয় সৌর সনের সমতুল্য হিজরি শামসি সন = ২০১৩-৬২১-= ১৩৯২ হি.শা।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর ইংল্যান্ডে হিজরত

১৯৭৪ সনে শাসনতান্ত্রিকভাবে পাকিস্তানে আহমদীদের 'নট-মুসলিম' ঘোষণা করার পরও যখন দেখা গেল, প্রকৃতপক্ষে জামা'তে আহমদীয়া ও এর খিলাফতের কোন ক্ষতি হয়নি, বরং এ জামা'ত তাদের ইসলাম প্রচারের কর্মসূচী নিয়ে যথারীতি এগিয়ে চলছে, তখন আহমদীদের বিরুদ্ধে মানবেতিহাসের বর্বরতম অর্ডিন্যান্সটি ২৪ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে জেনারেল জিয়াউল হক জারী করে। এ অর্ডিন্যান্সের বলে পাকিস্তান সরকার আহমদী মুসলমানদের ধর্ম-কর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, এমনকি তাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ও রীতি-নীতি অনুসরণের ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং এর বিরুদ্ধচারণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়। অবস্থা এমন দাঁড়ায়, আহমদীদের পক্ষে অ-আহমদীদের সামনে স্বাচ্ছন্দ্যে কথা-বার্তা বলাও বন্ধ হয়ে যায়। এসব কারণে বহু আহমদীকে শাস্তি দেয়া হয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে বহু মসজিদ ও ঘর-বাড়ি জালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হয়, নির্যাতন চালানো হয়, বহু হত্যাকান্ড সংঘটিত করা হয় এবং খোদা তা'লার খলীফাকে গ্রেফতার করার হীন ষড়যন্ত্র চালানো হয়। সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীনের পাসপোর্ট আটক এবং তাঁর বহির্দেশে গমন বন্ধ করার জন্যে আদেশ জারি করা হয়। কিন্তু আপন প্রিয় বান্দাদের জন্যে খায়রুল মাকেরীন–সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী খোদা তা'লার পরিকল্পনা অভাবনীয় হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও তা-ই হলো। সংক্ষেপে ঘটনাটি হচ্ছে:

জামা'তে আহমদীয়ার খলীফা যাতে দেশ থেকে বের হয়ে যেতে না পারেন সেজন্যে জেনারেল জিয়াউল হক নিজে এক ফরমান জারি করে। রাবওয়া শহর এবং এর আশেপাশে মিলিটারী ইনটেলিজেন্সসহ পাঁচটি গোয়েন্দা দল মোতায়েন করা হয়। হযরত আকদাস (রাহে.)-এর কোন ইচ্ছা ছিল না, তিনি কোন প্রকার বাহানার আশ্রয় নিয়ে দেশ থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু উসমান চীনি সাহেবসহ আরও কয়েকজন বুযূর্গ আহমদীর স্বপ্নের ভিত্তিতে তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে সব গোয়েন্দা দলের নাকের ডগার ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে করাচীর পথে রওনা হন। তিনি KLM বা ডাচ এয়ারলাইনাস-এর একটি প্রাইভেট রুমে অপেক্ষা করতে থাকেন। ইতোমধ্যে জেনারেল জিয়াউল হকের সেই কঠোর ফরমান পৌঁছে যায় দেশের সব স্থানে, সব স্টেশন-বন্দরে, সব সীমান্ত চেকপোস্টে এবং সব বিমানবন্দরে। জেনারেল জিয়ার হুকুম পেয়ে করাচী বিমানবন্দরে KLM বিমানটিকে বিলম্ব করানো হয় এবং অতি সতর্কতার সাথে চেক করা হয়। এক ঘন্টা পরে উড্ডয়নের অনুমতি দেয়া হয় এবং KLM বিমানটি হুযূর (রাহে.) এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ইউরোপের পথে যাত্রা করে। কঠোর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও করাচী বিমানবন্দরে আহমদীয়া জামা'তের খলীফাকে কেন আটক করা হলো না, তদন্তকালে এ ঘটনার রহস্য উন্মোচিত হয়। দেখা গেল জেনারেল জিয়াউল হক তার প্রদত্ত ফরমানে

মির্যা তাহের আহমদ লিখতে গিয়ে ভুল করে লিখেছে 'মির্যা নাসের আহমদ'। কত সূক্ষ্ম ও কত বিচিত্র খোদা তা'লার পরিকল্পনা! (শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব প্রণীত 'ইসলামে খিলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ' পুস্তকাবলম্বনে)।

KLM বিমানটি হল্যান্ডের আমস্টার্ডামে পৌঁছার পর হুযূর (রাহে.) লন্ডনের পরবর্তী ফ্লাইটেই লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। হুযূর (রাহে.) দুপুর ১২:৩০ মিনিটে লন্ডন মসজিদে পৌঁছেন। সেখানে প্রায় ৩০০ জন আহমদী হুযূর (রাহে.)-কে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয় খলীফাকে অশুভ চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন।

আহমদীয়া জামা'তের শতবার্ষিকী জুবিলী

১৯৩৯ সনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপনের প্রাক্কালে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আশা প্রকাশ করেছিলেন, জামা'তে আহমদীয়া ১৯৮৯ সনে প্রথম একশ' বছর পূর্তি অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করবে। হুযূর (রা.)-এর এ পবিত্র ইচ্ছার প্রেক্ষিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৭৩ সনে রাবওয়ার সালানা জলসায় শতবার্ষিকী জুবিলী উদযাপন উপলক্ষ্যে ব্যাপক আধ্যাত্মিক ও পার্থিব পরিকল্পনা জামা'তের সামনে উপস্থাপন করেন। মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া জামা'তের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে সব প্রোগ্রাম সাফল্যমন্ডিত করে তোলে। এসব প্রোগ্রামের উল্লেখ্যযোগ্য হলো, আল্লাহ্ তা'লার হামদ এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, সদকা, কুরবানী এবং দান-খয়রাত, ইজতেমায়ী
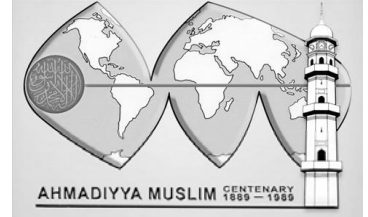
দ্রষ্টব্য: মূল ছবি রঙিন

দোয়া, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার তৎপরতা সম্পর্কিত প্রদর্শনী, প্রামাণ্য ভিডিও অনুষ্ঠান এবং বিশেষ জলসার ব্যবস্থা, শতাধিক ভাষায় কুরআন মজীদের আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ, শতাধিক ভাষায় নির্বাচিত হাদীসের অনুবাদ প্রকাশ, ব্যাপকভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লিখিত পুস্তকাবলী ও অন্যান্য ইসলামী সাহিত্যের প্রকাশনা, পৃথিবীতে এক লক্ষ মসজিদ নির্মাণ, গরিবদের জন্য গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার সম্প্রসারণ, এতীমদের প্রতিপালনসহ বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজকর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, অনেকগুলো নতুন দেশসহ প্রায় ১২০টি দেশে আহমদীয়াতের মিশন প্রতিষ্ঠা, প্রেস ও মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা এবং আলোকসজ্জা, পতাকা উত্তোলন, শিশুদের জন্য মিষ্টি বিতরণ, খেলাধুলা ও পি.টি. প্রদর্শন ইত্যাদি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন, **আহমদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব**

মূলত একটি নতুন অঙ্গীকার– যার মাধ্যমে আমরা আসন্ন দ্বিতীয় শতকে আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাসমূহকে দ্বিগুণ করতে এবং সকল ধর্মের ওপর ইসলামের মহাবিজয় ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সর্বপ্রকার ত্যাগ ও কুরবানী করার জন্যে সংকল্প গ্রহণ করব যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আহমদীয়াতের তৃতীয় শতাব্দীতে ইসলামের বিশ্ববিজয়ের জন্য আমাদের সুমহান লক্ষ্য সুনিশ্চিতভাবে অর্জিত হতে পারে। (জুম'আর খুতবা, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ ইং)।

আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী জুবিলী

আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর মহান রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুওয়াত– অর্থাৎ, নবুওয়াতের পদ্ধতিতে ঐশী খিলাফত ব্যবস্থা ১৯০৮ সনের ২৭ মে তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত হাফেয হাজীউল হারামাঈন শারীফাঈন হেকিম মাওলানা নূরুদ্দীন (রা.)-এর খলীফা নির্বাচনের মাধ্যমে খিলাফতের যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল– তা ২০০৮ সনের ২৭ মে তারিখে শতবর্ষে পদার্পণ করে। জাতীয় জীবনে কত ক্রান্তিলগ্ন এসে থাকে। এগুলোকে স্মরণীয়-বরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে পার্থিব ও ঐশী উভয় সংগঠনই বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। নিঃসন্দেহে ২০০৮ সনের ২৭ মে এ ঐশী জামা'তের একটি পরমলগ্ন। এ লগ্নকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে আমাদের বর্তমান প্রিয় খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ২০০৫ সনের ২৭ মে তারিখের খুতবায় আহমদীয়া খিলাফতের শতবার্ষিকী জুবিলী উৎসব পালন করার ঘোষণা দেন।
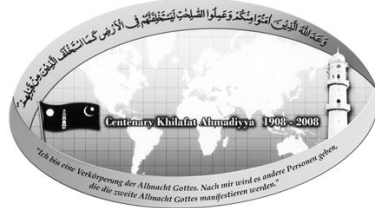
দ্রষ্টব্য: মূল ছবি রঙিন

পার্থিব লোকেরা তাদের উৎসবের দিনগুলো নিছক আনন্দ-ফূর্তি ও ভোগ বিলাসে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু ঐশী জামা'তের বেলায় তা একেবারে ভিন্নধর্মী। আমাদের প্রিয় ইমাম শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলী পালনের ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি বরং তিনি এ কার্যক্রমের রূপরেখাও ঘোষণা করে দিয়েছেন এবং জামা'ত এর ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিল। সারা বছর ধরে এ কর্মকাণ্ড চলেছে। ২০০৮ সনের ২৭ মে থেকে এ উৎসব শুরু হয়েছিল এবং ২০০৮ সনের কাদিয়ান জলসার মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ২০০৮ সনের ২৭ মে বিশ্বের সকল আহমদীরা বা-জামা'ত তাহাজ্জুদের মাধ্যমে নতুন

শতাব্দীতে পদার্পণ করে। বিশ্বের সকল জামা'ত খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী অনুষ্ঠান মহাসমারোহে উদযাপন করে। এদিন সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং ঈমান উদ্দীপক বিষয় ছিল, সৈয়দনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের এক্সেল সেন্টার থেকে হৃদয়গ্রাহী, তেজোদ্দীপ্ত এবং আগামী দিনের আহমদীয়াতের স্বর্ণালী ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আবেগ-উদ্বেলিত ভাষণ। হুযূর (আই.) তাঁর বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে বিশ্বের সকল আহমদীর কাছ থেকে ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রচার, প্রসার, সংরক্ষণ ও হেফাযতের ব্যাপারে দৃঢ় ও শক্তিশালী অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। নতুন রঙে রঙিন হয় সকল আহমদীর প্রাণ; সঞ্জীবিত হয় সকল আহমদীর ঈমান। যাত্রা শুরু হয় নতুন পথ চলা।

এছাড়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী কর্মসূচীর অনেকটা জুড়েই ছিল আপামর আহমদী সদস্য-সদস্যাগণ কর্তৃক আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দোয়া-দুরূদ, ইস্তিগফার পাঠ, নফল রোযা পালন ও নামায আদায় এবং বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কুরবানী এবং পশু কুরবানী দান। এছাড়াও ছিল বিগত একশ বছরে খিলাফতের বিস্তারিত কর্মকান্ড ও এর ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশ, বিভিন্ন ভাষায় কুরআন অনুবাদ ও প্রকাশ এবং ইসলামী সাহিত্যে জামা'তের অবদানসূচক জামা'তী প্রকাশনার বিপুল সমাহার। বিশ্বব্যাপী জামা'তের কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত এ কর্মসূচী সারা বছর ধরে চলতে থাকে। সত্যিকার অর্থে এ কর্মসূচীর একটা অংশ– অর্থাৎ, দোয়া-দুরূদের আধ্যাত্মিক অংশ হুযূর (আই.)-এর ঘোষণার পরপরই চালু হয়ে গিয়েছিল। এটা ঐশী জামা'তের কর্মসূচী এবং আল্লাহ্র খলীফা কর্তৃক এর ঘোষণা করা হয়েছিল। সুতরাং এর সফলতার ব্যাপারে এক বিন্দু পরিমাণ সন্দেহেরও অবকাশ ছিল না এবং থাকার কথাও নয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের শতবার্ষিকী জুবিলী

আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে বাংলাদেশ সেই পরম সৌভাগ্যের অধিকারী দেশ– যারা শেষ যুগে আগত মসীহ্ ও মাহদীক মেনে সর্বপ্রথম কোন জাতি হিসেবে শতবার্ষিকী উদযাপন করছে। আজ থেকে একশত বছর পূর্বে ১৯১২ সালের ২৫ নভেম্বর বাংলার সবুজ-শ্যামল এক মনোরোম জেলা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের পবিত্র হাতে জামা'তে আহমদীয়ার কার্যক্রমের ভিত রচিত হয়। যদিও ১৯০২ সনের দিকেই বাংলাদেশে আহমদীয়াতের বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল এবং দুইজন সাহাবী মসীহ্

দ্রষ্টব্য: মূল ছবি রঙিন

মাওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়াত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু সেই সময় আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯১৩ সালে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত গঠিত হয়। সেই অমর স্মৃতিকে চির জাগরূক রাখার লক্ষ্যে হুযূর আনোয়ার (আই.) আমাদেরকে শতবার্ষিকী উদযাপনের অনুমতি প্রদান করে চির কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। (জাযাকুমুল্লাহ্ আহসানাল জাযা)।

শতবার্ষিকী জুবিলী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশে আহমদীয়া জামা'তের পথিকৃৎ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার হযরত মাওলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব মরহুমের বসতবাড়ি সংলগ্ন মসজিদুল মাহদীতে ২৫ নভেম্বর ২০১২ তারিখ ভোর রাতে বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ ও ফজর নামায, দরসুল কুরআন ও ইজতেমায়ী দোয়ার রূহানী কর্মসূচী পালন করা হয়। এরপর মরহুমের কবর জিয়ারত করা হয়। তারপর মোহতরম মোবাশ্শেরউর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ শতবার্ষিকী জুবিলীর লোগো উন্মোচন করেন। এরপর সকাল ১১ টায় মসজিদুল মাহদী প্রাঙ্গনে এক জনাকীর্ণ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া শতবার্ষিকী জুবিলী বছরের প্রথম কার্যক্রম হিসেবে সকল স্থানীয় জামাতে একযোগে ৪ঠা জানুয়ারি ২০১৩ তারিখ শুক্রবার দিবাগত রাতে বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ আদায়, ফজর নামায, ইজতেমায়ী দোয়া এবং মিষ্টি বিতরণের পর খাসি সদকা করা হয়। এছাড়া দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আপ্যায়ন করে সুধী সমাবেশ/সংবর্ধনা সভার আয়োজনও করা হয়। এছাড়া শতবার্ষিকী জুবিলী উপলক্ষ্যে হুযূর (আই.) নির্দেশিত আধ্যাত্মিক কর্মসূচী যথা সাপ্তাহিক রোযা, প্রতিদিন নফল নামায ও দোয়ার অজিফা সর্বান্তকরণে জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যগণ আদায় করার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশ জামা'তের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ক্রোড়া জামা'তে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সনে স্মারক মসজিদের ভিত্তি রাখা হয়।

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৭৫ বর্ষ পূর্তি উদযাপন

১৯৩৮ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া হযরত খলীফতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পবিত্র হাতে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সন ছিল মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশ্বব্যাপী ৭৫ বছর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের বছর। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও জাগতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে এই জুবিলী উদযাপিত হয়েছে। মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ যেহেতু ১৯৩৮ সনের ১৫ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই বাংলাদেশ মজলিসও একই সাথে দুটি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীই মহান আল্লাহ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করেছে। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় এবং সকল স্থানীয় মজলিসগুলোতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ও ১৫

এপ্রিল বা-জামা'ত তাহাজ্জুদ নামায আদায়, খাসি সদকা, পতাকা উত্তোলন, মিষ্টি বিতরণ এবং আলোকসজ্জা করা হয়। এছাড়া হুযূর (আই.) কর্তৃক সদয় অনুমোদন অনুসারে মাহীগঞ্জ জামা'তে প্লাটিনাম জুবিলী স্মারক মসজিদ নির্মাণ, 'ইসলামী ইবাদত ও দ্বীনি মা'লুমাত' পুস্তক প্রকাশ এবং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল।

লোগো: মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের ৭৫ বর্ষ পূর্তি উদযাপন।

কুরআন মজীদে বর্ণিত কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণী

কুরআন মজীদে অনেক ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ আছে। এর মাঝে অল্প কয়েকটি মাত্র এখানে বর্ণিত হলো:-

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ﴿۱۰﴾

(হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিলহুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লি ইউযহিরাহু আলাদ্দীনি কুল্লিহী ওয়া লাও কারিহাল মুশরিকুন)।

(১) অর্থ: তিনিই (আল্লাহ্) তাঁর রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন যেন তিনি একে সব ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করে দেন, মুশরিকরা যতই অসন্তুষ্ট হোক না কেন। (সূরা আস্ সাফ্: ১০) তফসীরকারকদের অধিকাংশই এ বিষয়ে একমত, ইসলামের এ বিশ্ববিজয় প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সময়ে ঘটবে।

(২) অনেক পন্ডিতের মতে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মক্কা হতে হিজরত করার সময়ে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

اِنَّ الَّذِيْ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لَرَآدُّكَ اِلٰى مَعَادٍ

(ইন্নাল্লাযী ফারাযা আ'লায়কাল কুরআনা লারাদ্দুকা ইলা মা'আদিন্)

অর্থ: নিশ্চয় যিনি তোমার ওপর কুরআনকে ফরয করেছেন, তিনিই তোমাকে প্রত্যাবর্তনস্থলে পুনরায় ফিরিয়ে আনবেন। (সূরা আল্ কাসাস: ৮৬)। স্পষ্টত এখানে বলা হয়েছে, মক্কা হতে হিজরত করে নবী করিম (সা.) পুনরায় বিজয়ীর বেশে মক্কায় ফিরে আসবেন।

(৩) اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝

(ইক্তারাবাতিস্ সা'আতু ওয়ান শাক্কাল ক্বামারু)

অর্থ: নির্দিষ্ট মুহূর্ত নিকটবর্তী হলো এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হলো। (সূরা আল কামার: ২)। চন্দ্র ছিল আরব শক্তির প্রতীক আর চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার অর্থ আরব শক্তির মূলোৎপাটিত হয়ে যাওয়া। এ আয়াত মক্কায় সেই সময়ে অবতীর্ণ হয় যখন আঁ-হযরত (সা.) এবং সাহাবা কেরাম (রা.) কাফিরদের দ্বারা চরমভাবে নিগৃহীত আর অত্যাচারিত হচ্ছিলেন। আয়াতটিতে বলা হয়েছে, একদিন আরবের অবিশ্বাসী শক্তি পরাভূত হবে। একদিন মানুষ চাঁদে পৌঁছাবে এ ভবিষ্যদ্বাণীও অত্র আয়াতে নিহিত আছে।

(৪) মক্কায় যখন আঁ-হযরত (সা.) এবং সাহাবা কেরাম (রা.) কঠিন দিন অতিবাহিত করছিলেন তখন পার্শিদের হাতে রোমানরা অপমানজনক পরাজয় বরণ করে। এ সময় নিম্নের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়:

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ

(গুলিবাতির রূম, ফি আদনাল আরযি ওয়া হুম মিম্ বা'দি গালাবিহিম সাইয়াগ্লিবুন, ফি বিয'ই সিনীন)।

অর্থ: রোমানরা পরাজিত হয়েছে নিকটবর্তী দেশে। আর তারা তাদের পরাজয়ের পর অচিরেই বিজয়ী হবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। (সূরা আররূম: ৩-৫)। আরবি বিয'উন শব্দে সাধারণত ৩ হতে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো বুঝায়। ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে এ আয়াত নাযিল হয় আর ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের হাতে মক্কার কোরাইশদের শৌর্য-বীর্য ভূলুণ্ঠিত হওয়ার বছরে, রোমানরা পার্শিদের বিরুদ্ধে বিরাট বিজয় লাভ করে।

(৫) পবিত্র কুরআনের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী– যা ১৩০০ বছর পরে পূর্ণতা লাভ করেছে, তা হলো:

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۝ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝

(মারাজাল বাহরায়নি ইয়ালতাক্বিয়ান। বায়নাহুমা বারযাখুল্ লা ইয়াবগিয়ান। ইয়াখরুজু মিন্হুমাল্ লু'লুউ ওয়াল মারজান। ওয়া লাহুল জাওয়ারিল মুনশাআতু ফিল বাহরি কাল আ'লাম)।

অর্থ: তিনি দু'টি সমুদ্রকে এমনভাবে প্রবাহিত করেছেন যে (এক সময়ে) উভয়ে মিলিত হবে। (বর্তমানে) উভয়ের মাঝে এক প্রতিবন্ধক আছে (যদ্দরুন) এ দু'টি একে অপরের মাঝে প্রবেশ করতে পারে না। ... উভয় (সমুদ্র) হতে মুক্তা এবং প্রবাল বের হয়। ... এবং সমুদ্র বক্ষে পর্বতের ন্যায় সুউচ্চ দ্রুতগামী জাহাজগুলো তাঁরই। (সূরা আর্ রহমান : ২০, ২১, ২৩, ২৫)। আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে এরা মিলিত হবে আর পর্বতসদৃশ সুউচ্চ নৌযানগুলো এদের মিলনপথ দিয়ে যাতায়াত করবে। বর্তমানে সুয়েজ খাল ভূ-মধ্যসাগরকে লোহিত সাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে আর পানামা খাল প্রশান্ত মহাসাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে। গত শতাব্দীতে এ খালগুলো খননের মাধ্যমে আলোচ্য আয়াতসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্ট দিবালোকের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করেছে।

(হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) কর্তৃক প্রণীত Intorduction to the study of the Holy Quran অবলম্বনে)।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ তাহরীক (ঘোষণা)

নেযামে ওসীয়্যত (ওসীয়্যত ব্যবস্থা)

এমন এক সময় ছিল যখন ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রে এত ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়নি। শিল্প-বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির ফলে ধনী এবং দরিদ্রের মাঝে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উন্নত-অনুন্নত দেশগুলোর বর্তমান কালের বৈষয়িক প্রগতি এবং ধনবৈষম্যের জটিল সমস্যাবলী সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির কোন-কোন মৌলিক বিষয়– যেমন- যাকাত, সদকা, আয়-ব্যয়জনিত অনুশাসন ইত্যাদি ছাড়াও মিল্লাতে ইসলামীয়া বা মুসলিম সমাজকে আরও অধিকতর কুরবানী করতে হবে। আমরা অধিকতর কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ না হলে আমাদের নিজেদেরই সর্বনাশ ত্বরান্বিত হবে। কুরআন করিমে সূরা বাকারায় বলা হয়েছেঃ

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَ اَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ۝

(ওয়া আনফিকু ফী সাবীলিল্লাহি ওয়ালা তুলকু বিআয়দিকুম ইলাত্ তাহ্লুকাহ্ ওয়া আহসিনু ইন্নাল্লাহা ইয়ুহিব্বুল মুহ্সিনীন)

অর্থ: "এবং তোমরা আল্লাহ্র পথে খরচ কর এবং তোমরা স্বহস্তে নিজেদেরকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করো না। আর তোমরা সৎকর্ম কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদেরকে পছন্দ করেন।" (সূরা বাকারাঃ ১৯৬)। আল্লাহ্র পথে কতটুকু এবং কীভাবে খরচ করতে হবে, কতটুকু কুরবানী করতে হবে তা হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেও এবং ইসলামের খলীফাগণ প্রয়োজন অনুযায়ী ঘোষণা করতেন। অনুরক্ত এবং খোদাভক্ত মুসলিম সমাজ এ ধরনের ঘোষণার প্রতি অকম্পিত হৃদয়ে, অকৃপণ হস্তে সর্বস্ব দিয়ে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কুরবানীর এ স্পৃহার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান গণী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন আওফ (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ। তারা কুরবানীর যে আদর্শ রেখে গেছেন তা যেমন নজিরবিহীন তেমনি বাস্তবধর্মী। বর্তমান যুগে কুরবানীর এক মহান উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক 'নেযামে ওসীয়্যত' কায়েম করা হয়েছে। বর্তমান যুগের ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যুগের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৫ সনে তাঁর 'আল ওসীয়্যত' নামক পুস্তকে ঘোষণা করেছেন, **"যারা প্রকৃত কল্যাণ কামনা করে তারা যেন নিজস্ব ধন-সম্পত্তির কমপক্ষে এক-দশমাংশ (দশ ভাগের এক ভাগ) হতে সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ (তিন ভাগের এক ভাগ) পর্যন্ত ইসলামী খিলাফতের সংগঠনের নামে ওসীয়্যত বা উইল করে দেয়। এ উইলকৃত অর্থ ইসলাম প্রচার, মৌলিক অভাব মোচন এবং অন্যান্য কল্যাণকর কাজে ব্যয় করা হবে।"** এ ওসীয়্যত ব্যবস্থার ফলে ইসলামী সংগঠন বা খিলাফতের কর্তৃত্বাধীনে ক্রমে-ক্রমে যথেষ্ট ধন-সম্পত্তি সংগৃহীত হবে, কোন প্রকার মনোকষ্টের সৃষ্টি হবে না, স্বাধীনতা খর্ব হবে না এবং এর মাধ্যমে খিলাফতের কর্তৃত্বাধীনে ধন-বৈষম্য দূর করার জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হতে থাকবে। এ অর্থের দ্বারা ধনী-দরিদ্রের চরম বৈষম্য দূর করা সম্ভব হবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) ২০০৫ সনের ২৭ মে খুতবা দিতে গিয়ে তাহরীক করেন যেন ২০০৮ সনের মধ্যে জামা'তের চাঁদাদাতা সদস্যগণের অর্ধেক নেযামে ওসীয়্যতের অন্তর্ভুক্ত হন। আলহামদুলিল্লাহ্, অনেক জামা'ত হুযূর (আই.)-এর এ তাহরীক মোতাবেক নেযামে ওসীয়্যতে শামিল হয়েছে।

তাহরীকে জাদীদ (নতুন ঘোষণা)

১৯৩৪ সনে যখন জামা'তে আহরার ও অন্যান্য বিরুদ্ধবাদী শক্তি কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খুলে নেয়ার ঘোষণা দেয় এবং দুনিয়া হতে আহমদীয়াতকে মিটিয়ে দেয়ার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় তখন তাদের এ মিথ্যা অহমিকাকে ধূলিসাৎ করে দিতে ঐশী ইঙ্গিতে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাহরীকে জাদীদের ঘোষণা দেন। হুযূর (রা.) তাঁর খুতবাসমূহে তাহরীকে জাদীদের ২৭টি মোতালেবাত (দাবি) পেশ করেন, যথাঃ (১) সরল জীবন যাপন করা, এ উদ্দেশ্যে (ক) এক খাদ্য ও এক তরকারি ব্যবহার করা (বাঙালিদের জন্য এর অতিরিক্ত হিসাবে ডাল ব্যবহার করার অনুমতি আছে) (খ) পোশাক পরিচ্ছদ যথাসম্ভব কম ক্রয় বা প্রস্তুত করা, (গ) মহিলাদের নতুন অলংকার প্রস্তুত বা লেসফিতা, ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় বিলাসসামগ্রী ক্রয় করা হতে বিরত থাকা, (ঘ) চিকিৎসা খরচ লাঘব করা, পারতপক্ষে বেশি মূল্যের পেটেন্ট ঔষধ ক্রয় না করা, (ঙ) সিনেমা, বায়োস্কোপ ইত্যাদি রং-তামাশা বর্জন করা, বিবাহ খরচাদি সংকুচিত করে কেবল যা একেবারে অপরিহার্য, তা করা, (ছ) বৃথা সাজ-সরঞ্জাম বা আসবাবপত্র হতে বিরত থাকা, (জ) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা খরচ যথাসম্ভব কম করা (২) মাসিক আয়ের এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) পর্যন্ত পরবর্তী তিন বছর তাহরীকে জাদীদের আমানত ফান্ডে জমা করা, (৩) বিরুদ্ধবাদীদের মিথ্যা প্রচারের জবাব দেয়ার জন্য জামা'তের ফান্ডে চাঁদা দেয়া, (৪) বহির্দেশে ইসলাম প্রচারের জন্য চাঁদা দেয়া, (৫) তবলীগে ইসলামের বিশেষ স্কিমের জন্য চাঁদা দেয়া, (৬) সাইকেলযোগে তবলীগি সার্ভের জন্য চাঁদা দেয়া, (৭) চাকুরীজীবিদের ছুটি প্রাপ্য থাকলে তিন মাসের ছুটি নিয়ে তবলীগি কাজে উৎসর্গ করা, ব্যবসায়ী বা কৃষকদের অবসরকাল তবলীগের জন্য উৎসর্গ করা (ছ) গ্রীষ্মের, পূজার বা বড় দিনের ছুটি তবলীগের জন্য উৎসর্গ করা, (৮) যুবকদের তিন বছরের জন্য

নিজেদেরকে উৎসর্গ করা, (১০) সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তিদেরকে নিজেদের বক্তা বা সম্মানিত প্রচারকরূপে পেশ করা, (১১) ২৫ লক্ষ টাকার রিজার্ভ ফান্ডের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা, (১২) পেনশনপ্রাপ্ত লোকদের নিজেদেরকে সিলসিলার কাজের জন্য পেশ করা, (১৩) সঙ্গতিশীল ব্যক্তিদের সন্তানদেরকে শিক্ষার জন্য কাদিয়ান প্রেরণ করা, (১৪) উচ্চশিক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র হতে ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ নেয়া, (১৫) যুবকদের বিদেশে গিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে তবলীগ করা, (১৬) নিজের হাতে কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করা, (১৭) বেকাররা যেন অবিলম্বে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র বৈধ কাজে নিয়োজিত হয়, (১৮) কাদিয়ানে বাড়ি প্রস্তুত করতে চেষ্টা করা, (১৯) এ তাহরীকের সাফল্যের জন্য কায়মনোবাক্যে দোয়া করা (২০) ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতাকে সমুন্নত রাখা, (২১) মহিলাদের অধিকার ও আবেগ অনুভূতির প্রতি দৃষ্টি রাখা, (২২) প্রত্যেক আহমদী পরিপূর্ণভাবে আমানতদার (বিশ্বস্ত) হবে আর কারও আমানত খেয়ানত (অবিশ্বস্ততা) করবে না, (২৩) খোদার সৃষ্টির সেবা করা, নিজ হাতে কাজ করে নিজের গ্রাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, ইত্যাদি, (২৪) প্রত্যেক আহমদীর অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করা উচিত, সরকার বাধ্য না করলে আদালতে কোন (দেওয়াণী) মোকাদ্দমা দায়ের করবে না বরং তাদের মোকদ্দমা নিজস্ব আদালত বোর্ড বা কাযা বোর্ডে পেশ করবে আর এর রায়ের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করবে, (২৫) সন্তানদেরকে ইসলামের জন্য উৎসর্গ করা, (২৬) সম্পত্তি ও আয় ওয়াকফ (উৎসর্গ) করা, (২৭) হিলফুল ফুযূলের ন্যায় সমিতি গঠন করা।

বর্তমানে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার কোন নির্ধারিত হার নেই। তবে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেককে সাধ্যানুযায়ী অংশগ্রহণ করতে হবে। যারা আয় করে তাদেরকে মাসিক আয়ের একটি বিশেষ অংশ এ খাতে সারা বছর আদায় করা উচিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "এ তাহরীকের উদ্দেশ্য সাময়িক নয়। সেই সময় আসছে যখন আমাদেরকে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধবাদীদের সাথে সংগ্রাম করতে হবে। আমাদের কর্মসূচী আমরা নিজেরা তৈরী করিনি বরং আমাদের কর্মসূচী আমাদের সৃষ্টিকর্তা প্রণয়ন করেছেন।" (আল্ ফযল ৩/১২/১৯৩৫)।

আজ আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম সারা দুনিয়ার ২০৪টি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়েছে। এর গোটা কৃতিত্বই তাহ্রীকে জাদীদের বললে অত্যুক্তি হবে না। এ তাহরীকে জাদীদ এবং নেযামে ওসীয়্যতের মাধ্যমে দুনিয়াতে নতুন বিশ্বব্যবস্থার (নেযামে নও) প্রবর্তন হতে যাচ্ছে। দিকচক্রবালে আমরা ঊষার সোনালী কিরণের ন্যায় তা দেখতে পাচ্ছি।

ওয়াকফে জাদীদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ওয়াকফে জাদীদ (নব উৎসর্গ)-এর ঘোষণা দেন। প্রাসঙ্গিকভাবে এ তাহরীকের উদ্দেশ্যে ছিল পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের

প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ গোটা উপমহাদেশের জামা'তগুলোর সদস্যদেরকে সঠিকভাবে তালীম ও তরবিয়ত দেয়া। জন্মলগ্নে এ তাহরীকের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য হুযূর (রা.) বলেন, "এ তাহরীককে অব্যাহত রাখার জন্য আমার গায়ের কাপড়-চোপড়ও বিক্রি করতে হলে আমি তা করতে দ্বিধা করব না।" তরবিয়ত ও তবলীগের ময়দানে ওয়াকফে জাদীদের মোয়াল্লেমগণ যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৫ সনে ওয়াকফে জাদীদের পরিসরকে সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত করেন। (দ্বীনি মা'লুমাত, ম.খো. আ. পাকিস্তান, পৃ. ৫৭)।

হুযূর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) ওয়াকফে জাদীদের সর্বনিম্ন চাঁদার হার নির্ধারণ করেছিলেন ১ পাউন্ড বা এর সমপরিমাণ (বাংলাদেশী টাকার প্রায় ৭০/- টাকা)। কিন্তু পরে তিনি এ নির্ধারিত হার প্রত্যাহার করেছেন। এখন জামা'তের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাইকে এমনকি সদেজাত শিশুকে পর্যন্ত আর্থিক কুরবানীতে শামিল করার নির্দেশ রয়েছে, তা যত নগণ্য পরিমাণই হোক না কেন। নও-মোবাঈন তথা নবদীক্ষিতগণকেও যেন এ ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এ জন্যে খিলাফত থেকে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে আর তাদেরও উচিত যেন তারা সাধ্যমত এ তাহরীকে অংশগ্রহণ করে।

ওয়াকফে নও

সারা বিশ্বে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের জন্য একবিংশ শতাব্দীতে মোবাল্লেগদের (ধর্ম প্রচারকদের) এক বিশাল কর্মীবাহিনী প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) ১৯৮৭ সনে ৩রা এপ্রিল ওয়াকফে নও (নব উৎসর্গ)-এর তাহরীক করেন। এ পবিত্র তাহরীকে সাড়া দিয়ে হাজার-হাজার পিতা ও গর্ভধারিণী মা তাদের ভাবী সন্তানকে ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গ করেন। বর্তমানে নব উৎসর্গীকৃত এ বাহিনীতে ৪৮ হাজারের অধিক শিশু যোগ দিয়েছে যারা পিতা-মাতা ও জামা'তের তত্ত্বাবধানে তরবিয়ত পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এরা জামা'তের মোবাল্লেগ বাহিনীসহ বিভিন্ন জামা'তী দায়িত্বে যোগ দিয়ে ইসলামের বিশ্ববিজয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, ইনশাআল্লাহ। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.) ১৯৮৭ সনের ৩রা এপ্রিল তাঁর যুগান্তকারী খুতবায় বলেন, "আল্লাহ্ ও রসূলের প্রেমিকদের একটি কাফেলা আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করবে। এরা এরূপ লোক হোক যাদের অন্তর ঐশীপ্রেম ও রসূলপ্রেমে পরিপূর্ণ, যাদের রক্তে ইতোমধ্যে এ প্রেম ও ভালোবাসা প্রবাহিত হতে শুরু করেছে।"

"এ তাহরীক আমি এজন্যে করছি যেন আগামী শতাব্দীতে উৎসর্গীকৃত শিশুদের একটি মহান বাহিনী দুনিয়ার সব ধরনের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খোদার দাসে পরিণত হয়ে আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করে। এ উদ্দেশ্যেই আমরা ছোট-বড় সব শিশুকে উপহার হিসেবে পেশ করছি।"

এছাড়া ওয়াকফে নও সন্তানদের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) তাঁর ১৮ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখের খুতবায় ওয়াকফে নও ছেলেদের সর্বপ্রথম পছন্দের স্থান হিসেবে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার জন্য নসীহত করেন।

জামা'তের অন্যান্য তাহরীক

বর্তমানে জামা'তে যে সমস্ত তাহরীক রয়েছে এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল:

• **মরিয়ম শাদী ফান্ড:** গরীব আহমদী মেয়েদের বিয়েতে তাদেরকে উপহার দেয়ার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাঁর মাতা হযরত সৈয়দা মরিয়ম সিদ্দিকার নামানুসারে এ ফান্ডের প্রবর্তন করেন।

• **সৈয়দনা বেলাল ফান্ড:** জামা'তের শাহাদাতবরণকারী শহীদদের স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য এবং তাদের পরিবারের আর্থিক ও জাগতিক সহায়তার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এ ফান্ডের প্রবর্তন করেন।

• **এমটিএ ফান্ড:** সারা বিশ্বে অহোরাত্র ইসলামের সুশীতল বাণী পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এমটিএ কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এ বিশাল কর্মযজ্ঞকে আরো যথাযথভাবে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ ফান্ডের প্রবর্তন হয়।

• **তাহের ফাউন্ডেশন:** হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য তাঁর জীবনী, কর্ম ও চতুর্থ খিলাফতকালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে জামা'তের সদস্যদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এ তাহরীকের ঘোষণা দেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

ইজতেমার ইতিহাস এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইজতেমার ইতিহাস

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা একটি বিশেষ অনুষ্ঠান–যেখানে আমাদের যুবসমাজ পরস্পরের সাথে মিলিত হবার ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ পায়। প্রথম ইজতেমা ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কাদিয়ান জলসার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই এ অনুষ্ঠানটির জন্য আরো বেশি সময় এবং প্রচেষ্টার তাগিদ অনুভূত হয়। আর এভাবে ইজতেমা একটি পৃথক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। সেই ১৯৩৮ সনের পর যুবকদের এই সংগঠন সারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে এবং প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন পর্যায়ে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৬২ সালের ৫ নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লোকনাথ ট্যাংকের পাড়ে সর্বপ্রথম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় ২০১২ সনে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের ৪১তম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়।

ইজতেমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

১৯৩৮ সনের ২৫ ডিসেম্বর সর্বপ্রথম ইজতেমায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) খোদ্দামুল আহমদীয়ার ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন। সম্প্রদায়ের যুব সমাজের প্রতি তাঁর উপদেশ ছিল:

১। তাদের উচিত আহমদীয়াতের প্রতি গভীর সম্মান ও আনুগত্য হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নেয়া।

২। তার উপর অবিচল থাকা।

৩। কঠোর পরিশ্রমী হওয়া।

৪। অনুমান এবং মনগড়া ব্যাখ্যা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা।

৫। উদার মন-মানসিকতার অধিকারী হওয়া এবং সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে অবগত হওয়া।

৬। বিশ্বস্ত হওয়া।

৭। মানবতার সেবায় সক্রিয় হওয়া।

৮। সত্যবাদিতা অবলম্বন করা।

৯। খোদ্দামুল আহমদীয়ার লক্ষ্যকে সর্বদা সামনে রাখা।

১০। স্বীয় কৃতকর্মের ফলাফল মেনে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

১১। যেকোন ভুল কাজের জন্য শাস্তি মাথা পেতে নেয়া।

১২। সর্বতোভাবে অনুধাবন করা, কোন ব্যক্তি যখন জাতির জন্য স্বীয় জীবন বিসর্জন দেয়, তখন সেই ব্যক্তি মরে না, বরং সে জাতি যতদিন টিকে থাকে সে-ও ততদিন বেঁচে থাকে।

১৩। একজন খোদ্দাম কেবলমাত্র নিজের সংশোধন করেই সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তার চারপাশের মানুষদের সংশোধন হয়।

১৪। প্রজ্ঞার সাথে কাজ করা।

১৫। কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুগত থাকা।

১৬। এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যে সর্বদা যেন সংগঠনের প্রগতিশীলতা সর্বাগ্রে থাকে।

এ সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ ইজতেমার সময় আরও বেশি বিস্তৃতি লাভ করে। এটি এমন একটি অনুষ্ঠান যেখানে যুবক ও কিশোররা ইবাদত ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনোনিবেশ করার জন্য একত্রিত হয় এবং উপরোল্লেখিত গুণাবলীসমূহ প্রদর্শন করে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

অঙ্গ-সংগঠনসমূহের আহাদনামা

খোদ্দামুল আহমদীয়ার আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। (৩ বার পড়তে হবে)।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং রসূল।
আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ধর্মীয়, জাতীয় এবং দেশের স্বার্থ রক্ষার্থে নিজ প্রাণ, ধন, সময় এবং মান-সম্মান কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকব। একইভাবে আহমদীয়া খিলাফতকে অক্ষুণ্ন রাখতে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব এবং যুগ খলীফা যে ন্যায় মীমাংসাই প্রদান করবেন তা পালন করাকে অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

আহাদনামা পাঠের পদ্ধতি:
১) খোদ্দামগণ এ আহাদনামা নিজেদের প্রত্যেক সভা ও সমাবেশে একসাথে দাঁড়িয়ে পুনরাবৃত্তি করবেন।
২) সভা বা সমাবেশে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মধ্যে দায়িত্বের দিক থেকে যিনি জ্যেষ্ঠ হবেন তিনি আহাদনামা পাঠ করাবেন।
৩) প্রথমে তাশাহুদ আরবিতে তিন বার পাঠ করা হবে। তারপর এর অনুবাদ পাঠ করতে হবে। পরে একবার শুধু বাংলাতে আহাদনামা পাঠ করা হবে। উল্লেখ্য, হুযূর (আই.)-এর সাম্প্রতিক নির্দেশনা মোতাবেক এখন থেকে আহাদনামা মাতৃভাষায় পাঠ করা হবে। উর্দূতে পাঠ করার প্রয়োজন নেই।
৪) ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরে দাঁড়াতে হয়।

[খোদ্দামের আহাদনামার উর্দূ অংশ: ম্যাঁয় ইকরার কারতাহুঁ কে দীনি, কওমী অওর মিল্লী মুফাদ কি খাতের ম্যাঁ আপনি জান, মাল, ওয়াক্ত অওর ইয্যাত কো কুরবান কারনে কে লিয়ে হারদাম তাইয়্যার রাহুঙ্গা। ইসি তারাহ খেলাফতে এ্যাহমাদীয়া কে কায়েম রাখনে কি খাতের হার কুরবানী কে লিয়ে তাইয়্যার রাহুঙ্গা। অওর খলীফায়ে ওয়াক্ত জো ভী মারুফ ফ্যায়স্‌লা ফারমায়েঙ্গে উসকি পাবন্দী কারনি যারুরী সামঝুঙ্গা। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)]।

আতফালুল আহমদীয়ার আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। (৩ বার পড়তে হবে)।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা এবং রসূল।
আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ইসলাম ধর্ম এবং আহমদীয়াত এবং দেশ ও জাতির সেবা করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকব। সদা সত্য কথা বলব, কাউকে গালি দিব না এবং খলীফাতুল মসীহ্ (আই.)-এর সকল আদেশ পালন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাব, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।

আহাদনামা পাঠের পদ্ধতি:
১) আতফালগণ এটা মুখস্ত করবে।
২) সভা বা সমাবেশে আতফালুল আহমদীয়া বা খোদ্দামুল আহমদীয়ার মধ্যে যিনি দায়িত্বের দিক থেকে জ্যেষ্ঠ হবেন তিনি আহাদনামা পাঠ করাবেন।
৩) প্রথমে তাশাহুদ আরবিতে তিন বার পাঠ করা হবে। তারপর এর অনুবাদ পাঠ করতে হবে। পরে একবার শুধু বাংলাতে আহাদনামা পাঠ করা হবে। উল্লেখ্য, হুযূর (আই.)-এর সাম্প্রতিক নির্দেশনা মোতাবেক এখন থেকে আহাদনামা মাতৃভাষায় পাঠ করা হবে। উর্দূতে পাঠ করার প্রয়োজন নেই।
৪) ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরে দাঁড়াতে হয়।

[আতফালের আহাদনামার উর্দু অংশ: ম্যাঁয় ওয়াদা কারতাহুঁ কে দীনে ইসলাম অওর জামা'তে এ্যাহমাদীয়া, কওম অওর ওয়াতান কি খেদমাত কে লিয়ে হারদাম তাইয়্যার রাহুঙ্গা, হামেশা সাচ বোলুঙ্গা, কিসি কো গালী নেহী দুঙ্গা। অওর হযরত খালীফাতুল মাসীহ্ কি তামাম নাসিহাতোঁ পার আমল কারনে কি কোশেশ কারুঙ্গা, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা।]

মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। (৩ বার পড়তে হবে)।
ম্যাঁয় ইকরার কারতাহুঁ কে ইসলাম অওর এ্যাহমাদীয়াত কী মাযবুতী অওর ইশায়াত অওর নেযামে খেলাফত কী হেফাযাত কে লিয়ে ইনশাআল্লাহ্ আখের দাম তাক জাদ্দো জোহদ কারতা রাহুঙ্গা। অওর ইসকে লিয়ে বাড়ী সে বাড়ী কুরবানী পেশ কারনে কে লিয়ে হামেশাহ তাইয়্যার রাহুঙ্গা। নীয আপনে আওলাদ কো ভী হামেশাহ খেলাফত সে

ওয়াবাসতা র‍্যাহনে কী তালকীন কারতা রাহুঙ্গা। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)।

অনুবাদঃ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।
আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ইসলাম ও আহমদীয়াতের দৃঢ়তা ও এর প্রচার এবং নিযামে খিলাফতের সংরক্ষণের জন্য শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব এবং এর জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করব না। এছাড়া আমার সন্তান-সন্ততিদেরকে খিলাফতের প্রতি উৎসর্গীকৃত ও অনুরক্ত থাকতে সর্বদা তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিতে থাকব। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)।

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। (৩ বার পড়তে হবে)।
ম্যাঁ ইকরার কারতিহুঁ কে আপনি মাযহাব অওর কওম কি খাতের আপনি জান, মাল, ওয়াক্ত অওর আওলাদ কো কুরবান কারনে কে লিয়ে হারদাম তাইয়্যার রাহুঙ্গী। নীয সাচ্চায়ী পার হামেশা কায়েম রাহুঙ্গী অওর খেলাফতে এ্যাহমাদীয়া কে কায়েম রাখনে কে লিয়ে হার কুরবানী কে লিয়ে তাইয়্যার রাহুঙ্গী। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)।

অনুবাদঃ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।

আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ধর্ম ও জাতির স্বার্থে আমার জীবন, সম্পদ, সময় ও সন্তান-সন্ততি কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকব। তদুপরি সর্বদা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব এবং খিলাফতে আহমদীয়াকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকব। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)।

নাসেরাতুল আহমদীয়ার আহাদনামা

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। (৩ বার পড়তে হবে)।
ম্যাঁ ইকরার কারতিহুঁ কে আপনি মাযহাব, কওম অওর ওয়াতান কি খেদমাত কে লিয়ে হার ওয়াক্ত তাইয়্যার রাহুঙ্গী, নীয সাচ্চায়ী পার হামেশাহ কায়েম রাহুঙ্গী। অওর

খেলাফতে এ্যাহমাদীয়া কে কায়েম রাখনে কে লিয়ে হার কুরবানী দেনে কে লিয়ে তাইয়্যার রাহুঙ্গী। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)।

অনুবাদঃ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নাই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।
আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আমার ধর্ম, জাতি ও জন্মভূমির সেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকব, তদুপরি সত্যের ওপরে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকব এবং আহমদীয়া খিলাফতকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে জন্য প্রস্তুত থাকব। (ইনশাআল্লাহ্ তা'লা)।